রচনা পরিচিতি

স্বরচিত

শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর

" পদ্মপর্ণা গাঙ্গুলী

" মহাশ্বেতা দেবী

ডঃ মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার

শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী

ডঃ ফুলরেণু গুহ

শ্রীমতী লীনা চক্রবর্তী

" ইলা চৌধুরী

" দীপালি নাগ

ডাঃ মুকুলিকা কোনার

শ্রীমতী মমতা গুপ্ত

" মঞ্জু ভট্টাচার্য

" শান্নু লাহিড়ী

" শান্তি মল্লিক

" সুপ্রিয়া চৌধুরী

—সাক্ষাৎকার ও অনুলেখন

নীলিমা চক্রবর্তী

সূচীপত্র

শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

সাংবাদিকতা শুরু করি একটি পাক্ষিক পত্রিকার রিপোর্টার হয়ে। খবরের প্রয়োজনে যেতে হতো কখনো শহরের নানা জায়গায়, কখনো বা অজ পাড়াগাঁয়ে। মিশতে হতো নানা মানুষ জনের সঙ্গে। সেই ঘোরাঘুরিতে যেন বড় স্পষ্ট করে বারবার দেখেছি পরিবার থেকে সমাজে মেয়েদের অবস্থা।

আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৌঁছেও মেয়ে জন্মালে ঘরে ঘরে আত্মীয় পরিজনের মুখে নামে অন্ধকার। শাঁখ বাজেনা তার অভ্যর্থনায়। উৎসব তো নয়ই, সামান্য একটু আনন্দের অভিব্যক্তিও বুঝি ফোটে না একটিও প্রিয় মুখে। মেয়ে বড় হয় আর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত যে কাঁটা বিছনো পথ পেরিয়ে আসতে হয় তাকে জীবনে সাধারণ একটা উদ্দেশ্যে পৌঁছতেও। আর যারা তার থেকেও বেশী কিছু চাইতে সাহস করে? শুধু দিন যাপনের গ্লানি পেরিয়ে এগিয়ে যেতে চায় খানিকটা সার্থকতার পথে?

জীবনে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনো কয়েকজন প্রতিভা সেই গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে নারী হিসেবে যুদ্ধ করেছেন ঘরে বাইরে যে একটা বিশাল বাধার পাহাড়ের সঙ্গে, তারই বড় করুণ আর মর্মস্পর্শী আলোচনা করেছেন এখানে।

শিক্ষায়-দীক্ষায় আজকের মেয়েরা গত শতক থেকে এগিয়ে এসেছেন অনেকখানি। উঠে গেছে মেয়ের আট বছর বয়স না হতেই গৌরীদানের দিন। মেয়েরা আজ অনেকখানি স্বচ্ছন্দ সাধারণ জীবনে। তবুও একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে ঘরে বাইরে যে মূল্য পাওয়া উচিৎ তাকি তাঁরা সত্যিকরে পাচ্ছেন আজো?

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরতা বা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত অগ্রগন্য মহিলারাও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার অনুযোগ করেছেন যে

অর্থ নৈতিকভাবে স্বাধীন বা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে স্বামীর থেকে কিছুমাত্র কম না হওয়া সত্ত্বেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনে মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে আলাদা কোনো একটা কথা চিন্তাই করে না বিশেষ কেউ। আর ভাগ্যগুণে বা দোষে (!) স্ত্রী যদি পদ গৌরবে কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে যান স্বামীকে পেছনে ফেলে তাহলে তো গোটা পারিবারটা জুড়ে কয়েক শতাব্দী আগে খনার উপাখ্যানের মতন নামে নিকষ কালো অমাবস্যার অন্ধকার। তফাৎটা শুধু, একালের খনারা প্রাণ দেন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে অনুপায় ক্ষোভে আর অনুচ্চারিত বিদ্রোহের বুকে মাথা ঠুকে ঠুকে। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই মানতে পারেন না অদ্ভুত, অযৌক্তিক এই নিয়মের ব্যবস্থাকে।

সার্থকনামা স্বামীর স্ত্রী গরবিনী হন স্বামীর গৌরবে। যশস্বিনী স্ত্রীর স্বামী মুখ লুকিয়ে ফেরেন লোক চক্ষুর অন্তরালে। তাই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রাজার স্ত্রী রানী, কিন্তু উত্তরাধিকার বলে সিংহাসন পেলে রানীর স্বামী রাজা হন না। এটাই নিয়ম।

সময় আর সুযোগ পেলে নারী পুরুষের থেকে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণ চিন্তাধারার সুষ্ঠু প্রয়োগে কোনো অংশেই কম নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্থকভাবে একথাটা বারবার প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন বহু মহিলা তবু এত বড় পৃথিবীটা জুড়ে কটা দেশের রাষ্ট্রনায়ক হবার অধিকার পান মেয়েরা আজো? কটা দেশে কতটুকু দায়িত্বের কাজে এগোতে দেওয়া হয় মেয়েদের স্বচ্ছন্দে? কেন হয় না তার তো কোনো উত্তর নেই বুদ্ধি বা বিবেচনাকে ভাবিয়ে তুলবার মতন।

আজকের বর্তমান অনাগতের কাছে অতীত হয়ে যাবে কাল। বর্তমান চিরকাল ঋণী অতীতের কাছে। আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে মেয়েদের জীবনযাত্রার যে ধারা ছিলো এখন সহজ হয়ে এসেছে দিন তার থেকে অনেকখানি। অনেক দুর্গম আর বন্ধুর পথ পেরিয়ে যাঁরা আনলেন এই স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদেরকে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম

ভুলে না যায় তাই তাদের হাতে তুলে দিলাম চলমান জীবনের এই দলিলখানা।

স্বল্প পরিসর, তাই ইচ্ছে থাকলেও উল্লেখ করতে পারলামনা আরো অনেকের অভিজ্ঞতার কথা। সম্পাদনার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞতার দায়ে পড়তে হবে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রী অরুণ বাগচী এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে সময় আর ধৈর্য দিয়ে সুচিন্তিত ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

কলেজ অফ ভিস্যুয়াল আর্টস্-এর অধ্যক্ষ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বইটির প্রচ্ছদ সাজিয়ে তুলতে নিঃস্বার্থভাবে যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্যেও কৃতজ্ঞতার আমার সীমা নেই। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর আগ্রহের সঙ্গে যে নবীন শিল্পীটি প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করেছে, শিল্পী জীবনে চলার পথে তারও পাওনা রইলো সম্পাদকের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

একেবারে অভিনব চিন্তার একটা কাজ, স্বভাবতই দুরূহ হয়েছে নানা কারণে। অনুজপ্রতিম শ্রী সত্য চট্টোপাধ্যায় অনবরত সাহস আর সাহায্য না দিলে অনেকদিনের এই ইচ্ছেটা বোধহয় আকাশ কুসুম হয়েই শেষ পর্যন্ত ফুটে থাকত মনের মধ্যে।

বিভিন্নভাবে নানা কাজে নিযুক্ত থেকেও যাঁরা সময় করে লিখে বা সাক্ষাৎকার দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এই প্রচেষ্টায় তাঁদের কাছে ঋণ রইলো আমার চিরদিনের। এই প্রসঙ্গে অতি সংকোচের সঙ্গে একটা কথা বলে নিই যে, এইসব বিদ্বজ্জনের সমাবেশে আমার মতন অকিঞ্চিৎকর জনের এক পঙতিতে বসবার কোনো যোগ্যতা নেই আমি জানি। তবু সাংবাদিক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিলাম তার কারণ, আমি যখন প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা শুরু করি বয়সটা তখন আমার একেবারেই কচি। কলেজের ছাত্রী তখন সবে প্রথম ধাপের। লিখতে ভালবাসতাম, তাই দেখে একটি মহিলা

পত্রিকার সম্পাদক ডাক দিয়েছিলেন তাঁর পত্রিকায়। সাংবাদিক হবার ইচ্ছেটা মনে গেঁথে গিয়েছিলো তখন থেকেই। পরে পড়াশোনার পাট শেষ করে যখন সাংবাদিকতাকেই বেছে নিতে চাইলাম বৃত্তি হিসেবে তখন শুধু মেয়ে হবার অপরাধে কেমন করে মাথা কুটতে হয়েছে ছোট বড় সব সংবাদ সংস্থায়, অনেক চোখের জলের সেই গল্পটা বলবার লোভ সামলাতে পারলাম না কিছুতেই।

কূটনৈতিক নিয়মের ক্রম অনুযায়ী প্রথমে সাজাতে হয়েছে চারটি রচনা। বাকি রচনাগুলি লেখকের নামের আদ্যাক্ষর ধরে সাজানো হলেও নিজের নামটি রাখলাম তাই সকলের শেষে, সবার নিচে।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

আজ ওঁরা সবাই

আমরা বলি, পুরুষ শাসিত সমাজ। যে উচ্চারণে বলি তাতে একটি স্পষ্ট সমালোচনার স্পর্শ থেকে যায়। আর এই নিহিত অভিযোগ যে অসত্য নয়, সেকথা মহিলারাই বড় বেশী করে বুঝতে পারেন; তত্ত্ব হিসেবে নয়, আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিধাতা আমাদের সমাজপতি নন, কোনও শাসন অনুশাসন তিনি জারী করেন না। কাজেই আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার কেন নারী পাবে না, এই নালিশ বিধাতাকে জানিয়ে লাভ নেই। অভীষ্ট আদালত অপর লোকে নয়, ইহলোকের ধূলির ওপরই তার সিংহাসন পাতা। বিচারক হতে হবে আমাদেরই। পক্ষপাতশূন্য হতে হবে আমাদের বিশ্লেষণ এবং সমাধান। কেন এমন হল, কী হেতু এমন হয়! সভ্যতা স্ফূরিত হবার পর সেই আদিকালে একটা সমাজ অত উদার থাকে কী করে, কোন মন্ত্রে সে সকল সুযোগ সবাইকার জন্য অবারিত করে দিতে পারে, কী ভাবে করে? শাস্ত্রে, দর্শনে, গণিতে, বিজ্ঞানে, রাজনীতির চর্চায়, এমন কি জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নারী নিজেই তার পথ প্রস্তুত করে নিয়েছে একদা। কারও অভিভাবকত্বের কাছে নত করতে হয়নি তাকে। পরবর্তী কালে, কালিদাসের আমলে এসেও দেখি, নগরবধূ যিনি তাঁর শয়নকক্ষের দ্বারে এসে রাজ অধিপতির অভিপ্রায়ও স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজদণ্ড সর্বত্র ছায়া ফেলে, প্রজাদের ইচ্ছা বা রুচি বা সম্পর্কের ওপর কোনও হুকুমজারী করতে পারে না। ব্যক্তিকে সমগ্র সমাজ শ্রদ্ধা করেছে, সেই জাগ্রত সমাজের চোখে নৃপতিও একজন ব্যক্তিমাত্র। তাঁর সম্মান বিকীরিত হচ্ছে যে গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে। উৎপীড়কের ভূমিকায় তাঁকে কিছুতেই মানায় না।

এই রকম মুক্ত সংস্কৃত পরিবেশটি হারিয়ে গেল কোন দুর্দৈববশত

তা আমরা সঠিক জানিনে। পণ্ডিতজনেরা আবছা অনুমান করে থাকেন, ওই পর্যন্ত। প্রধানত এ ব্যাপারে দায়ী করা হয় বিদেশী আক্রমণকারীদের নারীমাংস লোলুপতার ওপর, যার ধাক্কা সামলাতে আমরা অবরোধং মাস্মধ্যায়েম ইত্যাদি জড়িবুটি নিয়ে এলাম চিন্তনে। বীর্য ও সাহস দিয়ে দস্যুবৃত্তি বন্ধ করতে না পেরে, অথবা সেই চেষ্টা না করে, আমরা অবরোধের মধ্যে নিয়ে এলাম রমণীকুলকে। সেইখানে তারা ধীরে ধীরে আলো এবং বাতাসের বুকভরা অধিকার হারিয়ে ফেলল। হারিয়ে ফেলল, সামাজিক সাম্য যা দিতে পারে। শিক্ষার অধিকার পর্যন্ত। ভাবী প্রজন্ম প্রত্যক্ষত যাদের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল, সেই মাতৃমণ্ডলীকে আমরা প্রগতির আকাশভরা স্বাধীনতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তমসাদীর্ণ পাতালপুরীতে অন্ধত্বের উপাসনায় নিযুক্ত করে দিলাম। এই নির্বুদ্ধিতার খেসারত আরও অনেক বেশী হত, প্রায়শ্চিত্ত আরও দীর্ঘস্থায়ী হত, যদিনা ওই বন্দিনীরাই আবার আপন প্রাণের ঐশ্বর্যে স্বয়ং উদ্দীপিত না হতেন। ব্রিটেনের মাধ্যমে বহির্দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন যদি না ঘটত—পরাধীনতার সহস্রধারা লজ্জার মধ্যে ওইটুকুই সুখ ও সান্ত্বনা—তবে বোধ করি ওই খোলা হাওয়া অমন মধুর তীব্রতায় এসে আমাদের পালে লাগত না। আরও দূরায়ত হত সামাজিক মুক্তি। এবং স্বীকার করে নেওয়াই ভাল যে ওই নারীমুক্তির মূলে পুরুষশ্রেণীর অবদান কম। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা হলেন প্রক্ষেপমাত্র। তাঁরা আমাদের দীন মানসিকতার যথার্থ প্রতিনিধি নন। নির্ঝরের মতো আপন আবেগে নারীরা নিজেরাই নিজেদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছেন, অচলায়তনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। যতটুকু সম্ভব হয়েছে এ পর্যন্ত। সম্পূর্ণ নয়—যতটুকু ঘটেছে।

বর্তমান গ্রন্থে, বাস্তবপক্ষে, পদকের এই দিকটা নিয়ে সরাসরি কিছু লেখা হয়নি। আমরা গোটা ব্যাপারটা দেখছি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পনেরো জন বিশিষ্ট মহিলা, যাঁরা আপন আপন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁদের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, তাঁরা অকপটে

ব্যক্ত করেছেন তাঁদের সাফল্যের ইতিবৃত্ত। নাতিদীর্ঘ বক্তব্যগুলি থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে এক সংগ্রামের ছবি। যে কোনও ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে হলে প্রয়াস চাই, পরিশ্রম চাই। আলাদিনের দৈত্য তো কল্পনার সামগ্রী। বাস্তব সহায়ক যা, তা হল আমার নিজস্ব শ্রম ও স্বেদ। বহু রক্ত জল করে তবেই লড়াই করবার শক্তি অর্জন করতে হয়। সবাইকেই করতে হয়। তবে, বলাই বাহুল্য, একজন পুরুষের বেলা এই কাজ যত কঠিন, একজন মহিলার পক্ষে তা আরও ঢের বেশী শক্ত। কারণ তাঁর ক্ষেত্রে বাধা বেশী। বর্তমান বইটি যে পনেরজন ভি আই পি মহিলার গ্রন্থিত জবানবন্দি, সেটা অবশ্যই আরও চিত্তাকর্ষক হত যদি লেখিকারা আরও অধিক পরিমাণে সবাক হতেন, আরও অকপট হতেন। স্বীকার করতেই হবে যে আঘাত করাটা নারীচরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম নয়, সহজে সেটা আসেনা। কিন্তু একথাও তো সত্য যে, আজ আমাদের সমাজে একজন মহিলাকে প্রতিভা ও পেশাগত দক্ষতার প্রমাণ রাখতে হলে, খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে হলে যে সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় তা বাইরে থেকে অনুমান হয়তো করা চলে, কিন্তু সমস্যার কণ্টকময় দশা ঘোচাতে হলে তাঁকেই ব্রীড়া ত্যাগ করে বাঙ্ময় হতে হবে। বাইরের মানুষ যতই বুদ্ধিধারী হন না কেন, তাঁরা অপরকে সতর্ক করতে পারবেন না, সহায়তা দিতে পারবেন না। এমন অভি-যোগ তুলছিনা যে বিশিষ্ট ওই মহিলারা নৈঃশব্দের চর্চাই করেছেন। তা নয়। তবে বোধকরি আর একটু মন খুলে বললে অন্তত বর্তমান পাঠক এবং অনুরাগী জনেরা খুশি বোধ করতেন।

লেখিকাদের তালিকার ওপর চোখ রাখলেই মন আনন্দে ভরে যায়। সবাই যেন কাছেরই মানুষ। যদিও উত্তুঙ্গ। চোখ তুলে দেখতে হয়। লেখার হাত হয়তো সবার সমান দক্ষ নয়, সেটা আশা করাও অন্যায়। তবে এক ধরণের আকর্ষণ রয়ে গেছে সব লেখায়। মিষ্টি লাগে যখন একাধিক লেখিকা 'বাবা' নামক পারিবারিক

চরিত্রটিকে সর্বাধিক সহায়ক ও উৎসাহদাতা বলে বর্ণনা করেন। ফাদার কমপ্লেস? না, ঠিক তা নয়। এই সব প্রবন্ধ থেকে 'বাবা বনাম উনি' গোছের কোনও বিতর্কও শুরু করা যাবে না। বক্তব্য অতিশয় সরল। তবে খুব মজা বোধ হবে পুরুষ পাঠকদের, যখন পড়বেন, এক বিদুষী মন খুলে কথাটা বলে দিয়েছেন—"আমি বাধা ও ঈর্ষার জ্বালা পেয়েছি অন্য মহিলাদের কাছ থেকে।' অর্থাৎ পুরুষজাতিকে তিনি প্রমাণাভাবে খালাস করে দিয়েছেন। অলমিতি।

অরুণ বাগচী

পিছন পানে চাই

পদ্মা খাস্তগীর (বিচারপতি হাইকোর্ট)

পরিবারের বর্ষীয়সী আত্মীয়েরা মন্তব্য করলেন "মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা দিয়ে কি লাভ, জজ ম্যাজিস্ট্রেট তো হবে না" সুতরাং ন্যূনতম শিক্ষা দিয়ে চার পুত্রীকে পাত্রস্থ করাই শ্রেয়। আমার পিতা স্বর্গত ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গর্জে উঠলেন সেকি, ক্ষণা, গার্গী, মৈত্রেয়ীরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন—ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসে যাঁরা জাজ্বল্যমান-বিদুষী বীরাঙ্গনা, বর্তমান যুগের সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সুচেতা কৃপালনীর দেশের মেয়েরা শুধু সংসারধর্ম পালন করে, সন্তান সন্ততির জন্ম দিয়ে আত্মীয়-পরিজনের পরিচর্যা করে রান্না ঘরের মধ্যে দিয়েই জীবনটা অতিবাহিত করবে? দেশের দশের প্রতি কোনো কর্তব্যই থাকবে না? সে কি করে হয়? শত সহস্র ভারতীয় ললনারা যেই ধারাবাহিক, গতানুগতিক জীবন-ধারার মধ্যে জীবন যাপন করছেন, তার বাইরে কেন আমার দুহিতারা জীবনে এক নূতন আদর্শ আনবে না? হোলোই বা তারা চার কন্যা। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য কোথায়—যদি তারা সমশিক্ষা লাভ করে সমান সুযোগ পায়? তিনি ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি U. K থেকে M.R.C.P পাশ করো আসেন। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে, বিচার বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের কোনো বিভেদ থাকতে পারে না।

তিনি ছিলেন মহানচেতা। ভীষণ আদর্শবাদী। বিরাট অন্তঃকরণ নিয়ে জন্মেছিলেন। সেইজন্য সেই ছোট্টবেলা থেকেই ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ি। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। শুধু যেন সংসারের যাঁতা কলে পিষে জীবনটা

নিঃশেষ হয়ে না যায় তার জন্যেই সর্ববিধ সুযোগ সুবিধে অম্লান বদনে দিয়েছিলেন পিতৃদেব।

নামজাদা স্কুল ও কলেজে পড়ালেন। University of London এর King's College থেকে L L.B. with Honors পাশ করে honourable Society of Gray's Inn থেকে Barrister হলাম। International Court of Justice থেকে International Law এতে Course করে এলাম।

কোলকাতা High Court-এ enrolled হয়ে আইন ব্যবসা শুরু করে দিলাম। Chauffeur, গাড়ী, আইনের বই-এর Library সব করে দিলেন বাবা। সবের সুযোগ দিলেন পসার জমিয়ে তোলার জন্যে। প্রতিদিন অধীর আগ্রহে শুনতেন কোর্টের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা। প্রতিনিয়ত উৎসাহ দান করতেন, আশীর্বাদ করতেন যেন অদূর ভবিষ্যতে বিচারপতির পদ অলংকৃত করতে পারি। আজ যদিও তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন তবুও প্রতি মুহূর্ত তাই শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁর চরণে অনন্ত কোটি প্রণতি জ্ঞাপন করি।

মাতা ছিলেন পরম ধর্মশীলা,—সঙ্গীত, শিল্পকলা ও পুস্তকের অনুরাগিনী। তথাকথিত শিক্ষা প্রাপ্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারী মহিলা ছিলেন না কিন্তু বাড়ী ভর্তি তাঁর পুস্তকের সংগ্রহ। বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা। পিতা ছিলেন বিত্তবান। দাসদাসীতে ভরা সংসার তাই অফুরন্ত সময় ছিল তাঁর হাতে। সাহিত্যানুরাগিনী-তাই বিভিন্ন পুস্তকরাশির মধ্যে দিয়ে কাটতো সময়। পিতা বিশিষ্ট চিকিৎসক। সব সময়েই তিনি কাজে ব্যস্ত। মায়ের বাকি সময়ে থাকত সূচিশিল্প। পোষা পশুপক্ষির পরিচর্যা ছিল তাঁর শখ। তাছাড়া অগণিত নিপীড়িত হতভাগ্য দুস্থদের প্রতি সমবেদনা ও সাহায্য দিতেন।

ছোট্ট বেলা থেকেই তাঁর নির্দেশনায় সুন্দর শ্বেত পাথরে মোড়া পূজার ঘরে বসে নিত্যপূজা—স্তবপাঠ সন্ধ্যারতি প্রভৃতি করতাম। তাছাড়া পিয়ানোতে শিশুহাতে সুর তোলা। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলাম এক বিশাল অন্তঃকরণ ও চরম উদার মতবাদী 'খাঁটি' ভদ্রলোকের

সঙ্গে। সমান ভাবে উৎসাহিত করলেন আইন ব্যবসায় লিপ্ত থাকার জন্যে। তিনি পেশায় Chemical Engineer। দীর্ঘদিন পশ্চিম জার্মানীতে থেকে কাজ নিলেন সুদূর রাউরকেল্লায়। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। হয়তো বা এত দিনের উচ্চাশা ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে, শাঁখা পরে, রান্না ঘরে বা ভাঁড়ার ঘরের হিসেব নিকেশ নিতে হবে জীবন ভোর। নয়তো ছোট্ট খোকা খুকুর পরিচর্যার ভেতর দিয়ে বাড়ীর রান্না বাজারে বিলাতী Degreeগুলোকে বাক্স বন্দী করে রাখতে হবে। কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান এ সময় এমন সুযোগ দিলেন আর এই অত্যন্ত সহনশীল ও বিবেচক লোকের সঙ্গে জীবনগ্রন্থী বেঁধে দিলেন যে সব ভয় নির্মূল করে তিনি সমর্থন জানালেন যে, আমি পিত্রালয়ে থেকে ঠিক পূর্বের মত নিজেকে নিয়োজিত রাখবো আইন ব্যবসায়।

তাঁর সাহচর্য উৎসাহ ও ত্যাগের মাধ্যমে সুন্দরভাবে এগিয়ে চললো আমার কর্ম জীবন। বাবা ও মায়ের কোল আলো করে জন্ম-গ্রহণ করলো আমাদের কন্যারত্নটি। তার পরিচর্যার কোনো ত্রুটি হোলো না কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে ভয়ানক সংসারী। স্বামী সন্তান নিয়ে এক সুখের শান্তির নীড় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকিয়ে দিই। তার মধ্যেই চলে ব্যস্তময় কর্মজীবন।

তারপরে আসে বংশ উজ্জ্বল করে আমার পুত্র। হাসি মুখে তার দেখাশোনার মধ্যে চলে ব্যস্তময় কর্মজীবন। বড় বড় নামজাদা Sessional Trials—Special Public prosecutor হয়ে কত লোমহর্ষক ফৌজদারী মামলা করি। যখন ২৪/২৫ বছরের মেয়ে প্রথম উচ্চ আদালতে এসে যোগ দিই, খুব ইচ্ছে ছিল সেখানকার চমক লাগানো পরিবেশে Session Trialএ কাজ নিই। জাঁদরেল Public Prosecuter P. P. Chowdhury বল্লেন, "তুমি ছেলে-মানুষ এইসব খুনের আসামী দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে"। তাই বলে আমাকে Sessionএর কাজে যোগ দিতে নারাজ হলেন। পরবর্তী জীবনে যখন বাঘা বাঘা আসামী আমাকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবার

জোগাড় তখন মিঃ চৌধুরীর সেই বিদ্রুপের কথা বার বার মনে উঁকি দিত।

আমি আবার একেক বিষয়ে ভীষণ পুরানো পন্থী তাই শিশু সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করিনি। তাই সব সময়ে শত কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এমনকি Session Trial চলা কালীন গাড়ী করে বাড়ি ছুটে এসে ঠিক সময় শিশু সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়ে আবার ছুটে যেতুম আদালতে। রাত্রে শিশু সন্তানের বিছানার পাশে বসে বসে শয্যার ওপরে আদালতের নথিপত্র ঘেঁটে মামলার সওয়াল তৈরী করতুম। ক্রন্দনরত সন্তানকে ভুলিয়ে নিয়ে তার ভিজে জামা কাপড় বদলে পুনরায় কাজে মনঃসংযোগ করতুম। হঠাৎ মনে হোলো এত বড় বড় দাগী আসামীর মামলা, জটিল আইন চিন্তা সন্তানের ওপর কোনো কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে না তো? স্বনামধন্য শিশু চিকিৎসক ডাঃ শিশির বসু মহাশয় আশ্বাস দিলেন, বিরূপ প্রভাব তো দূরের কথা মাতৃগর্ভ থেকে মায়ের কর্মক্ষেত্রে কার্যকলাপ ও তৎপরে জন্মক্ষণ থেকেই আইনের পরিবেশে থেকে নিশ্চয়ই বড় হয়ে এক বিশিষ্ট আইনজিবী হয়ে Lord Halsburyর নাম রাখবে।

এমনকি ছোট্ট দুই সন্তান শান্ত ও সরল স্বভাবের বলে কর্মে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। বরঞ্চ তাদের সঙ্গ—তাদের প্রতি অপত্য স্নেহ সবসময় আমার মন চাঙ্গা করে রাখতো। সপ্তাহ শেষে প্রথমে রাউরকেল্লা ও পরবর্তী কালে দুর্গাপুরে যেতুম স্বামীর কাছে। Chief Engineer এর বাংলো—খুব সুন্দর আর বিরাট। সেখানে সংসার ধর্মের মধ্যে যেমন রান্না, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আতিথেয়তার সঙ্গে চলতো পড়াশুনা। সপ্তাহের প্রথমে আবার কোলকাতায় ফিরে আসা, তার পূর্বে স্বামীর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্তর, জামা কাপড় ঠিক রাখা এমনকি তাঁর প্রিয়খাদ্য রান্না করে fridge-এ রেখে আসা। কর্মজীবনে সহকর্মী, Senior, বিচারপতি কারুর কাছে কোনো বাধা পাইনি। প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার Bar-

library তে প্রবেশ করে সাদর আবাহন পেয়েছি। বিরূপ মনোভাব পেয়েছি যখন অন্য মহিলা ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন। পেশাগত হিংসা রেশারেশি তাদের মধ্যেই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। আমার জীবনে পুরুষকে দেখেছি উদার সহযোগী। অবশ্য মহিলাদের চক্রান্তে পরে তাঁরাও হয়ে ওঠেন কঠোর, বিদ্বেষী। শ্রী স্নেহাংশু কান্ত আচার্য মহাশয় এসে ভয় দেখালেন পুরুষময় High court, তারা তোমার পেছনে লাগবে। শীঘ্র পালিয়ে যাও। ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর অভিসন্ধি-মূলক কথায় কর্ণপাত না করে নিজ আত্ম-মর্যাদা বজায় রেখে বীর দর্পে এগিয়ে চলি নিজের পায়ে নির্ভর করে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় চিত্তের মহিলা আমি। ভয় দেখিয়ে কেউ কখনও আমাকে দিয়ে কোন কাজ বা অকাজ করিয়ে নিতে সমর্থ হয়নি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। গুরুর কৃপা থাকলে বিষধর সর্পও মাথা নত করবে আমার কাছে। সেই মনে বল রাখি। তৎকালীন Standing Council, আমার Sessions Trail এর Jury address শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। মহিলার এতখানি পারদর্শীতা ভাল নয়। তাহলে তাঁদের মত পুরুষের সম্মান থাকে কি করে? একই কাজ স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে তাঁর অর্দ্ধ বয়সী মহিলা যদি করতে পারদর্শিনী হন এই ভয়ে Seniors Panel থেকে আমার নামটা বাদ দিয়ে দিলেন যাতে ভবিষ্যতে আমি সেই কাজের সুযোগ না পাই। আহা, তিনি অকালে প্রাণ হারালেন। না হলে দেখতেন শুধু মাত্র কোলকাতা উচ্চ আদালতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে আমি প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার, বিচারপতির পদ অলংকৃত করি। আইনের জগতে আমার কোনো দাদা, মামা, কাকা ছিলেন না যে তাঁরা আমাকে দড়ি ধরে উপরে উঠাবেন।

জীবনে যত বাধা এসেছে তত উদ্দম বেড়েছে, কি করে সেই বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাবো, সুপ্রতিষ্ঠিত হব।

সমাজসেবা, জনহিতকর কল্যাণমূলক কাজে বাড়তি সময় নিয়োজিত করি। ছোট্ট ছোট্ট পুস্তিকা রূপে বিভিন্ন আইন সহজ

সরল বাংলা ভাষায় লিখে বিনা পারিশ্রমিকে দিয়েছি **Women's Co-ordinating Council** কে ভারতের সহরে, গ্রামে, গঞ্জে বিলিয়ে দিতে যাতে ভারতীয় মহিলারা তাদের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হন। নিজেদের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে সক্ষম হন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহিলারা সব আদ্যাশক্তির অংশজাত। সুতরাং তাঁরা অবলীলাক্রমে সাংসারিক কাজে, পারিবারিক কর্তব্যে ও তদউপরে পেশাগত কাজে সুনিপুন হতে সক্ষম। তার পরিবর্তে তাঁদের দাবী শুধু শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও আত্ম মর্যাদা।

যা পেয়েছি

ডঃ ফুল্লরেণু গুহ (এম, পি)

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স আমার সবে। জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখছি সংসারে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে ব্যবহারের তারতম্য। ছেলেরা যেন জন্মেছে সবকিছু চাইবার আর পাবার অধিকারটুকু সঙ্গে নিয়েই। আর মেয়ে? সেতো শুধু দুর্বোঘাস। কিছুদিন পরেই তো উখড়ে ফেলে দিতে হবে পরের উঠোনে। এ বাড়িতে যে ক'দিন আছ থাক কোন রকমে ঘরের একপাশে। ঘরে ঘরে ঠাকুমা দিদিমাদের মনোভাব ছিল তখন এই রকম। আর অনেক সংসারের অন্দরমহলেই তাঁদের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল যেদিন বেরলো সেদিন ঠাকমা বললেন, "অনেক হয়েছে এবার ভালো ঘর বর দেখে পার করার ব্যবস্থা করো মেয়েকে।"

ঠাকমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে শক্ত হয়ে এই প্রথম বললাম আমি "না"।

"না"? না আবার কি? অবাক ঠাকমা রিতিমতন। বিরক্ত তার থেকেও বেশী।

মায়ের ইস্কুলে পড়া দশ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর তেরো বছর বয়স হতে না হতেই মস্ত এক সংসারে গিয়ে বসতে হয়েছে একেবারে বৌয়ের পদে। সবতাতেই ভয় পাওয়া, সংসারে সব্বাইকে খুশি করতে সদা ব্যস্ত সন্ত্রস্ত মানুষটার বুকের মধ্যে অহরহ মাথা কুটেছে কত যে ভীরু ইচ্ছে, সাধ আর স্বপ্ন। সেই সব ব্যর্থ স্বপ্ন বুকের মধ্যে নিয়ে জীবনের এই প্রান্তবেলায় সবকিছু বাধার সামনে তাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছেন আমাকে সব কাজে।

এত সাহস কোথা থেকে পেয়েছিলেন মা জানিনা। পড়াশোনা করতে খুব ভালবাসতেন মা, দেখেছি চিরদিন। বাবা ছিলেন উদার মুক্ত মনের মানুষ। যে কোনো সমাজের অগ্রগতির জন্যে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা যে খুবই জরুরি একথা বিশ্বাস করতেন বাবা মনে প্রাণে। সংসারের নানা বাধা-নিষেধের প্রতিবন্ধকতায় মাকে স্কুল কলেজে লেখাপড়া করবার সুযোগ বাবা করে দিতে পারেন নি হয়তো ইচ্ছে থাকলেও, কিন্তু প্রতিদিন বেশ কতগুলো খবরের কাগজ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী এইসব মাসিক পত্রিকা ছাড়াও ইতিহাসের নানা বই কিনতেন ও আনতেন বাবা মাকে পড়াবার জন্যে। সংসারের সব কাজকর্ম শেষ করে মা পড়তেন সেসব রাত জেগে। এই পড়াশোনাই হয়তো সেই অন্ধকার একটা সমাজে বসেও বদলে দিয়েছিল মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু সংসার আর সন্তান মানুষ করা ছাড়াও মানুষ হিসেবে মেয়েদেরও যে আরো কিছু করবার আছে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন বোধহয় মা এই কথাটাও। সংসারে শুধু মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে তাঁর নিজের আর গোটা নারী সমাজটারই বঞ্চনার পরিমাণটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বড় নিষ্ঠুর সত্যে।

অবশ্য এত বাধা নিষেধের কঠিন শাসানি সত্ত্বেও বেশ কিছু মেয়ে সে পাঁচিল ভেঙে বেড়িয়ে পড়েছেন তখন বাইরের জগতে। বি, এ, এম, এ, পাশ করেছেন তো বেশ অনেকজনই। ডাক্তার হয়েও বেরিয়েছেন কয়েকজন। সাহিত্যে, সাংবাদিকতাতেও সার্থকতার সাক্ষর রেখেছেন স্বর্ণময়ী, সরলাবালা, মানকুমারী, কামিনী রায়ের মতন উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্ক। অবশ্য আজকের বিচারের মাপকাঠিতে স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি তার শত ভাগের এক ভাগও জোটেনি সেদিন তাঁদের কপালে। কিন্তু চারদিক ছাওয়া নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে অনেকখানি আশ্বাস বয়ে আনে জোনাকির আলোটুকুও আর সেই ভরসায় পথখানি ধরেই তো সেদিন এগিয়েছিলাম আমরা আলোর সন্ধানে।

যাই হোক, ম্যাট্রিক পাশ করে মায়ের ইচ্ছে আর বাবার চেষ্টায় এলাম কলেজে পড়তে। কিন্তু ভালো মেয়েটির মতন শুধু পড়াশোনা করে মন ভরে না কিছুতেই। মায়ের কাছে ছেলেবেলায় শোনা মনীষীদের কাহিনী রক্তের মধ্যে দোলা দিতে শুরু করেছে ততদিনে। এদিকে তখন গোটা বাংলাদেশ জুড়ে জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের আগুন। সেই আগুনের শিখা অনির্বাণ হয়ে জ্বলে উঠলো আমারো বুকের মধ্যে। আগেই সামান্য যোগাযোগ, ছিল এবার পুরোদমে যোগ দিয়ে কাজ শুরু হলো যুগান্তর দলে। কিন্তু······মস্তবড় কিন্তুর দ্বিধা কি বাধা হয়ে দাঁড়ালো উজ্জ্বল এক আলোর ভাস্বরতার সামনে এসেও? সেই বাধা বুঝি মেয়ে মানুষ এই পরিচয়টাই।

'জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে যাবার শপথ নেওয়া সত্ত্বেও বেশীরভাগ সময়ই আমাদের মেয়েদের শুধু ভার দেওয়া হত এক জায়গা থেকে অন্যখানে অস্ত্র বা চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার। সাড়ি পরতাম বা মেয়ে বলেই সেগুলো লুকোবার সুবিধে ছিল আমাদের বেশী। তাই। কিন্তু তাও তো কিছু পাওয়া। তবুতো খানিকটা করা। মেনে নাও এই ব্যবস্থাটাই। পড়শোনা শিখলে মেয়েরা বিধবা হয় এই চিন্তার যুগ থেকে আমরা সমাজকে হয়তো এগিয়ে আনতে পেরেছি ততদিনে কিছুটা। যুদ্ধ করতে হয়েছে তার জন্যে প্রাণপণ, আর সেই যুদ্ধে বাধা দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী মেয়েরাই। ঠাকমা, দিদিমা, শাশুড়ি, মা, মাসি হয়ে। পরিণত এই জীবনে অতীতের দিকে ফিরে বিচার করতে বসে আজ মনে হয়, মেয়েদের স্বাধিকার কথাটার সত্যিকার মানে কি? কিসের স্বাধীনতা? কার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া? দশ বছর বয়সে বাধ্য হয়ে স্কুলের পাঠ শেষ করা মা চাননি, অনেকখানি প্রতিশ্রুতি আর এক বুক ইচ্ছে নিয়ে তাঁর মেয়েটিও তাঁরই মতন চারদেওয়ালের অবরোধের নিষ্ঠুর শাসনে ঝড়ে যাক বিফলে। নিঃশব্দে মা তাই যুদ্ধ করেছিলেন সেই হৃদয়হীন সমাজের প্রতিভূর মতন ঠাকমার সঙ্গে। কিন্তু সেই অসম যুদ্ধে কি তিনি সত্যি সত্যি জয়ী হতে পারতেন যদি না

অনমনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেন বাবা? স্ত্রী স্বাধীনতা যদি হয় সমাজে মেয়েদের বাঁচবার অধিকারটুকু আদায় করে নেওয়া তবে আগে ভাবতে হবে সমাজ মানে কি? সমাজ কি সেই মনুর সময় থেকে শুধু পুরুষশাসিত অন্ধ একটা সংস্কারের গণ্ডি? তাই যদি হয় তবে তা ভাঙতেও পুরুষের সাহায্যই তো আছে বেশী। নয় কি? সমাজে সতীদাহ প্রথা কে কবে প্রচলন করেছিলেন সে প্রসঙ্গ থাক, কিন্তু সেই বিভৎস একটা নিয়মের বিরুদ্ধে কি প্রতিবাদে সোচ্চার হতে শোনা গেছে সেদিন একটিও মেয়েকে? অবশ্য বলা চলতে পারে যে মেয়েদের সেদিন কোনো অস্তিত্বই ছিলনা সমাজে-সংসারে। সাহস ছিল না নিজেদের কোনো দুঃখের কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করবার। প্রতিবাদ তো অনেক দূরের কথা। এত সত্ত্বেও কিন্তু এসে পড়ে বিধবা বিবাহের কথা। কত যুগ পার হয়ে গেলো, বিদ্যাসাগর তাবৎ শাস্ত্র ঘেঁটে, অখণ্ড যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে বিধবাবিবাহ কোনদিন শাস্ত্রে বা আদি সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। আজও থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু তবু বিধবাবিবাহের কথায় আজো ভুরু কুঁচকিয়ে তোলেন না কি মেয়েরাই সবচেয়ে আগে? পথে-ঘাটে, নিজের নিজের কর্মক্ষেত্র বা যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে অতি অল্পবয়সী একটি বিধবার একটু উচ্ছলতা বা উজ্জ্বল বেশবাসের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখেন না কি মেয়েরাই আগে? ঠোঁটের কোণে কোণে ভেসে ওঠে নাকি বিদ্রূপের সূক্ষ্ম একটুখানি চাপা হাসি, কানে কানে চাপা ফিসফিসিনি? অথচ চল্লিশ পেরনো এক প্রৌঢ়ের স্ত্রীবিয়োগের একটি বছর পার হতে না হতেই আবার তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবার ব্যবস্থা করে দেন তাঁরাই নতুন উৎসাহে।

প্রাণীজগতের সাধারণ নিয়মেই সবল দুর্বলের ওপর সুবিধে নিয়ে থাকে বেশী। মানুষ বুদ্ধিমান জীব তাই তার সুবিধে ভোগের ধারাটা ভিন্নতর। অর্থাৎ শুধু শারীরিক নয় অর্থ নৈতিকভাবে মেয়েরা যতদিন স্বাধীন না হবে ততদিন নিজের মর্যদার আসনটা

তাকে ছেড়ে দেবেনা কেউই। এই কথাটাই আজ ভাববার সময় এসেছে সকলের, বিশেষ করে মেয়েদের সবচেয়ে বেশী।

অল্প বয়সে সস্নেহ সাহচর্যে দুস্তর বাধার পথটুকু পার করে দিয়েছিলেন আমাকে বাবা ও মা। আগেই বলেছি তখনকার দিনেও বাবা বিশ্বাস করতেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা আর মানুষের মতন বাঁচবার অধিকারে। বাবার এই বিশ্বাস মারও ছিল। তাই কলকাতায় কলেজে হস্টেলে থেকে পড়াশোনাতেও আপত্তি করেননি বাবা এতটুকু। কিন্তু হস্টেলের খাওয়া দাওয়া বা যে কোনো কারণেই হোক শরীর ভেঙ্গে পড়লো কলকাতায় তাই আবার এসে ভর্ত্তি হলাম বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে। সহশিক্ষা সে কলেজে। একসঙ্গে পড়াশোনা ছেলেমেয়েদের। কিন্তু তাহলে কি হবে, কড়া পর্দার অন্তরালে থাকা উচিৎ যে মেয়েদের তারা এতকালের সব অবরোধ ভেঙ্গে একবার বেরোতে পারলে বুঝি রসাতলে যাবে ব্রহ্মাণ্ডটা। মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা সেইজন্যে ক্লাসের একধারে উঁচু একটা কাঠের পার্টিশনের পেছনে। "কেন?" প্রশ্ন জেগেছিল মনে সেদিনই। নারী-পুরুষের বিভেদের যুক্তিহীন একটা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ইচ্ছেটা উপ্ত হয়েছিল বোধহয় তখন থেকেই।

বাবার পরে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর এক মানুষ। দেখা হয়েছিল, চিনতাম ছোটবেলা থেকেই। চটপট করে নানারকম দেশ-বিদেশের কথা বলার অভ্যেস ছিলো। কলকাতায় পড়তে এসে বীরেশ গুহ ও তার বন্ধু-বান্ধব, একদলে রাজনীতিতে যুক্ত হলাম। রাজনীতিতে পড়াশুনো ও কাজকর্ম, লেবার পার্টি ও কমুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হলো। স্বাভাবিক জানাশোনা। লোক অনেক। জানতে পারি যুগান্তরে একদিন ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন। তাতে আরো ঘনিষ্ঠ হই।

তা সে যাই হোক, বাড়িতে এদিকে তখন শুরু হয়েছে ঝড়। সংসারে চলে আসা কোন নিয়মকানুন মানেনা, পর পুরুষ দেখে সঙ্কোচে সাত হাত ঘোমটা টানেনা মুখে, উল্টে তাদের সঙ্গে পায়ে

পা মিলিয়ে ঝাঁপ দেওয়া রক্তমাখা বিপ্লবী দলে! মেয়ে নয় এ যে শুধু একটা ঘুর্ণী ঝড়? এ মেয়ে নিয়ে কি করে হবে এখন সংসারের মান রক্ষে? ১৯৩৪ সালে এম, এ, পাশ করতেই এইসব ঝামেলা থেকে দূরে সরাতে ঠাকমার ভাষায় 'দস্যি মেয়েটাকে' পাঠিয়ে দেওয়া হলো একেবারে সকলের নাগালের বাইরে লণ্ডনে 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিসে" পড়বার জন্যে। দূরে গেলাম কিন্তু রক্তের মধ্যে জ্বলছে যে প্রতিজ্ঞার আগুন অতলান্ত এক সমুদ্রও তো নেভাতে পারলনা তার দহন। যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়তে পারলাম না তাই কিছুতেই। ছাড়তে চাইলামও না। মনস্থির করে ফেলেছি তখন বীরেশচন্দ্রের ব্যাপারেও। সবকিছু নিয়মভাঙ্গা সৃষ্টিছাড়া জীবনটাতে সঙ্গী যদি নিতেই হয় তাহলে তো বোঝাপড়া হতে হবে এমনিই শক্ত বন্ধনের ভিত্তিতে। ভেবেছিলাম সেদিন বারবার। আর "আমার ফাঁসি হলেও থমকাবে না, সামনের দিকে এগিয়ে যাবে স্থির পায়ে।" জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করা মানুষটা ভেবেছিলেন আরো একটু বেশী।

কিন্তু ঝড় উঠলো বীরেশ চন্দ্রের সংসারে। মা ছিলেন রাজনীতি সচেতন মহিলা অথচ নিজের ছেলের বেলায় জেগে উঠলো অন্য মন। সঙ্কল্পে স্থির থেকেছি তবুও বীরেশ চন্দ্রের সহযোগিতায়। ব্রজমোহন কলেজে মেয়েদের সামনে মস্তবড় বাধার মত দাঁড় করানো সেই কাঠের পার্টিশানটা বারবার ভেসে উঠেছে আমার চোখের সামনে। আমি ভাঙ্গবো এইসব অন্ধ পাঁচিলের শাসন। শুধু রান্নাঘর আর সংসার ছাড়াও যে মেয়েদের অন্য একটা জীবন আছে, আছে আর একটা জগৎ এই কথাটা বোঝাব আমি সংসারে থেকেই।

এমনি করেই সমাজের সব অন্ধ ভ্রুকুটি ভাঙবার প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে নিজের সংসারের নিশ্চিন্ত সুখের আশ্রয়খানি নিতান্ত অবহেলায় ভেঙ্গে ফেলে বেশ কিছু মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিপ্লবী দলে। জীবন-মৃত্যুকে বরণ করে কাজ করে চলেছেন নিঃশঙ্ক মনে প্রাণে। পরবর্তী-কালেও গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে যোগ দিয়েছেন সংগ্রামে।

এদিকে সারা ভারত জুড়ে নেমেছে তখন বেয়াল্লিশের আন্দোলনের জোয়ার। "ইংরেজ ভারত ছাড়ো! বিদেশী শাসক দূর হটো!" গর্জে উঠেছে দেশের যৌবন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ছোট ছোট প্রেম-ভালবাসা আর ঘর সংসারের স্বপ্ন হারিয়ে গেছে তখন কোথায় কত ছেলে-মেয়ের।

এলো তেতাল্লিশ সাল। বাংলাদেশে ইংরেজের ইচ্ছাকৃত আর পরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষে পথে ঘাটে মরতে শুরু করেছে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ। সর্বনাশা সেই মৃত্যুর তাণ্ডবে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ হারিয়ে গেলো আমারো কোথায়। কাজ শুরু করলাম ওদের জন্যে। কিন্তু জীবনের সঞ্চয় থেকে বড় তাড়াতাড়ি ঝরে যাচ্ছে দিন। সময় কি এখনো হয়নি তবু? বিশ্বাসী প্রতিক্ষায় নিঃশব্দ বীরেশচন্দ্র। এদিকে এতোদিনে অনেক সহিষ্ণুতার শেষে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন বীরেশচন্দ্রের মা। মনের জোরও বুঝি নেই আর আগের মতন তাই জীবনের সায়াহ্ন বেলায় সুস্থিত দেখে যেতে চান জেদি ছেলেটাকে।

অনেক বাধার পথ পেরিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝার রাত কাটিয়ে দুটি উত্তাল জীবন স্রোত গতি নিলো শেষ পর্যন্ত এক পথে। বিয়ে হলো কিন্তু একেবারে সাদাসিধে ধরনের রেজিস্ট্রি করে। কোন রকম বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পছন্দ হত না আমার কোনদিনই। রেজিস্ট্রির পর এসে উঠলাম শ্বশুর বাড়িতে মস্তবড় একটা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে।

বিয়ে হয়ে এবাড়িতে এসেও মেয়েদের দেখলাম সেই একই অবস্থা। এতবড় একটা মোটামুটি সচ্ছল সংসারে মানুষজন তো কম নেই, তবু ঘরের মেয়ে বৌয়েরা সেই কাক ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত হিমসিম শুধু রান্নাঘরেই ভাঁড়ার বার করা, তরকারি কোটা আর পরিবেশনের তদারকিতে। এর মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই অন্য কিছু চিন্তাটুকুও করবার। স্বামী-সন্তানের সেবা করা, গুছিয়ে সংসার করা ছাড়া মেয়েদের জীবনে আছেই কি অন্য আর কিছু? থাকাটা উচিতই নাকি? যুগযুগের সংস্কারে বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা-জানলা

গুলোতে শক্ত হয়ে পড়ে গেছে বিশ্বাসের যে মরচে তা ভাঙ্গবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় রক্ত ঝরলো শুধু দুহাত বেয়ে।

ক্ষোভে, দুঃখে বিকল হয়ে উঠেছে মন বারবার। কিন্তু হতাশ হলে তো চলবে না। কাজ করতে হবে যে আমাকে এদের মধ্যে থেকেই। বড় দুরূহ সে কাজ। হয়তো বা বিপ্লবের সেই রক্তাক্ত দিনগুলো থেকেও কঠিন। তবু তো এগোতে হবে সামনের দিকে লক্ষ্য রেখেই। দিক বদলালাম তাই। মস্তবড় একান্নাবর্তী পরিবার সম্বন্ধে যাদের খুব স্পষ্ট একটা ধারণা নেই তাঁরা হয়তো ভাবেন যে সেখানে ব্যক্তি সত্ত্বা হারিয়ে যায় সমষ্টির স্বার্থে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। এতবড় একটা বাড়িতে এত মানুষের মধ্যে কে কখন কোথায় যায় আসে, কখন খায় এইসব খুঁটিনাটি নিয়ে ধরে বসে থাকবার সময় নেই কারুর। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগালাম আমি অনেকখানি। মস্তবড় সুবিধে ছিলো স্বামীর সর্বাঙ্গীন সহ-যোগিতা। ছোটবেলা থেকে মন ঝুঁকেছিলো পার্টির সংগঠন কাজে। দেশে ফিরে এসে যোগ দিলাম সেকাজে সক্রিয়ভাবে। শুধু কাজ আর কাজ। কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে যায় দিনরাত যেন বুঝতেই পারিনা ঠিক করে। গ্রামে, গঞ্জে যাই আর দেখি মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশা, হতাশা আর বঞ্চনার দুর্ভোগ। বিশেষ করে মেয়েদের। শহরের দিগন্তে যদি বা আভাস দিয়েছে এক টুকরো মেঘভাঙা আলোর, ওদের জীবনে শুধুই যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অনেকদিন আগে সেই কলেজ জীবনে মনের মধ্যে তোলপাড় করা প্রতিজ্ঞাটা যেন আবার ভয়ানকভাবে নাড়া দিলো আমার সমস্ত অস্তিত্বটা ধরে। ক্লাশে শুধু ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে কাঠের পার্টিশানটাই নয়, ভাঙ্গতে হবে নারী আর পুরুষের মধ্যে গণ্ডিটানা অমোঘ সীমারেখাটা। ভাষা আর সাহস দিতে হবে এই সব অসহায় বোবা মুখে সব বঞ্চনা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। ছিঁড়তে হবে বহুকাল জমে থাকা একটা ভারি সংস্কার আর অন্ধকারের পর্দা। কাজটা আজও সহজ নয়, কিন্তু তখন ছিলো আরো কঠিন প্রায় দুঃসাধ্য একটা

ব্যাপার। কাজে নামতেই প্রচণ্ড বাধা এলো চারদিক থেকে। স্ত্রীশিক্ষা বা মেয়েদের কিছু বেশ অগ্রগতি শুরু হয়ে গেছে তখন। তবুও।

এলো ১৯৪৬ এর সেই ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব। ঘর ছেড়ে চলে গেলাম নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে। ঘরে বাইরে নানা কাজের মধ্যে দেখতে দেখতে কাটলো একটা বছর। এলো বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা কিন্তু সঙ্গে বাংলার বুক জুড়ে নেমে এলো সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিন। দেশ ভাগ হলো আর তার ফলে নিঃস্ব, বিপর্যস্ত, ছিন্নমূল হাজার হাজার মানুষ দলে দলে এসে আশ্রয় নিলো শিয়ালদহ স্টেশনে। এতদিন যে রক্তের পথ মাড়িয়ে এসেছি বিদেশী শক্তির হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে আজ শেষ হয়েছে সে যুদ্ধের। কিন্তু একি মূল্য তার?

বিপ্লবের ঝাণ্ডা নামিয়ে রেখে তাই এবার এসে দাঁড়ালাম দেশের স্বাধীনতার মূল্যে চোদ্দো পুরুষের ভিটেমাটি হারানো অসহায় মানুষ-গুলোর পাশে। কিন্তু কত যে বাধা, বিরূপতা আর ছোট ছোট স্বার্থের সংঘাত সে পথেও! তবু কাজ করেছি। জানিনা শুধু মানুষ হিসেবে নয় 'মেয়েমানুষ' হিসেবে এত বাধা-বিপত্তি, পায়ে পায়ে নিষেধের বেড়াজাল ডিঙ্গনো সেই কাজে সফল হয়েছি কতটা। কিন্তু যা করেছি তার মধ্যে স্পর্শ করেনি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কোনো চিন্তা। আর্ত অসহায় মানুষের সেবা কাজ আমার অতি সাধারণ অস্তিত্বটা জুড়ে বেজে উঠেছিলো একটা সঙ্গীতের মতন। বেজে চলেছে আজো। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় করা হবে যে, দিনের পর দিন যে পরিবারের বাইরে থেকে কাজ করেছি তাতে আমার শাশুড়ি থেকে পরিবারের কেউই বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আজ সে কথা।

ব্যবহারিক জীবনে একদিকে এসেছে যেমন দুস্তর বাধা-বিঘ্ন আর গ্লানি তেমনিই আবার পেয়েছি অনেক সম্মান, স্বীকৃতি আর মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা। জীবনে যখন যেভাবেই কাজ করেছি

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহকর্মী পেয়েছি অনেক। সব কাজের সফলতায় তাদের সাহায্য না পেলে কিছুই করা সম্ভব হতনা। কিন্তু যাদের জন্যে এই প্রচেষ্টা তাদের সত্যিকার কোনো উপকারে যদি সার্থক হয়ে থাকে এই প্রয়াস, ঘরে ঘরে আশা-বিশ্বাস হারানো মানুষগুলো নিশ্চিদ্র অন্ধকারের মধ্যে যদি দেখতে পেয়ে থাকে একটু জীবনের আলো, একটি মেয়েও যদি নিজের অধিকারে দাঁড়াতে পেরে থাকে নিজের মর্যাদা আর গৌরবের শক্ত মাটির ওপর তবে ধন্য মনে করবো নিজের জীবন।

আশায় আলোয়

লীনা চক্রবর্ত্তী (আই. এ. এস)

"হ্যাগো, বলতে পার আমার মা কখন আসবে?" চার বছরের একটি শিশু দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে নিচে অফিসঘরের সামনে দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করা ব্যস্ত মানুষগুলোকে ডেকে ডেকে। আমি তখন জেলা শাসক হাওড়া জেলার। ১৯৭৮ সালের বন্যার সময়। অফিসে কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড। যে বাড়ীতে অফিস তারই ওপর তলায় ছিল আমার কোয়ার্টার্স। চার বছরের-বাচ্চাটাকে ছেড়ে আসতাম ভোর বেলায় তারপর কেমন করে কোথা দিয়ে কেটে যেত গোটা দিনটা খেয়াল থাকত না। কাজের চাপ পড়ে যায় এখনো অনেক সময়। কিন্তু চার বছরের সেই শিশু এখন তেরো বছরের হয়েছে। এই বয়সে বুঝতে শিখেছে, মা ব্যস্ত কাজে। বাড়ীতে মাথার ওপরে আছেন শাশুড়ি। ছোটবেলা থেকে ঠাকমাই হাতে করে মানুষ করেছেন দুই ছেলেকে। দুচোখের দুটি মণি তারা দুজন। তবু—। এই তবুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয় বোধহয় কোনো শিশুর পক্ষেই। মায়েরও নয়। নিজের জীবনে বারবার এমন ঘটনা ঘটায় সমস্যার কথাটা ভাবি একটু বেশী করে।

মায়েরা যাঁরা আজ বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন কর্মক্ষেত্রে এই বন্ধন তো মস্ত একটা বাধার মতন জড়িয়ে থাকেই তাঁদের পায়ে পায়ে। সুখের হোক, দুঃখের হোক, এই যে একটা ভয়ানক পিছুডাক একে বুকে নিয়েই তো চলতে হয় তাঁদের পথে। একটি সংসার বা সন্তান নারীপুরুষের যৌথ সৃষ্টি কিন্তু সন্তানের প্রতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই যে দায়দায়িত্বের ভার এসে বর্তায় মায়ের ওপর তা কি বাবার থাকতে পারে? মেয়েদের থেকে পুরুষেরা তাই

মুক্ত অনেকখানি। আর শক্ত করে বন্ধ ঝিনুকের মধ্যে ধুকপুক করা রূপকথার রাজকন্যার প্রাণ ভোমরাটির মতন নারীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বোধহয় এটাই। শারীরিক, মানসিক এই দুর্বলতার মূল্যই দিতে হচ্ছে মেয়েদের লক্ষ কোটি বছর ধরে সৃষ্টির সেই প্রথম দিনটি থেকেই। কিন্তু এর মধ্যেই তবু আজ এসেছে নতুন করে ভাববার দিন।

পড়াশোনা ভালবাসতাম খুব ছোটবেলা থেকে। ভাগ্যগুণে জন্মেছিলাম এমন একটা পরিবারে যেখানে নিজেদের বাড়িতে তো বটেই, মামাবাড়ির দিকেও লেখাপড়ার চর্চা আর মূল্য ছিল সব থেকে ওপরে। ঠাকমার যুগে মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার কোনো ব্যবস্থা ছিলনা তাই পড়াশোনা করেছিলেন তিনি ঘরে বসেই। কিন্তু তাই বলে সে বিদ্যা অর্জনে ফাঁকি ছিল না এতটুকু। দাদাদের সঙ্গে সমান করে পাঠ নিয়েছিলেন ঠাকমা নানা বিষয়ে। নানা শাস্ত্রে। উত্তরকালে গ্রামান্তর থেকে মানুষ ভিড় করে আসতেন ঠাকমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে। তাঁর কথকতা শুনতে। অথচ সেই যুগের মানুষেরই তো বিশ্বাস ছিল যে লেখাপড়া করলে মেয়েরা বিধবা হয়! তাহলে বাধাটা সেদিনও যেমন ছিল অনেকটাই শুধু একটা পরিবারগত সংস্কার তারই ধারা কি বয়ে চলছে না আজো, এই বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও? শিক্ষাদীক্ষা বা জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যে মেয়েরা এখন এগিয়ে চলেছেন অনেক তবু একটি কন্যা সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিবারের বুকে নেমে আসে চাপা একটা বিষন্নতার ছায়া। এর কারণ অবশ্য বহু কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ বোধহয় মেয়ের বিয়ের সময়কার ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলো। অনাদি অনন্তকাল ধরে সমাজের বুকে যা জেগে আছে বিষাক্ত একটা ক্ষতের মতন। এই একই কারণে অল্পবিত্তের মানুষেরা ছেলের তুলনায় মেয়ের লেখাপড়ায় আগ্রহী হন অনেক কম। একেবারে সাধারণ একটা স্কুলে পড়লেও বই খাতা, স্কুলের পোষাক, টিফিন, যাতায়াত খরচ, এইসব নিয়ে খরচা তো খুব একটা কম পড়েনা। এর পরও যদি আবার সেই মেয়ের বিয়ের পণ,

যৌতুক ইত্যাদিতে ঢালতে হয় আরো কয়েক হাজার তাহলে! একটি কন্যা সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে এই কয়েক হাজারের বিভীষিকাই বোধহয় কালো মেঘ হয়ে নামে পরিবার পরিজনের মুখে। শাঁখ বাজেনা তার আবির্ভাবে। কোনো মঙ্গল উৎসবে আনন্দ ঘণায় না একটিও উৎসুক চোখে।

মঙ্গল উৎসবের যে আসল রূপ সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ কি থাকে মেয়ের বিয়ের সময়েই কোনো মধ্যবিত্ত মা-বাবার চোখে মুখে? একটি মেয়ে কৈশোর পার হয়ে উঠতে না উঠতেই ঘুমহীন রাত নামে মা-বাবার চোখে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। টাকা চাই। চাইতো কিন্তু আসবে কোথা থেকে? সংসারে মোটা ভাত-কাপড় বজায় রাখতেই যেখানে হিমসিম জীবন সেখানে আবার সঞ্চয়ের চিন্তা! আর শুধু কি টাকা? মেয়েকে পাত্রস্থ করতে প্রতি পদে কি পরিমাণ দুর্ভোগ আর হীনমন্যতা স্বীকার করতে হয় তাতো জানেন পাত্রীপক্ষ মাত্রই।

আজ কিন্তু আমি কথাটা ভাবি আর এক দিক দিয়ে। ভাবি মেয়েরা আজ আক্ষরিক অর্থে অনেকখানি লেখাপড়া শিখেও এইসব লজ্জাকর ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হন কজন? কজন ভাবেন এই অপমান বা হীনমন্যতার দায় মা-বাবার থেকেও বেশী তাঁরই? ক'টা মেয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়ে বলেন 'থাক, এমনভাবে জীবন শুরু করা থেকে অনূঢ়া থাকাই আমার শতগুণে ভালো।' আরো নির্মম সত্যি কথাটা বলতে গেলে বলতেই হবে যে শতকরা নব্বুইটি মেয়েরই বোধহয় নিঃশব্দ সমর্থন থাকে পাত্রপক্ষের দাবীদাওয়ার দিকেই। গয়নাগাটি, খাট-পালঙ্ক ওরা চাইলেও শেষ পর্যন্ত হবে তো সেসব তারই। পৈতৃক সম্পত্তিতে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও এখন সমান অধিকার তবু মেয়ের বিয়ের সময় এইসব দাবী ওঠে কোন যুক্তিতে?

পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে নারীমুক্তি আন্দোলন কোন রূপ নিয়েছে বা নিলে ভালো হয় কিনা আমি জানিনা কিন্তু আমাদের

দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা হওয়া উচিৎ পণপ্রথার বিলোপ। এই জঘন্য প্রথা কবে থেকে কেমন করে চল হয়েছিল সে অন্য আলোচনা কিন্তু এখন বোধহয় সময় এসেছে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার একটা মানসিকতা মেয়েদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার। আট বছরে গৌরীদানের দিন এখন আর নেই। তবু এখনো কি মেয়েরা বুঝতে পারেনা যে ভোগ্যপণ্যের মতন তাকে নিয়ে এই নাড়াচাড়া, দরদস্তুর এটা তার পক্ষে কতখানি লজ্জার? আর এরই জন্যে পরিবার থেকে সামাজিক জীবনেও তার যতকিছু সব দুর্ভোগ আর অপমান? আমি একটা সাধারণ মানুষ নিজের অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত হতে চাই মানুষের সমাজে। বিকোতে চাইনা পণ্য হিসেবে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয়ে যতদিন না সঞ্চারিত হবে প্রতিটি মেয়ের বোধে ততদিন এই হীনমন্যতা তাকে স্বীকার করতেই হবে।

মেয়ে হয়ে জন্মেও নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলবার পাঠ নিয়েছি আমি আমার বাবার কাছেই। বাবা ছিলেন শিক্ষাবিদ্। ধীরস্থির সত্যনিষ্ঠ একটা সত্যিকার মানুষ। জীবনযাপনে একেবারে সাদাসিধে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বাবা। সেখানেই কেটেছে আমাদের ছেলেবেলা। বাবা যে শুধু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন তাই নয়, নিজের পরিবারে বা সমাজজীবনে ছেলে আর মেয়ে বলে কোনো প্রভেদ বা পক্ষপাতিত্ব পছন্দ করতেন না একেবারেই। মাও যেন সেই উজ্জ্বল আলোতে অভিষিক্ত হয়েই এসেছিলেন আমাদের পরিবারে। ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন বিয়ের আগেই। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি আর পাঁচজনের সঙ্গে থেকেই পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েট।

এইরকম একটা পারিবারিক পটভূমিকায় মানুষ হয়ে ছোটবেলা থেকে কোনো ব্যাপারেই কোনরকম বাধা মাথা তুলে দাঁড়ায়নি আমার নিজের জীবনে। কিন্তু তবু বারবার ভাবিয়ে তুলেছে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বড় চেনা, বারবার দেখা নৈমিত্তিক কত ঘটনা। যে দেশে আজো বহু পরিবারে শুধু ভালো লেখাপড়া কেন, ভালোটা

খেতে, ভালো পরতে দেওয়া হয় বেছে বেছে শুধু বাড়ির ছেলেদেরই সে দেশের মেয়েরা আজো দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের কোন স্তরে? স্ত্রী স্বাধীনতা কথাটা নিয়ে এত হৈ-রৈ করবার আগে আমরা কি ভেবে দেখি যে দাবীটা সত্যিকরে কার কাছে? দেবেই বা কে? প্রতিটি সংসারে ছেলে আর মেয়ের এই যে বিভেদ এটা কি করেন বাড়ির পুরুষ মানুষেরা? সংসারের ভেতরে অর্থাৎ অন্তঃপুরের অন্দরে যে সব ঘটনা ঘটে তারজন্যে কতটা দায়ী সংসারের কর্তা? পুত্রবধূ নিগ্রহে শ্বশুরের থেকে শাশুড়ি যে অনেক দড়ো এ বিষয়ে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। পরিবারে বিধবা একটি মেয়েকে যত অত্যাচার সইতে হয় মেয়েদের হাতে তার শতাংশের এক অংশও আসেনা বোধহয় পুরুষ মানুষদের কাছ থেকে।

তাহলে নারীমুক্তি আন্দোলন কথাটার আসল উদ্দেশ্য বা মানে কি? আন্দোলন মানে যদি সমাজ সংস্কার হয় তাহলে তো আমাদের দেশে এই আন্দোলন হওয়া উচিৎ প্রতিটি পরিবারে মেয়েদের নিজেদেরই জন্মগত কুসংস্কার আর দুর্বলতার বিরুদ্ধে। তাই যদি না হবে তাহলে আমাদের সমাজে কটা মেয়ে নিজের পরিবারেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে দাবী করতে পারে নিজের প্রাপ্য অধিকারটুকুই? গ্রামেগঞ্জে অল্পশিক্ষিত বা একেবারেই অক্ষরপরিচয়-হীন মেয়েরা, নিজেদের ভালমন্দ বোঝবার অধিকারটুকুও যাদের দেওয়া হয়নি কোনদিন তাদের সমস্যা বা কথা আলাদা। কিন্তু শহরে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, এমন কি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার মেয়েরাও বিয়ের সময় 'কনে দেখা আলোয়' সেজেগুজে 'নতচোখে' এসে বসেন পাত্রপক্ষের সব পরীক্ষার সামনে। মনে মনে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত বা আরো বেশী বলতে, নিদারুণ অপমান বোধে জ্বালা ধরে হয়তো বুকের ভেতরটা কিন্তু তবু প্রতিবাদে সোচ্চার হবার সাহস থাকে তাদের মধ্যে কজনের? আর শুধু বিয়ের আগেই বা কেন, বিয়ের পরেও একই ভীরু সঙ্কোচে একটি শিক্ষিত পরিণত বয়সের মেয়ে একেবারে অজানা অচেনা একটা মানুষকে না বুঝে না চিনে তার ব্যক্তিগত রুচি আর

চিন্তাধারার সঙ্গে একটুও পরিচিত না হয়ে একটি শান্তশিষ্ট বাধ্য মেয়ের মতন নির্বিবাদে গিয়ে বসেন বিয়ের পিঁড়িতে। তারপর কিছুদিন না যেতেই সব কল্পনা আর স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে যখন দেখেন যে জীবনের প্রতিটি স্তরে দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে বিপরীত দুই মেরুতে তখন? শতকরা নব্বুইটি মেয়ে উথলে ওঠা বিদ্বেষ, ক্ষোভ আর সব হতাশা বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে টেনে চলেন তখন সংসারের নামে শুধু একটা বিড়ম্বনা। শতকরা দশটি মেয়েও কি সহজে বা নির্ভয়ে মাথা তুলে বেরিয়ে আসতে পারেন সেই ঘুণে ধরা সংসারটার বেড়া ভেঙে? আর আসতে পারাটাও যে খুব একটা সহজ কাজ তাও তো নয়। স্ত্রী-ত্যাগী পুরুষের কোনই সঙ্কোচ বা লজ্জা নেই সমাজে কিন্তু যতবড় কারণেই হোক নিজের স্বামী-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসা একটি মেয়ের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যায় সব দরজা। আত্মীয় পরিজন আর পরিচিত পরিমণ্ডল সোচ্চার হয়ে ওঠে নানা ধরনের স্বাদু আলোচনায়। এতবড় ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস থাকে খুব কম মেয়েরই বুকে। আর সেই দুর্ব্বলতাই যুগযুগ ধরে গোটা নারী সমাজটার ওপর এত সহজে প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরুষের জয়। স্ত্রীর ওপর স্বামীর। এই সমস্যার ঠিকমতন সমাধান যতদিন না হবে ততদিন নারীমুক্তি আন্দোলন ব্যাপারটা হয়ে থাকবে শুধুমাত্র একটা অর্থহীন শব্দের ঝঙ্কার। বাস্তব জীবনে কাজে আসবেনা কিছুই।

আমার বাবা বলতেন মেয়েরা শুধু সন্তানেরই জন্ম দেয়না তারা সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বাবার নির্দেশে আমাদের পরিবারে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে কাজ করতে হতো ঘরে বাইরে। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা সহজ আত্ম-বিশ্বাস। আর এই আত্মবিশ্বাসের ফলেই পরিবারে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে পড়াশোনা কাজকর্ম বা অন্য যে কোনো ব্যাপারে বা ব্যবহারে যে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে এ কথাটা আমরা ভাবিইনি কোনদিন।

একজন শিক্ষাবিদ্ বলেই হয়তো বাবার ইচ্ছে ছিল ফিলসফিতে

এম. এ. করবার পর গবেষণা করি ওরই কোনো একটা বিষয় নিয়ে। বাবার ইচ্ছে মতন কিছুদিন গবেষণার কাজ করেও শেষ পর্যন্ত মনস্থ করলাম আই. এ. এস. দিতে। বাবা বা মা সেদিনও বিরক্ত হন নি তার জন্যে এতটুকু। আবার আই. এ. এস. শেষ করার পর যখন যেতে হলো পুনেতে নতুন কাজে যোগ দিতে তখনো একটি নেহাতই অল্পবয়সী মেয়েকে অতখানি দূরে একা পাঠাতে দ্বিধা করেন নি তাঁরা একটও। আমার মা-বাবার দৃষ্টি যদি এতখানি সহজ আর পরিচ্ছন্ন না হতো তাহলে আজ আমারো জীবন হয়তো বইতো অন্য ধারায়। সমাজের তাতে আসত যেত কতটুকু ?

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার তুলনায় নানা কারণে হাওড়া একটু বেশী সমস্যাসঙ্কুল জেলা। সেখানে যখন আমি প্রথম জেলা শাসক হয়ে যাই তখন আই. এ. এস. করে এলেও একজন মেয়ে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা জেলায় আসার সম্ভাবনাতেই ভয়ঙ্কর আপত্তির প্রায় ঝড় উঠেছিল দিকে দিকে। অথচ ইন্দিরা গান্ধীর মতন 'মেয়েমানুষ' তখন প্রধানমন্ত্রী দেশে! তাহলে এটাকে কি বলা যাবে? মেয়েদের প্রতি এই যে একটা অনাস্থা বা অবজ্ঞার ভাব এর কারণটা কি? মুলটাই বা কোথায়? হাজার হাজার বছরের সংস্কার আমাদের রক্তে মজ্জায় কি এমনভাবেই মিশে গেছে যা ক্ষণা, গার্গেয়ী, মৈত্রেয়ী, ঝাঁসির রানী, রানী রাসমনী, সরজিনী নাইডু, ইন্দিরা গান্ধীর তুলনাতেও সরেনা এতটুকু? ওদের সব ভয় ভাবনাকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়ে হাওড়া জেলায় কাজ করেছি আমি বেশ সহজ স্বচ্ছন্দেই। আজ সি. এম. ডি. এর মতন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে অনেকখানি দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে বোধহয় প্রমাণ করতে পেরেছি যে সুযোগ আর সুবিধে পেলে মেয়েরাও সব কাজই করতে পারে সমান সার্থকতা আর সাহসের সঙ্গেই।

কিন্তু এ সমস্যার সমাধান শুধু কয়েকজন মেয়ের দুটো একটা কাজে কোনরকমে ছিটকে-ছাটকে এসে পড়লেই তো হবেনা।

পথেঘাটে নারী মুক্তি আন্দোলন বলে সভাসমিতি করেও নয়। এ সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র পথ ঘরে ঘরে মায়েদের চেতনা জাগিয়ে তোলা। প্রতিটি সংসারে মা যদি ছেলে আর মেয়ে, বিভেদের এই চিরন্তন সীমারেখাটা এমন শক্ত হাতে টেনে না রাখেন তাহলে শৈশব থেকেই মেয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবেনা একটা হীনমন্যতার ভাব। যেমন হয়নি আমাদের। আর বাড়ির ছেলেটিও ছোটবেলা থেকেই ভাবতে শিখবেনা যে আমি 'পুরুষমানুষ'। আমি জন্মেছি সব কিছু পাবার চাবিকাঠিটি হাতে নিয়ে একটা মুক্ত স্বাধীন মানুষ হয়ে। বরং জ্ঞান হবার সময় থেকে বাড়ির মেয়েদেরও সমান অধিকার আর সম্মানে বড় হয়ে উঠতে দেখলে মেয়েরা যে নেহাৎই একটা অবজ্ঞা আর অবহেলার পাত্রী এই ভাবটা ছায়া ফেলতে পারবে না, বা আরো সহজ করে বললে বলা যায় যে, চিন্তাটা যে সম্ভব এই কথাটা আসবেইনা কোনদিন তাদের মনের কোণে। উত্তরজীবনে নিজের স্ত্রীকেও তার প্রাপ্য সম্মানের আসনটি এগিয়ে দিতে দ্বিধা হবেনা এতটুকু।

বাবাই সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মায়ের কথা? ও না শুনলেও চলে। মাতো রাঁধে-বাড়ে, সংসার চালায়। মা নাহলে চলেই না মোটে এক মুহূর্তও কিন্তু তাই বলেই তাকে যে খুব একটা গণ্য করবার দরকার তাও নয়। বাবার চোখ দিয়ে দেখে আসা সন্তানের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা যতদিন না বদলাবে ততদিন ভয়ঙ্কর এই সংক্রামক ব্যাধির উপসম হবেনা কিছুতেই। অনাগত আরো কয়েকটা শতাব্দীতেও নয়।

নারী-পুরুষ মিলে শুরু করেন একটা নতুন সংসার। দুজনে মিলে সব কর্তব্য আর দায়ভার ভাগ করে নেন সমান করে। অন্তত কথা তো তাই। কিন্তু বাস্তব জীবনে কটা সংসারে স্ত্রী পান তাঁর প্রাপ্য জায়গাটা? সংসারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার তো কথাই ওঠেনা, স্পষ্ট করে নিজের বিশেষ কিছু পছন্দ-অপছন্দ বা একান্ত একটা ইচ্ছেও জানাবার সাহস থাকে কজন

গৃহকর্ত্রীর ? এই ছবিতো আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই অহরহ। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা না থাকার ফলেই নাকি নারীকে থাকতে হয় পুরুষের অধীনে। কিন্তু যেসব মেয়েরা চাকরি বা অন্য কোনো কাজকর্ম করেন সেখানেও তো অনেক সময়েই শোনা যায় যে বাইরের জগতে স্বামী থেকে পদমর্যাদায় উঁচু হলেও ঘরে কিন্তু থাকতে হয় গৃহিণীকে স্বামীর নিচেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে পরামর্শ করে সংসার করাটা একটা স্বীকৃত নিয়ম। কাজের বেলায় কিন্তু স্বামীর কথা বা ইচ্ছেটাই দাঁড়ায় বড় হয়ে। স্বামী থেকে উঁচু পদে অধিষ্ঠিত স্ত্রীকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয় বরং যেন আরো একটু বেশী! আর শুধু ঘরেই কেন, এই প্রসঙ্গে জনান্তিকে চুপিচুপি একটা কথা বলে নিই যে শারীরিক শক্তিতে কম বলেই বোধহয় মেয়েদের মনের জোর আর ধৈর্য পুরুষের থেকে বেশী। অন্তত নিজেদের কর্মক্ষেত্রে, প্রশাসনিক কাজে চলতে পারেন প্রয়োজন মতন মনমাথা ঠাণ্ডা রেখে, বুঝেশুনে। তবু মহিলা কর্মকর্তা যতই বড় চেয়ারখানায় বসুন না কেন তাঁকে চলতে হয় প্রতি ক্ষেত্রে বুঝেশুনে। অধস্তনদের সঙ্গেও কথা বলতে হয় ভালো করে ভেবেচিন্তে। একে তো একজন মেয়ে হয়ে অনধিকার প্রবেশ এতবড় একটা ঘরের মস্ত চেয়ারটাতে তার ওপর যখন তখন আবার এত ফটফটানী কথা! সর্বনাশ।

নতুন পথ

ইলা চৌধুরী (এ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার, পুলিশ)

জীবনটাকে দেখি আমি খুব খোলা চোখে একেবারে সোজাসুজি। ১৯৪৮ সালে বি. এ. পাশ করি বেথুন কলেজ থেকে। বাবা সাধারণ কাজ করতেন। আমরা ছিলাম ছয় বোন এক ভাই। বড় সংসার। বাবার কাজের সময়েই চলত প্রায় খুঁড়িয়ে এখন রিটায়ার করবার পর তো আর কথাই নেই। বিয়ে হয়েছে শুধু বড়দির। মেজদির বিয়ের কথাবার্তাও পাকা। পারিবারিক এই পটভূমিতে আমার বেশী পড়াশোনার কথা উঠতেই পারে না আর। সুতরাং চাকরি খোঁজা। খোঁজা তো ভালো কথা, কিন্তু খুঁজবো বললেই তো আর গাছের পাকা ফলটির মতন আমার হাতের মধ্যে এসে পড়বে না সেই পরম ঈপ্সিত ধনটি।

বিদেশী শক্তির হাত থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন সবে। অনেকদিনের নির্দিষ্ট একটা পথে চলতে চলতে মস্তবড় একখানা জাহাজ হঠাৎ যেন বদলেছে গতিপথ। সামনে যদিও আছে একটা স্থির লক্ষ্য তবু মাথার ওপর এসে পড়েছে দেশ বিভাগের মতন ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। ফলে ছিন্নভিন্ন গোটা পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি। স্বাভাবিক ভাবেই তার ধাক্কা এসে লেগেছে মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনেও।

আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি মাসি, পিসি বা দিদিদের জীবন যন্ত্রনা। প্রতিটি দিনের প্রতি মুহূর্ত তাদের ঘেরা থাকত শতশত নিষেধের শাসানিতে। তবে তার মধ্যেই ন'বছরের গৌরীদানের প্রথা রহিত হয়েছে প্রায়। অরক্ষণীয়া 'হেমের' দায় গলায় নিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মতন মায়েদের আর মরতে হয়না তুষের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে। তবে ঐ পর্যন্তই। নারী মুক্তি তখন কোনো রকমে বাড়ির

উঠোন থেকে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়লেও পথেঘাটে অনাত্মীয় পুরুষের মুখ দেখা বারণ তখনো প্রায় চোদ্দো আনা মেয়ের ক্ষেত্রেই। ঘেরাটোপ দেওয়া গাড়ির মধ্যে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে অনূঢ়া মেয়েরা যায় স্কুলে কলেজে। সঙ্গে পাহারা বাড়ির চাকর-দারোয়ান।

তা সে ধাক্কাও আমরা কাটিয়ে আসছিলাম তখন কোনরকমে বুঝি শম্বুক গতিতে। ঘেরাটোপ গাড়ি ছেড়ে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে চড়ছি ট্রামে-বাসে। নূপুর আর আলতা ছেড়ে জুতো মোজা পরে পথ চলছি সোজা পায়ে। জানিনা এই গতি আমাদের টেনে নিয়ে যেত কতদিনে কতখানি দূর পর্যন্ত, কিন্তু দুশো বছরের শৃঙ্খল-ভাঙা সদ্য স্বাধীনতা তার ওপর দেশ বিভাগ ভয়ানক একটা পরিবর্তন এনে দিল জাতীয়, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে একেবারে হঠাৎ করে।

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে এসেছে তখন অনেকটাই। সংসারে কমেছে ঠাকমা পিসিমাদের একছত্র আধিপত্য। যে আধিপত্যের দাপটে নাভিশ্বাস উঠত মা-জ্যেঠিমাদের সংসারে মেয়ে হয়ে, বৌ হয়ে। এখন ঘরে ঘরে একান্তভাবে নিজের সংসারে সন্তানের ব্যাপারে যে কোনো মত দেবার অধিকার হয়েছে মায়েদের। পরিবারে বিশেষ করে মেয়েদের চলাফেরায় সদা সর্বদা ভীষণ একটা শাসনের ভ্রূকুটি সরে গিয়ে লেগেছে খানিকটা সুস্থ বাতাসের স্বাচ্ছন্দ্য। সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠেছি আমরা খানিকটা মাথা উঁচু করেই। তাই বাবা রিটায়ার করাতে সংসারে যে একটা ভয়ানক ধাক্কা এলো সেটা সামলাতে শক্ত পায়ে এগিয়ে এলাম আমি। না এসে উপায়ও তো ছিলনা আর কিছু।

চাকরির কথায় আপত্তির প্রশ্ন আসেই না তখন কোনো দিক দিয়ে। দিক বলতে অবশ্য সেদিন মেয়েদের সামনে খোলা ছিল কয়েকটা মোটে পথ। পেশা হিসেবে তখনো ডাক্তারদের জায়গা দেওয়া হত অনেক ওপরে। তার প্রায় পাশে পাশেই ইস্কুল-কলেজে শিক্ষকতা। উকিল, ব্যারিস্টার? মেয়েরা! সম্ভবপর কথা নাকি

এ আবার একটা ? ? অফিস ? ভালো কাজ নয় মোটেই। নার্সিং—মানে নাইট ডিউটি ? সর্বনাশ। দিন নেই, রাত নেই ঘরের বাইরে থাকবে মেয়ে। তারপরেও চরিত্র টরিত্র ঠিক আছে বলে মানবে কেউ ? মেয়েমানুষ বলে কথা ?

আমার চাকরি করার কথাতেও সেই সমস্যাটাই উঠলো সবচেয়ে বড় হয়ে। মা বললেন চাকরি যদি করতেই হয় তাহলে স্কুলে করো। বাবার মতটাও তাই। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই একঘেয়ে কোনো কাজে অনীহা আমার প্রচণ্ড। প্রতিদিন এক নিয়মে এক সময়ে স্কুলে যাও। পড়াও একই বিষয় প্রতিদিন একই ক্লাসের ছাত্রীদের। বাড়ি এস। খাতা দেখ। অসম্ভব।

কি করতে চাও তবে তুমি ? মেয়ে হয়ে এর থেকে আর কি বেশী ?

কেন সেই একঘেয়ে পথেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে ? নতুন একটা কিছু কি করা যায় না ?

নতুন কিছু ? সেটা আবার কি ? অবাক মা। সন্ত্রস্তও যেন খানিকটা।

ভাবছি আমিও তো তাই। কিন্তু ভাববারও বেশী সময় নেই তো তখন হাতে। হাল ধরতে হবে প্রায় ডুবন্ত একটা নৌকর। এমনি দ্বিধাবিভক্ত উদ্বেল যখন মনের অবস্থা তখন একদিন একেবারে হঠাৎ যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন কাগজে বেরলো একটা বিজ্ঞাপন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে খোলা হবে মহিলা অফিসারের পদ।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কিরণশঙ্কর রায়ের হাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ওঁদেরই মনোগত ইচ্ছে যে, স্বাধীন দেশে যে কোনো ব্যাপারেই হোক মেয়েদের মোকাবিলা করা উচিত মেয়েদেরই। তাই প্রথম দফায় নেওয়া হবে ন'জন সাবইন্‌স্‌পেক্টর আর তেইশজন এ্যাসিট্যান্ট সাবইন্‌স্‌পেক্টর।

সমস্ত মনপ্রাণ নেচে উঠলো আমার এই খবরটুকু পড়েই। এইতো পেয়েছি আমার পথ। এই তো একটা জীবিকা যার মধ্যে প্রতি

মুহূর্তে অনুভব করা যাবে জীবনের স্পন্দন। জীবনকে জানা যাবে একেবারে অজানা পরিবেশে। নতুন অভিজ্ঞতায়।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা কিন্তু বেঁকে বসলেন একেবারে শক্ত নিষেধে কঠিন হয়ে। পুলিশ? মেয়ে পুলিশ! মেয়ে কাজ করবে পুলিশ হয়ে? তাও আবার আমাদের ঘরের মেয়ে!

অন্য কোনো কাজের কথা চিন্তা করলে ভালো হত না মা? অতটা বিরুদ্ধে না হলেও দ্বিধান্বিত বাবাও।

দোষ কি এই কাজেই? একেবারে নতুন একটা দিক। দেখিই না একবার পরখ করে!

না। গেরস্থঘরের মেয়ে, বাপের ক্ষমতা থাকলে এই বয়সে বিয়ে-থা করে যেতে নিজের সংসার করতে। আমার কপালে তো নতুন একটা যাত্রা পালার মতন শ্বশুরবাড়ি না পাঠিয়ে সংসার চালাতে মেয়েকে পাঠাতে হচ্ছে রোজগারে। তা যখন করতেই হবে তখন পাঁচটা ভদ্রঘরের মেয়ে যা করে তেমনি করো। ভালো কোনো স্কুলে টিচারি নাও। তা নয় একেবারে মেয়ে পুলিশ! ফাল্গুনের সুনীল আকাশ থেকে হঠাৎ যেন নামলো নারকোলের মাপের এক একখানা শিলাবৃষ্টি একেবারে ঠিক মায়ের মাথার ওপরে। মেয়ের উদ্ভট কথাবার্তারো তো একটা সীমা আছে!

কিন্তু অজানা তখন হাতছানি দিয়েছে আমাকে দূর থেকে তাই শক্ত হলাম আমিও সমান জিদে। এরপর কি হত, কোথায় শেষ হত জানিনে, কিন্তু এর মধ্যেই এসে পড়লেন মামা! মামা যে শুধু দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তাই নয়, তাঁর নিঃস্বার্থ অনাবিল চরিত্র, নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা আর বিশেষ করে উদার মতের জন্যে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সকলের। মামা চিরকাল চলতেন তাঁর সময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে তাই স্বভাবতই আমার চিরাচরিত পথ থেকে নতুন একটা দিকে যাওয়ার চেষ্টাটাকে স্বাগত করলেন তিনি খুবই উৎসাহ নিয়ে। মামার মত বা কথার একটা ওজন ছিল আমাদের পরিবারে তাই প্রচণ্ড আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাজি হলেন মা শেষ পর্যন্ত।

ভর্তি হলাম পুলিশে। অবশ্য যতটা সহজে বললাম, ব্যাপারটা মোটেই ঘটেনি অতটা সহজে। প্রথমেতো ইণ্টারভিউয়েরই মস্ত জোরালো আর লম্বা একটা ব্যাপার চললো বেশ কয়েক দিন ধরে। একেবারে হঠাৎ করে পুরো একটা নারী বাহিনী নিয়োগ! আমার তো মনে হয় একেবারে নতুন একটা ব্যাপার স্যাপারে প্রথম ইনটারভিউ দিতে এসে আমাদের বুক যতটা দুর দুর করেছিল তার থেকে কিছুমাত্র কম করেনি যাঁরা ইনটারভিউ নিচ্ছিলেন তাঁদেরও। তা সে বেশ কতগুলো ঝঞ্ঝাট আর পরীক্ষা-টরিক্ষার পর মনোনীত হলাম আমরা নজন গ্র্যাজুয়েট সাবইন্‌স্‌পেকটরের পদে। এবার ট্রেনিং এর পালা। সব প্রথম নিয়ম ট্রেনিংএর জন্যে বাধ্যতামুলক হস্টেল বাস। হস্টেল ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে।

ঘরে ঘরে মায়েদের ভুরু কুঁচকে উঠলো আবার নতুন করে। এমন সব ভয়ঙ্কর ভয়জনক (?) বয়সের মেয়েগুলো বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে গিয়ে থাকবে নাকি সেই সাহেব পাড়ার হোস্টেলে! সর্বনাশ! কিন্তু যতই সর্বনেশে কাণ্ড হোক ভর্তি তো আমরা তখন হয়েই গেছি। আপত্তি থাকলেই বা আর উপায়টা কি? একদিন সকালে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে বত্রিশটি অবলা (?) নারী তাই একেবারে অজানা অচেনা একটা জীবনের পথে পা বাড়ালাম থিরথিরে কাঁপা একবুক ভয় নিয়ে। ভয় শুধু অজানা কাজের জন্যেই নয়, বেশী ভয় পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজে। স্কুলে-কলেজে লেখাপড়া করলেও আমরা বেশীর-ভাগ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা থেকেছি পুরুষ জগত থেকে শত হাত দূরে। সেই সংস্কার, অভ্যেস, ভয় আর জড়তা বারবার বাধা হয়ে জড়িয়েছে পায়ে পায়ে। কিন্তু আমরা তো এখন শুধু নারী নই, আমরা নারী পুলিশ বাহিনী। কত কঠোর কর্তব্যের জীবন সামনে আমাদের। মনকে বারবার বোঝাই বুক টান করে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু মন যে তবু মানেনা কিছুতেই। প্রথম বিপত্তি ট্রেনিংএ প্যাণ্ট্‌স্‌ আর বুশ সার্ট পরে প্যারেড করতে এসে। ওরে বাবারে বাবা, সে কি আর সহজে পারি? লজ্জায়, অস্বস্তিতে ঘেমে নেয়ে একেবারে

হৈ-হৈ ব্যাপার একখানা। এতকাল দিন কেটেছে চারদেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে বন্ধ জীবনে। খেলাধুলো, দৌড়দৌড়ির পাট বন্ধ হয়েছে সেই তো তেরো বছর বয়স পার না হতেই। তারপর থেকেই, 'তুমি মেয়ে, আস্তে হাঁটো, আস্তে নড়ো, নরম করে দাঁড়াও, ছোট্ট করে হাঁ করো……' শিখে আসা তো এই সবই। এখন হঠাৎ করে সকাল সন্ধ্যে এত নাচানাচি নেয় নাকি আর মরচে ধরে যাওয়া শক্ত হাড়গোড়? এক একটা প্যারেডের শেষে সর্বাঙ্গে তাই বিষের ব্যথা, মনে প্যান্ট-সার্ট পরবার নিদারুন বিভীষিকা, বাড়ির জন্যে ভয়ানক মন কেমন……নতুন পথে হাঁটা বুঝি আর হলোনা কিছুতেই।

কিন্তু ধন্যবাদ সত্যি সত্যি মস্ত মাপের স্নেহময় দরদী মানুষটাকে। তিনি পুলিশ কমিশনার শ্রীপি. কে. সেন। তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ, উৎসাহ আর আন্তরিক সহহোগিতা না পেলে আজ রাশভারী এই পদটিতে না বসে হয়তো বসতাম গিয়ে বেশ বড়সড় একটা সংসারের মোটাসোটা গিন্নির আসনখানিতে জম্পেশ করে গুছিয়ে গাছিয়ে।

তা সে যাহোক, অনভ্যেসের কুটকুটে ফোঁটাটাও সহ্য হয়ে এলো দেখতে দেখতে আর যতটা অসহ্য মনে হয়েছিল ততটা খারাপ লাগলো না নতুন জীবনটা শেষ পর্যন্ত। এক বছর চললো ট্রেনিং তারপর ১৯৪৯ সালে পোস্টিং হলাম কাজে। ডিউটি পড়লো বিধানসভায় প্রথম দিনই! তাতেও কিন্তু ভয় পাইনি। এই এক বছর কামারশালে হাতুড়ির পিটুনি আর হাপরের জ্বলুনিতে তৈরি হয়ে গেছি শক্ত ছাঁচে গড়া পুলিশ এক একটি। ভয়ডর আর অত সহজে ভেড়েনা কাছে পিঠে। মেয়ে বলে আমাদের দায়িত্ব ছিল সব রাজনৈতিক দলের শোভাযাত্রা বা পথসভায় মহিলাদের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা। তাদের গ্রেফতার বা সার্চিংএর প্রয়োজন হলে তা করা। কিন্তু বড় ব্যথার সঙ্গে আজ মনে হয় যে এ কাজে তাদের কাছ থেকে বাধা বা বিরুদ্ধতা যত না এসেছে তার থেকে শতগুণ বেশী অভদ্র, অশালীন ব্যবহার করেছে সাধারণ মানুষ। আমরা মেয়ে, শুধু এই অপরাধে অশ্লীল, কদর্য ভাষায় গালাগাল, বিদ্রূপ আর ধিক্কারে বারবার

বিষিয়ে দিয়েছে ওরা আমাদের নিঃশ্বাস নেবার সুস্থ বাতাসটুকুও। মেয়েদের আর কোনো পেশায় এত বিদ্রূপ, কটাক্ষ আর অপমান সহ্য করতে হয়েছে কিনা আমি জানিনা। একেবারে অজানা নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন যাঁরা প্রথম, এসেছেন বিভিন্ন পেশায় তাঁদেরও সকলকেই কি সহ্য করতে হয়েছে এমনি দুঃখ আর অপমান? জানিনা তাও ঠিকমতন। আমি সমাজ সংস্কারক নই। কোনদিন ভাববারও চেষ্টা করিনি এতবড় কথা, কিন্তু আজ জীবনের অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসে ফেলে আসা অতীতটার দিকে ফিরে দেখতে গেলে সমস্ত মনটা ভরে ওঠে অনাস্বাদিত এক চরিতার্থতার আনন্দে। যে সমাজের চোখ রাঙানিতে একদিন অসহায় মেয়েগুলোকে পুড়ে মরতে হয়েছে মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায়, নবছরে গৌরী হয়ে বসতে হয়েছে গঙ্গাজলি স্বামীর পাশে সেই সমাজেরই রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করে চারিদিক ঘেরা এক অন্ধ দেওয়াল ভেঙ্গে আমরা এগিয়েছি অনেকখানি স্থির এক প্রতিজ্ঞায় পথ চলে। সেদিন সীমাহীন দুঃখে আর হতাশায় বারবার ভেঙ্গে পড়েছিল সমস্ত মন কিন্তু এতদিন ধরে নিয়মশৃঙ্খলার শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে চরিত্রে জেগে উঠেছে বেশ খানিকটা দৃঢ়তা। কোনো পরিস্থিতিতে কোনো কারণেই পরাজয় মেনে নিয়ে সরে আসাটা সম্ভব নয় আর কিছুতেই।

এগিয়ে চললাম দৃঢ়পায়ে। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের সাহায্য অবশ্য পেয়েছি অকুণ্ঠভাবে আর এইভাবে একসঙ্গে কাজ করতে করতে একটা কথা প্রায়ই মনে হয়েছে যে বাইরের জগতের মতন ঘরটাও যদি একটা কর্মক্ষেত্র হত তাহলে সেখানে মেয়েরা হয়তো আজ পুরুষের কাছে আশা করতে পারত এমনি একটু হার্দ পরিমণ্ডল আর বিবেচক সমঝোতা। কারণ অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন আর পরাধীন বলে থাকতো নাতো কেউ। এই সুবাদেই এসে পড়ে নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা, চলেছে যা এখন সারা পৃথিবী জুড়ে। তবু ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় আমার কাছে এখনো বিশেষ। আমি ভাবি নারী মুক্তি মানে কি? কার কাছ থেকে মুক্তি? নারীর বন্ধন তো

সৃষ্টি হয়েছে তার শরীর থেকেই। এ বন্ধন শুরু হয় সন্তান ধারণের দিনটি থেকেই। একটি সন্তানকে ঠিকমতন মানুষ করে তুলতে বাবার থেকে মায়ের দায়িত্ব যে অনেক বেশী সে কথাটাতো ঠিক। সে দায়িত্ব অস্বীকার করতে কোনো মেয়ে চান বা পারেন বলে তো আমার জানা নেই। উচিৎ বলেও আমি মনে করি না। কিন্তু সে দায়িত্ব আছে বলেই মেয়েরা তার দায়ে নিজেদের অন্য সব কিছু, এমনকি ব্যক্তি স্বাধীনতাটুকুও যে বলি দেবে তা কিন্তু ঠিক নয়। আর এই ভুল ধারণা আর আচরণই চলে আসছে সারা পৃথিবী জুড়ে এযাবৎকাল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, বেশীরভাগ পরিবারেই একটি মেয়ে সাধারণ একটা মানুষ বলেও যে স্বাধীনতা, সম্মান বা অধিকার পাওয়া উচিৎ তা পান না আজো। কিন্তু তার জন্যে সমাজ-ব্যবস্থা যতটা দায়ী তার থেকে অনেক বেশী দায়ী আমরা মেয়েরাই। বহু যুগের জমে থাকা সংস্কারই হোক, ভয় হোক বা মেয়েদের স্বভাবগত রক্ষণশীল মানসিকতার জন্যেই হোক মেয়েদের যে কোনো অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েরাই প্রতিটি পরিবারে চিরকাল। সংসারে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে দুস্তর একটা ব্যবধানের সীমারেখা টানেন মায়েরাই সবচেয়ে আগে। শিশু কন্যাটি একটু বড় হয়ে উঠলেই মা বা ঠাকমা-দিদিমারা পাঠ দিতে শুরু করেন, তুমি মেয়ে, তোমার অমুকটা করা উচিৎ নয়। তমুকটা করা কর্তব্য। প্রায় জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে থেকেই ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু 'না' আর 'হ্যাঁ' এর এই দুর্লঙ্ঘ অনুশাসন শুনে আসছে যে আবাহমান কাল ধরে এর থেকেই গড়ে উঠছে সংস্কার বা দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য এরজন্যে কিছুটা দায়ী মেয়েদের শারীরিক গঠন আর দৈহিক শক্তি। বুদ্ধিমত্তায় একটি মেয়ে শিশু ছেলের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। কিন্তু কম শারীরিক শক্তিতে। আর এই অসমতাটাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তাই বলে মেয়েরা যে কোনো কাজই পারেনা বা পারবেনা তাও তো নয়। আর এই কথাটাই বোঝাবার বা বুঝবার দিন এসেছে আজ সমাজের সব স্তরের মানুষের।

নারী মুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গোড়ার কথা বোধহয় এই। একজন মা যদি তার চোখের ওপর থেকে গতানুগতিকের অন্ধ কষিটা খুলে ফেলতে পারেন একবার জোর করে তাহলে তাঁর সংসারের মধ্যে চিরকালের জমে থাকা ভয় আর সংস্কারের অন্ধকারটা সরে গিয়ে ভরে উঠবে একটা সুস্থ আলোর বন্যায়। অন্তত তাঁর মেয়েটি বাঁচবে মুক্ত আকাশের স্বাধীনতায় নিঃশ্বাস নিয়ে। অবশ্য এরজন্যে মেয়েদের সবচেয়ে আগে চাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

অন্নদাতা গ্রহীতার মাথার ওপর শাসনের দণ্ডটা ঘোরাবেই। আর যুগযুগ ধরে আজো প্রায় সব সংসারে অন্নদাতা হয়ে আছেন পরিবারের পুরুষ মানুষটি। কেন, কি করে এই প্রথা প্রচলন হলো সে অন্য আলোচনা, কিন্তু আজ সময় এসেছে মেয়েদের এ সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হবে এতো অবধারিত সত্য। আমি একজন সুস্থ সক্ষম মানুষ অথচ আমার ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যেও নির্ভর করব আর একজন মানুষের ওপর এটাই যে মেয়েদের সব অপমান আর হীনমন্যতার কারণ একথাটা ভাববার সময় এসেছে আজ বিশেষ করে।

সংসারে নিজের সম্মান বা অধিকারের আসনটি অর্জন করতে হয় নিজেকেই। বিনামূল্যে কেউ তা হাত বাড়িয়ে দেয় না কারুকে। আমি সব কিছু সুখ সুবিধে আমার নাগালের মধ্যে পেতে চাইব অথচ তার জন্যে কোনো মূল্য দেবনা তাতো আর হতে পারে না। এই কারণেই মেয়েদের নিজের পায়ে একটা শক্ত মাটির ওপর দাঁড়ানোটা যে সব আগে দরকার এই বোধ মেয়েদের মধ্যে যতদিন ঠিকমত না আসবে ততদিন নারী মুক্তি কথাটা থেকে যাবে শুধু সভা সম্মেলনের বক্তৃতার মধ্যে।

সভা সম্মেলনে নারী মুক্তি আন্দোলন করা থেকে আমার নিজের পরিচিত পরিবেশ, সবচেয়ে আগে নিজের পরিবারের মধ্যে আনা প্রয়োজন এ সম্বন্ধে সুষ্ঠু আর মননশীল সচেতনা। আর তার চেয়েও আগে ভেবে দেখবার দরকার যে নারী মুক্তি কথাটার আসল উদ্দেশ্য

বা অর্থটা কি ? নারী মুক্তি মানে কি দিনের বেশীর ভাগ সময় শুধু ঘরের বাইরে থাকা ? উগ্র প্রসাধন ? পাহাড় ডিঙ্গনো, সমুদ্র পেরনো ? আমি মনে করি নারী মুক্তি মানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক স্বাধীনতা যা বহু যুগ ধরে মেয়েদের অধিকারে নেই একেবারেই। কবির ভাষায় 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার……"এটাই বোধহয় পৃথিবীর সমস্ত নারী সমাজের একমাত্র চাহিদা।

কিন্তু চাহিদা বলেই যে তার জন্যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে যুদ্ধে নামতে হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে সংসারটা যে চলে নারী পুরুষ উভয়ের যৌথ দায়, দায়িত্ব আর সমান অধিকারে এই অতি স্বাভাবিক আর সোজা কথাটা প্রতিটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যদি উপলব্ধি করেন ঠিকভাবে তাহলে একই পৃথিবীর দুই মেরুতে বাস করার মতন স্বাধীনতা-অধীনতা নিয়ে এমনভাবে দড়ি টানাটানি করতে হয়না প্রকাশ্যে যুদ্ধে নেমে। অধীনতা কথাটাই যদি না থাকে তাহলে মুক্তি শব্দটাই বা আসবে কোথা থেকে ? প্রত্যেক নারী যদি ঠিক মতন মর্যাদা পায় নিজের সংসারে তবে সমাজেও সে তার নিজের মূল্য পাবে সহজেই। ঘুচবে স্ত্রী-পুরুষের এই অর্থহীন ব্যবধান।

যে পথে চলেছি

দীপালি নাগ (সংগীত শিল্পী)

দাদু যদিও তখনকার দিনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু গোঁড়া হিন্দু পরিবার বলে পড়াশোনা করতে পারেন নি মা একটুও। আর চাইলেই বা করতেন কখোন? ঘাঘরার ঘের ছেড়ে ভালো করে সাড়িখানা পরতে শিখবার আগেই তো গিয়ে বসতে হলো বিয়ের পিঁড়িতে। তেরো বছর বয়সও পুরো হয়নি বোধহয় তখন। অসামান্য সুন্দরী। ইতিহাসের পাতা ছেড়ে নূরজাহাঁ বেগম আর রানী পদ্মিনীই বুঝি আবার নেমে এসেছেন এই শতাব্দীতে। মেয়েদের বেশী রূপ গুণ সর্বনাশের কারণ—বিশ্বাস বদ্ধমূল তখন মানুষের মনে। এই রূপের পসরা নিয়ে স্বামী তাহলে এখন তাকে রাখেন কোথায়? এমনিতেই তখন বন্দী মেয়েরা ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে চার দেওয়ালের কঠিন প্রহরায়। বছরের মধ্যে বিশেষ কোনো দিন বাইরে বেরুতে হলে সাড়ি-সেমিজের ওপর পুরু করে মোটা চাদরে গোটা শরীরটা ঢেকে ফেলেও রেহাই নেই। অপরিচিত তো প্রকৃতির আলো বাতাসটুকুও। তাই ঘেরাটোপ পালকির চারদিক ঘিরেও। তা সত্ত্বেও বাবার মন সব সময় সন্ত্রস্ত। যদি লাগে বাইরের চোখ! বাড়ির আর পাঁচটা দামী জিনিস সাবধানে সরিয়ে রাখবার মতনই নিজের অধিকারে গোটা মানুষটাকেই তাই বুঝি চিরটা কাল সরিয়ে রেখেছিলেন সকলের চোখের আড়ালে। আর রাখবেন নাই বা কেন? মেয়ে হয়ে জন্মে প্রথম জীবনে থাকবে পিতার রক্ষণায়। বিয়ের পর স্বামীর। আর শেষ বয়স পুত্রের কাছে। এটাই তো ঠিক মতন ব্যবস্থা। মেয়েমানুষ বলে কথা! কারুর ছত্রছায়ায় না থেকে থাকবে কেমন করে নিজের স্বাতন্ত্রে সচ্ছন্দ হয়ে? উচিৎও (?) তো নয় তা। আমার মা'র পড়াশোনার আজন্ম ইচ্ছে চরিতার্থ হলোনা বিয়ের

আগে পিতা ভয়ানকরকম সনাতন সংস্কারবাদী আর বিবাহিত জীবনে নিজের ঘরে স্বামী স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে। যাইহোক সারাজীবন অবদমিত এই জ্ঞান পিপাসাই হয়তো উত্তরকালে মাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ছেলের সঙ্গে মেয়েদেরও সমান শিক্ষা দিতে।

ভাইয়ের সঙ্গে একভাবে স্কুলে-কলেজে গিয়ে পড়াশোনায় এগোতে পারলাম আমরা দুই বোন তাই অনেকটা সহজেই। এই প্রসঙ্গে আর একটু বলে নিই যে সেই সুযোগ পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ, স্নাতকে দ্বিতীয় আর স্নাতকোত্তরে তৃতীয় স্থান রেখে আমি প্রমাণ করে দিতে পারলাম যে পরিবারে ঠিকমতন সময়, সুযোগ আর উৎসাহ পেলে মেয়েরাও ছেলেদের মতনই মেধা আর বোধে পারঙ্গম হয়ে উঠতে পারে সমানভাবে।

তা সে যাহোক, পড়াশোনায় বেশী মনোযোগী বলেই হোক বা একজন মেয়ের পক্ষে স্কুলে-কলেজে এতোখানি এগিয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক অধ্যাপকেরা স্নেহ করতেন আমাকে বিশেষভাবে। সবই তো চলছিল বেশ ভালো আর সাবলীলভাবেই কিন্তু তবু মন যেন কিছুতেই ভরতো না ঠিক মতন। কি যেন একটা পাবার জন্যে, অন্য একটা জগতের ডাক যেন মনের ভেতরটা আকুল করে তুলতো সব সময়।

ইতিহাসের অধ্যাপক বাবা কিন্তু ছিলেন সুরসিক আর বোদ্ধা ভারতীয় মার্গ সংগীতেরও। এই দুর্লভ মণিকাঞ্চন যোগের ফলে বাড়িতে অনেক প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে আসতেন সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সব মানুষজনও। ফৈরাজ খাঁ সাহেবের অগ্রজ তখন গায়ক বরোদার রাজসভার। কোনো একদিন বাড়িতে এসেছিলেন তিনি বাবার সঙ্গে। সেই প্রথম শুনলাম তাঁর গান আর এতদিনের বন্ধ একটা দরজা যেন খুলে গেলো হঠাৎ এক মুহূর্তে। এই তো আমি চেয়েছি এতদিন। এর জন্যেই তো প্রতি মুহূর্তে অশান্ত একটা পাখি যেন বুকের মধ্যে মাথা কুটে চলেছে ক্রমাগত। সুরের এই মায়াজালই আমাকে ডাক দিয়েছে দূর দুরান্ত থেকে প্রতিক্ষণ, অবিরাম।

বাবা, আমি গান শিখব এঁর কাছে। মনস্থির করে বাবার কাছে গিয়ে জানালাম বাসনা।

সংগীত রসিক বাবা খুবই খুশি এই প্রস্তাবে কিন্তু ঝড় উঠলো ঘরে বাইরে এমনকি বোধহয় গোটা আগ্রা শহরটা জুড়েই। ভদ্র গেরস্থ ঘরের মেয়ে নাকি আবার গান শিখে বেড়াবে বাইজীদের মতন? ছিঃ ছিঃ! তাও নাকি আবার মুসলমান ওস্তাদের কাছে! বলে কি! জাতধর্ম, সমাজের নিয়মকানুন থাকবেনা নাকি কিছুই!

গান শিখলে যদি বাইজী হয় তাহলে তোমাদের মা মনসার পাঁচালিতে বেহুলা সুন্দরী ইন্দ্রের রাজসভায় নেচে গেয়েও সতী বলে পুজো পান কেমন করে আজো?

তা না হয় হলো। কিন্তু মেয়ে সন্তান হয়ে সমাজ সংসারের সব নিয়মকানুন ভাসিয়ে দিয়ে বসবে মুসলমানের সামনে গলা ফাটিয়ে চ্যাচাতে! লজ্জাসরম, আবরু-পর্দার বালাই নেই সংসারে? বললে সবাই একযোগে।

আমি মানিনা তোমাদের এই বস্তাপচা ভ্যাদভেদে সব নিয়ম কানুন। এতদিন এত অপেক্ষার পর খুঁজে পেয়েছি আমি আমার পথের ঠিক মতন নিশানা এখন থামব না তো আর ঝড়ঝঞ্ঝার প্রলয়ঙ্কর শত বাধাতেও।

দীর্ঘদিন ধরে শয্যাগত তখন মা। ক্ষীণ হয়ে এসেছে জীবনীশক্তি। কিন্তু তবু অনড় হয়ে রইলেন মা আশ্চর্য দৃঢতায়। 'শুধুমাত্র একটা অর্থহীন সংস্কারের গণ্ডিতে অন্ধ হয়ে আমার বাবা-মা ক্ষতি করেছেন আমার জীবনে অনেক। জীবনে একটা 'মানুষ' হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত করেছেন আমাকে চিরকাল। সেই দুঃখের ঘটনা ঘটতে দেবনা আমি আমার মেয়ের জীবনে কিছুতেই'। বললেন শক্ত আর সাহসী গলায়।

অসীম প্রশ্রয় আর সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন অবশ্য বাবাও অনেকখানি নির্ভীক হয়ে। মার সারাজীবনের দীর্ঘশ্বাস হয়তো সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত করে তুলেছিল তাঁকে জীবন সায়াহ্নে। মার

একান্ত আশীর্বাদ আর বাবার সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা সঙ্গে নিয়ে শুরু হলো আমার সংগীত জীবন। সমাজ সংসার উচ্ছন্নে গেলো বলে দারুণ সোরগোল তুলেছিলেন যেসব আত্মীয় পরিজন তাঁরা এবার একেবারে মুখ ফেরালেন দারুণ ক্ষোভে আর বিরক্তিতে। বন্ধ হলো আমাদের সঙ্গে সব সামাজিক মেলামেশা।

সংগীতে তালিমের সঙ্গে সঙ্গে বাবার ইচ্ছে মতন পড়াশোনাও চলছিল সমানভাবে। স্নাতকোত্তর শেষের দিকে পৌঁছেচি যখন তখন শুরু হলো জীবনের আর একটা দিক চিন্তা করবার পালা। অন্তত মা বাবা বিশেষ করে ভাবতে শুরু করলেন এ বিষয়ে। ভাবলেন তো কিন্তু এদিকে মুশকিল হলো যে হিন্দুঘরে এতখানি লেখাপড়া শেখা মেমসাহেব মেয়েকে ঘরে তুলবে কে সাহস করে? বৌ হলো ঘরের লক্ষ্মী। ছোট্টখাট্টো সেই লক্ষ্মীটি নাকে নোলক দুলিয়ে রাঁধবে-বাড়বে, সংসারে পাঁচজনের সেবাযত্ন করবে, এরমধ্যে পুঁথি পত্তর ঘাঁটবার দরকারটা আবার এলো কোথা থেকে? বেশী লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের মতামত হয়ে যায় বড় বেশী। সেটা কি ভালো?

এইরকম সব মতামত আর নানা পরামর্শের ধাক্কায় যখন একেবারে হিমসিম মা-বাবা তখনই এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে গিয়ে উঠতে হলো বেনারসে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি। ব্রাহ্ম পরিবার। মেয়েদের চলাফেরা, পড়াশোনার ব্যাপারে উদার হয়ে উঠেছেন তাঁরা তখন অনেকখানি। আমার এতখানি বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থেকে পড়াশোনা করাটা কিছুই মন্দ কাজ বলে মনে হলোনা তাঁদের কাছে। তাঁদেরই ছেলে বিদেশ থেকে এসেছেন তখন সবে ফিজিক্স্‌-এ ডক্টরেট করে। আমাকে মনোনীত করলেন ওঁরা সেই ছেলের জন্যে। ব্রাহ্ম বলে একটু কিন্তু করেছিলেন আত্মীয় পরিজন কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে চিরকাল উদারপন্থী বাবা একদম কান দিলেন না সেসব আপত্তি বা পরামর্শে। জাতধর্মের চেয়ে আমার কাছে মানুষ বড়। বললেন বাবা জোর গলায়, উপযুক্ত মেয়ে দেব আমি যোগ্য পাত্রের হাতে। জাত আর ধর্মের হাতে নয়।

বাবার উপার্জনে আমাদের সংসারে তখন বিছনো রয়েছে লক্ষ্মীর সোনার আঁচলখানি। বিশাল বাড়ি, অগুস্তি ঝি-চাকর, দারোয়ান, গাড়ি, ড্রাইভার। সেই বাড়িতে মানুষ হয়ে ওদের সঙ্গে আমাদের আর্থিক বৈষম্যটাই বড় হয়ে উঠেছিল তখন আমার চোখে সবচেয়ে বেশী। বয়সটা নেহাতই অল্প বলেই বোবহয়। বাবার কিন্তু ঠিক রত্নটি চিনে নিতে ভুল হয়নি তখনো এতটুকু।

শোনো মা, মন খারাপ করোনা। এ ছেলে একদিন নিজের জ্ঞানে-গুণে দেশের আর দশের মুখ উজ্জ্বল করবে এ তোমাকে আমি সূর্যের আলোর মতন নিশ্চিত সত্য বলে কথা দিতে পারি। আমার চোখেমুখে সেই দ্বিধার ছবি দেখে বলেছিলেন আশীর্বাদের মতন করে।

বিয়ে হয়ে গেলো। সূর্যের কিরণ যতই তার নিজের জ্যোতিতে ভাস্বর হোক আমার জীবনে তখন তো তা শুধুই মেঘের আড়ালে ঢাকা অন্ধকার। আগ্রার সেই বিরাট বাড়ি ছেড়ে এসে উঠলাম বালিগঞ্জ প্লেসের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে। ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স্‌এর রিডারের আয় আর কতই হবে তখন? কোনরকমে টেনেটুনে তুটো মানুষের পেট হয়তো চলে কিন্তু সংসারের কাজে সাহায্য করবার মতন একটা লোকও ধরানো যায়না আর কিছুতেই। সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই বেরোবেন শ্রীনাগচৌধুরী। তাঁর জন্যে সাতসকালে উঠে উনুন ধরানো, রান্না করা, জল তোলা (জল তুলতে হয় একতলা থেকে দোতলায় বালটিতে টেনে), বাসনমাজা সব করতে হবে একহাতে। সাহায্য করবার জন্যে ঘরে তো অন্য কোনো 'মেয়েমানুষ' নেই, আছে শুধু তুই দেওর। সুতরাং আমার আজীবন সংগীত-সাধনা, সাহিত্য-প্রীতি সব নিঃশেষে ভেসে গেলো একহাতে 'মেয়েমানুষের' সেই সাংসারিক দায় গোছাতে গিয়ে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স্‌এর ডক্টরেট পণ্ডিত স্বামীর সেদিকে মন দেবার সময়ই হয়নি কোনদিন। বা খেয়াল। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো আমার থিসিসের জন্যে যে গবেষণা শুরু করেছিলাম সেই কাজও মাঝখানেই। আজ এতগুলো বছর পার হয়ে এসে যখন তাকাই আবার ফেলে আসা

অতীতের দিকে পরিণত বয়সের চোখ নিয়ে তখন নিরপেক্ষ বিচারের মাপকাঠিতে দেখে মনে হয় আমাদের গোটা সমাজব্যবস্থার মূলেই কি থেকে যায়নি এই গলদ? নারী পুরুষ তুজনকে নিয়েই যদি পূর্ণ হয় একটা সংসার তাহলে তুজনেরই তো সেখানে অধিকার বা দায় থাকা উচিৎ সমান ভাবে। কিন্তু বাস্তবে তা কি হয়েছে কোনদিন পৃথিবীর কোনো দেশে? হয়নি। কারণ অবশ্য তার অনেক। সে তত্ত্বের বিশ্লেষণে না গিয়েও একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে যে সম্মান বা অধিকার কেউ কারুকে হাত বাড়িয়ে দেয়না। সে অধিকার অর্জন করতে হয় নিজেকেই। আমার নিজের জীবন দিয়ে আমিতো অন্তত তাই জানি।

আমার জীবনেও যে শুধু খেয়েপরে বেঁচে থাকা ছাড়া আরো কোনো একটা অর্থ বা লক্ষ্য আছে সেদিকে মনোযোগ দেবার কথাটা খেয়ালই করেননি শ্রীনাগচৌধুরী কোনদিন। বাধাও অবশ্য তিনি দেননি আমার কোনো ইচ্ছে বা প্রচেষ্টাতে ইচ্ছে করে কিন্তু বাধা এসেছে আমার নিজেরই ভেতর থেকে। নারীর চিরকালের সহজাত সংস্কার থেকে আমি চেয়েছি সংসার-অনাশক্ত উদাসীন বিজ্ঞানী মানুষটাকে স্নেহ আর সেবার বাঁধনে বাঁধতে। তাঁর মনোমত হয়ে নিজেকে তৈরী করতে। আমার মতন তাঁকে হতে হবে একথা তো কোনদিন ভাবিনি, আমি নিজেই হতে চেয়েছি তাঁর মতন। ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রতি তাঁর কোনো আশক্তি ছিল না। তিনি ভালবাসতেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত। পাশ্চাত্য সংগীতে মন দিয়েছি আমি তাই তাঁরই জন্যে। তাঁকে ফিরতে হয়নি মার্গ সঙ্গীতের দিকে। ফেরার কথা ভাবতেই কি পারতেন তিনি শুধু আমি চাই বলে? কি জানি।

শারীরিক আর মানসিকভাবে নারী পুরুষের থেকে তুর্বল। সেই তুর্বলতার জন্যেই কবে কোন সেই আদিম যুগ থেকেই হয়তো নারী চেয়েছে পুরুষের মনোরঞ্জন করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে। নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনোরমা করে তুলে সেই পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে যার কাছ থেকে প্রতিদানে কিছু প্রাপ্তির

আশা আছে। তারপর দিনেদিনে এসেছে বিবর্তন। আর সেই ধারায় মানুষ নিজেকে বেঁধেছে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায়। কিন্তু সর্বস্তরে নারী যে পুরুষের থেকে দুর্বল এই সত্যটা তো থেকেই গেছে। তাই হয়তো এই একটি ব্যাপারেই পরিবর্তন আসেনি এত হাজার বছরের ক্রমবিবর্তন সত্ত্বেও। আজো তাই নারীকে সর্বক্ষেত্রে বসতে হয় পুরুষের থেকে নিচের সারিতে। আমেরিকা আর রাশিয়ার মতন দেশেও রাষ্ট্রের কর্ণধার হবার অধিকার পায় না নারী। পায়না দলীয় স্তরে প্রধান হতে। তাই তাবড় তাবড় সব সম্মেলনে সারা পৃথিবী ছেঁকে যখন জরো হন নামীদামী আর বড় বড় মাথাওয়ালা সব মানুষ, কেউ প্রধানমন্ত্রী কেউবা রাষ্ট্রপতি, তার মধ্যে দেখা যায় কটি নারীকে? কি বাইরের জগতে আর কিইবা পরিবারের গণ্ডির মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য ব্যবস্থাটা এত গভীরভাবে উপ্ত হয়ে গেছে আমাদের সংস্কারে যা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছি আমরা সহজ অভ্যেসে। পরিবারে কন্যা সন্তান বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাই তাদেরও বোধে মিশিয়ে দিই এই সহজ সংস্কারটাই সব থেকে বড় করে। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ঠাকমা-দিদিমায়েরা যা করতেন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌঁছে সবদিক থেকে ভয়ানক শিক্ষিতা এই নিদারুণ গর্ব বুকে নিয়েও আমরা মায়েরাই এখনো চালে-চলনে মেয়েকে শিক্ষা দিই শ্বশুরবাড়ি নামক জায়গাটিতে গিয়ে সেখানকার মানুষগুলি বিশেষ করে স্বামীকে বশ করতে হবে নিজের রূপগুণ বিকশিত করে। শেখাই, মেয়েদের এমনি করে হাঁটতে হয়না, শ্বশুরবাড়িতে নিন্দে করবে। ওমনি করে কথা বলতে হয়না। এটা কর্তব্য। ওটা অনুচিত। এত সব পাঠ মেয়ের নিজের সব ব্যক্তি সত্ত্বাকে ভুলিয়ে দিতে একেবারে ছোটবেলা থেকে। আজকালকার দিনে মগজ ধোলাই বলে যে একটা কথা চলেছে অনেকটা তাই আর কি।

আমার ছাত্রীদের মধ্যেও দেখি কাজ করে চিরকালের এই সংস্কার। অনেক সময়ই বড় বড় সব সংগীত সম্মেলনে উপযুক্ত

ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়না অভিভাবকদের আপত্তির জন্যে। মেয়ে গান শিখুক ভালো কথা (হয়তো বা বিয়ের বাজারে বিশেষ একটা গুণ হিসেবে পরিগণিত হবে বলেই) কিন্তু তাই বলে যখন তখন সভাসম্মেলন করে বেড়ানোটা কিছু ভালো দেখায় না সত্যি করে। বাবা-মার তেমন যদি আপত্তি নাও থাকে তাহলেও ভয় পাছে আর পাঁচজন আত্মীয়-বন্ধু যদি কিছু বলে? আর চিরকালের এই ভয় আর সংকোচই হয়ত তাদের বাধ্য করে মেয়েদের এমনি করে একটা অর্থহীন নিষেধের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে। যুক্তি দিয়ে আর সাহস করে এই ভয় বা বাঁধনের গণ্ডি তাঁরা যতদিন পেরতে না পারবেন সমাজ এগোবেনা ততদিন কিছুতেই এক পাও। এগোতে পারে না। অথচ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে ছেলেদের থেকে মেয়েরা শিখতে চায় অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরিশ্রমও করে তারা সেজন্যে বেশী। হয়তো সুযোগ কম পায় বলে ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

সুযোগের কথায় মন আবার চোখ ফেরাতে চায় অতীতের দিকে। আমাদের মা-মাসিদের কথা তো অনেক আগের ব্যাপার। কিন্তু এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেই মেয়েদের গান শেখানো তো দূরের কথা, ছেলে ভোলানো ছড়া ছাড়া আর কোনো সুর গলায় গুনগুনিয়ে উঠলেই ধিক্কার আর গঞ্জনার সীমা থাকতনা পরিবারে। গান করবে শুধু বাইজীরা। খুব ধীর গতিতে হলেও ক্রমে বদলালো একেবারে যুক্তি-হীন অদ্ভুত এই মনোভাব। কাটলো এক নিঃসীম অন্ধকারের রাত। ধীর-গতি বলছি কারণ যতদূর মনে পড়ে তখন পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর চালাতেন 'সংগীত সম্মিলনী' বলে মেয়েদের জন্যে একটি সংগীত শিক্ষায়তন। সেখানে সেদিন ছাত্রী পাওয়াই যেতনা বলে শুনেছি। তবু ধৈর্য আর উৎসাহ নিয়ে চালিয়েছেন তিনি প্রায় এককভাবে সেই প্রতিষ্ঠান শুধু মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্যই। নমস্য তিনি আমাদের। তারপর একটি দুটি করে বাড়তে লাগলো ছাত্রী সংখ্যা। হলো 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি'।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে ঠাকুরবাড়ির ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, প্রতিভা দেবী, সরলাদেবী চৌধুরানীদের কথা। এঁদের কিন্নরকণ্ঠে শুধু যে স্বর ছিল তাই নয় আশ্চর্য প্রতিভা আর অনুরাগ ছিল সংগীতে অথচ ঠাকুরবাড়ির মতন সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে অগ্রণী একটি পরিবারে জন্মেও যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁদের সমাজের কতনা রক্তচক্ষু বাধার সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে কোনো নৃত্যনাট্য বা অভিনয়ের সময় মেয়ে পেতে কি প্রচুর বেগ পেতে হতো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও একথা তো জানি আমরা সকলেই। ছেলেদের সামনে কোনদিন কোনো বাধা তো প্রতিরোধ তুলে দাঁড়ায় না এমনভাবে? অপসৃয়মান অতীত ছায়া ফেলে চলেছে কিছুটা সচ্ছন্দ হতে চাওয়া বর্তমানের ওপর আজো। সাচ্ছন্দ্যটা কি তাহলে নেহাতই মেকি?

ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি জন্মেছিলাম এমন একটি পরিবারে যেখানে বাবা-মা দুজনেরই ছিল শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগ তাই তখনকার দিনেও লেখাপড়া বিশেষ করে গান বাজনা করতে অসুবিধা হয়নি আমার এতটুকু। সমাজের প্রবল বাধা আর রক্তচক্ষুকে মূল্য দেননি বাবা-মা কোনদিনই একথা আগেই বলেছি। বন্দী বিহঙ্গের মতন তাই নিরুপায় যন্ত্রণায় মাথা কুটতে হয়নি আমায় অন্ধ একটা খাঁচার গণ্ডির মধ্যে বরং মুক্ত আনন্দে পাখা মেলেছি উদার আকাশের উজ্জ্বলতায়। ডাক এসেছে নানা আসর অনুষ্ঠান আর দেশবিদেশের সংগীত সম্মেলন থেকে। যোগ দিয়েছি সেসবে নিঃসঙ্কোচে। যোগ দিয়েছি আকাশবাণীতে (তখন অবশ্য আকাশবাণী নামকরণ হয়নি। ছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও)। দুহাতের অঞ্জলি ছাপিয়ে উঠেছে সংগীত জগতের রসিক, বোদ্ধা, পণ্ডিতজন থেকে অসংখ্য মানুষের ভালবাসা আর আশীর্বাদে। এরপর এলো জীবনে পরিবর্তনের পালা। মা-বাবার ঘর ছেড়ে এলাম স্বামীর সংসারে। আজ জীবনের প্রায় প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে সেদিনের সব হিসেব নিকেশ মেলাতে গিয়ে ভাবি যে আমার স্বামী

আমার সংগীত জীবনের প্রতি উদাসীন না থেকে যদি সরব হতেন বিরোধিতায় তাহলে কি আমাকে থেমে পড়তে হতো সেখানেই? একেবারে শিশু বয়স থেকে সংগীত মিশে গেছে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে। এই সংগীতের বিকাশই ছিল আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে তবে কি আমি যুদ্ধ করতাম পারিবারিক যে কোনো প্রতিরোধের সঙ্গে? কে জানে। তবে এতদিন ধরে প্রচুর ছাত্রীকে খুব কাছে পেয়ে আমি দেখেছি যে মেয়েরা সাধারণভাবে মেনেই নেয় এইসব বাধা নিষেধের অবিবেচক অনুশাসন। কত ভালো ভালো প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রী বিয়ের পর চর্চা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে হয় স্বামী নাহয় স্বামীর পরিবারে সংগীতে অনীহা বা বিয়ের পর নতুন বৌয়ের সংসার করা ছাড়া আর কিছু করা শোভন নয় এই সংস্কারে। বিদ্রোহ করেনি শতকরা একটি মেয়েও। তাহলে এ সমস্যার সমাধান কোথায়? সম্ভবই বা হবে কোনদিন কি ভাবে? আমি সমাজ সংস্কারক নই তাই বলতে পারবনা এ সমস্যা সমাধানের সহজ কোনো পথের কথা তবে একটা চিন্তা বড় বেশী দুঃখ হয়ে বুকে বাজে যে আমরা আজ বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে এসেও বসে আছি কোন যে যুগের মনুর বিধান সামনে নিয়ে? সন্তান ধারণ আর তাকে খাদ্য যোগানোর প্রাথমিক দায়িত্ব দিয়ে প্রকৃতিই বেঁধেছে নারীকে সুকঠিন একটা শৃঙ্খলের নাগপাশে। সেই বাঁধন অস্বীকার করতে কোনো মেয়ে চায় বলে বড় একটা শোনা যায়না। কিন্তু এ ছাড়াও মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য বা অধিকারও তো তার আছে? সেই সহজ আর স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে কেন সে চিরকাল? বিয়ের আগে পড়াশোনা, সংগীত বা যে কোনো শিল্পে মেয়েকে পারদর্শিনী করে তুলতে অভিভাবকের যত্ন বা চেষ্টা দেখা যায় আজকাল প্রচুর। কিন্তু আশ্চর্য এক মানসিকতায় সেই মেয়েই বিয়ের পর এসে ওঠে যখন এক নতুন সংসারে বৌ হয়ে তখুনি নানারকম নিষেধের গণ্ডি টানা হতে থাকে তার চারদিকে ক্রমাগত।

অফিসে কর্মরত ছেলে অফিসের কাজের সময় পার হয়ে যাবার অনেক পরে বাড়ি ফিরলেও প্রশ্ন নেই কোনো। হয়তো অফিসেই কাজ ছিল কিংবা দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজন কারুর সঙ্গে। নাহলেও নেহাতই ক্লাব বা তাসপাশার আড্ডা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এইটুকু বিনোদনের দরকার তো থাকবেই মানুষের। উদার হয় বাড়ীর মানুষ সস্নেহ প্রশ্রয়ে। অথচ বেশীরভাগ সংসারেই ঘরের বৌয়ের বেলায় সময়ের গণ্ডি বাঁধা বড় কঠিনভাবে। নববধূ থেকে গৃহিণীত্বে উত্তরণের পর সংসারের নানারকম দায়দায়িত্বে সে বাঁধনের ফাঁস বুঝি ছোট আর কঠিন হয়ে ওঠে আরো বেশী। কারণ তার অনেক।

আমি গানের জগতের মানুষ তাই আমার কথাবার্তা ঘুরে ফিরে আসে এই পৃথিবী ছুঁয়েই। এই প্রসঙ্গে বড় বেশী করে মনে পড়ছে একটা ঘটনা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই আমার থেকে বয়সে ছোট আর বড় স্নেহের। স্বামী সাংবাদিক। স্ত্রী সংগীতশিল্পী। দুজনেই ব্যস্ত নিজের কাজে আর দিনের মধ্যে অনেকখানি সময়ই কাটাতে হয় দুজনকে ঘরের বাইরে। প্রেমজ বিয়ে। জীবন শুরু হয়েছিল বড় সুখে আর আনন্দে কিন্তু আশ্চর্যভাবে পরিবর্তন এলো দিনেদিনে। স্বামীর যা কাজ তাতে বাঁধাধরা নেই আসা যাওয়ার সময়ে। স্ত্রীকেও নিজের গানের ব্যাপারে দিনের অনেকখানি সময় কাটাতে হয় বাইরে। বিরোধের শুরু এখান থেকেই। দিনের যে কোনো সময়েই হোক না কেন, কাজ থেকে ফিরে ক্লান্ত স্বামী চান স্ত্রীকে ঘরে পেতে—সেবায় সাহচর্যেই হয়তো বা। প্রেমজ বিয়ে সুতরাং স্ত্রীর কাজের ধারা আর ঘরের বাইরে ব্যস্ত থাকার কারণ তিনি তো জানতেন আগে থেকেই। তবু। প্রথম প্রথম হয়তো জাগে শুধুই অভিমান তারপর সময়ের সঙ্গে সেই অভিমান পর্যবসিত হয় অবুঝ বিরক্তি আর অসন্তোষে। দিনে রাতে যে কোনা সময়ে বাড়ি ফেরার অবাধ স্বাধীনতা স্বামীর। এ আমার রুজিরোজগারের দায়। কথা উঠলেই বলেন নিঃসংকোচে ভুরু কুঁচকিয়ে। স্ত্রীর অর্থপ্রাপ্তি রোজগার নয়। দরকার নেই, ও তুমি ছেড়ে দাও। সংসার করে মানুষ তার লক্ষ্মীশ্রী আর সৌষ্ঠব

বজায় রাখতেই তো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী তাই সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখতে তাদের সব ভুলে থাকতে হবে অন্দরে। নিজের সাজানো সংসারের গণ্ডির মধ্যে। কথাটা কে কবে বলে গেছেন জানেনা কেউ কিন্তু তবু তা সূর্যচন্দ্রের উদয় অস্তের মতন অমোঘ নিয়মে চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে সচ্ছন্দে! চলছে আজও।

কি করবে তাহলে এখন মেয়েটি? স্বামীর যা আয় তাতে তার রোজগারের হয়তো সত্যিই প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেটাই কি একটা মানুষের জীবনের শেষ কথা? মানুষ হিসেবে তারও তো নিজের একটা আলাদা সত্তা, ইচ্ছে আর জীবনের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সংগীতের যে সাধনায় কেটে গেলো জীবনের এতগুলো বছর তা কি এমন নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে শুধুমাত্র একজনের স্ত্রী আর একটি গৃহের বধূ হবার দায়ে? নাকি সে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এতদিন ধরে জমে থাকা কঠিন একটা সংস্কার আর অভ্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে?

আমি জানিনা এ যুদ্ধ অসম কিনা। জানিনা একক এই যুদ্ধে কোনদিন কোনো ফল ফলবে কিনা। তবে জানি খুব দুর্বল হলেও যুদ্ধ একটা শুরু হয়েছে আজ পারিবারিক আর সামাজিকভাবে। খানিকটা আশার কথা হয়তো এটাই।

চিন্তায় ভাবনায়

পদ্মপর্ণা গাঙ্গুলী (স্থপতি)

এগারোজন ছাত্রী নিয়ে 'নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (আজকের সাউথ ক্যালকাটা কলেজ) তখন সবে পত্তন হয়েছে। আমার দিদিমা সেই এগারোজনের মধ্যে থেকে তখনকার দিনে পাশ করেন আই. এস. সি। দিদিমার কপালগুণে আমার দাদুও প্রচণ্ড উৎসাহী ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষায়। আর শিক্ষা বলতে শুধু যে লেখাপড়া করা তা নয়, নিজের পরিবারে, অর্থাৎ আমার মা-মাসিদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন গানবাজনা, ছবিআঁকা, খেলাধুলো এইসব ব্যাপারেও। স্ত্রীশিক্ষা এমনি করেই এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে তখন একটু জোর পায়েই। আমার পিসিমাও পাশ করেছিলেন আই. এস. সি। এমন একটা পরিবারে যে লেখাপড়ার সার্বিক পরিমণ্ডল থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আমি যে বাড়িতে জন্মেছিলাম তার চারদিকে বেশ কয়েকটা বাগানঘেরা বাড়ি ছিলো। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে চোখ ফেললেই দেখা যেত সেইসব গাছের ফাঁকে সকাল সন্ধ্যে নানারকম আলোর খেলা। শুনতে পাওয়া যেত কত রকম সব পাখির ডাক। জ্ঞান হবার সঙ্গে থেকেই এইরকম একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ হবার জন্যেই বোধহয় প্রচণ্ড ভালবাসা জেগে উঠেছিলো আমার প্রকৃতির ওপর। তারপর কবে যেন তুলি ধরলাম মনেই নেই ভালো করে। কিন্তু সেই অল্পবয়সেই আমি দেখলাম যে আমাদের বাড়িতে সেইরকম ভাবাবেগের বিশেষ কোনো জায়গা নেই। বাবা ডাক্তার। জ্যাঠামশাই আর্মি অফিসার। তা সে যাই হোক, বাবার আদর্শে আর তাঁর পড়াশোনার আগ্রহে আমরা দুই বোনই পড়াটাকে চিরকালই ভালবেসেছি। জোর করতে হয়নি।

কিন্তু আমার স্কুল জীবন থেকেই সকলে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো আমার সর্ব কলায় প্রতিভাকে। আমার তিন চার বছর বয়সের ছবি আঁকা আজও সকলকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। ক্রমশ কবিতা গান এসবের এক অদ্ভুত সমন্বয় আসে। যদিও এজন্যে সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো কিন্তু মানতেই হবে যে সেরকমভাবে কেউ এই প্রতিভাকে আরো এগিয়ে যেতে সাহায্য করেনি। হয়তো মেয়ে বলেই। কিন্তু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে আট/নয় বছর বয়সে যে সব ছবি এঁকেছি সেসব বিষয় specially erotic ones। এখনো অনেকে কল্পনাই করতে পারবেন না। আমার অসাধারণ মা আমাদের অল্প বয়স থেকেই আমাদের হাত ধরে এমন এক অমর্ত কাব্যের জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন যে স্বাভাবিভাবেই আমাদের গড়ে উঠেছিলো এক অন্য মানসিকতা। বললে বিশ্বাস করা শক্ত হবে যে, আমার ন'বছর বয়সে মা আমাকে শেক্স্পিয়ার এবং মহাভারতের চরিত্রের বিশ্লেষণ করে মিল খুঁজে বার করে বোঝাতেন। মার কাছে সাহিত্যে এমনভাবে শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও বাবার ইচ্ছে আর উৎসাহে ডাক্তার হব ভেবেছিলাম। কিন্তু ঠিক তখনই আমার জ্যেঠুর আর তার পরপরই পরিবারে অতি নিকট কয়েকজন আত্মীয়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যু দেখে আর রক্ত ঘাঁটার ইচ্ছে প্রশমিত হলো।

আমার Class VI এর স্মরণীয় ঘটনা আমার দিদির national scholarship, JBNSTS scholarship পেয়ে প্রথম মহিলা হিসেবে electronics engineering পড়তে Bengal Engineering College-এ ঢোকা। ঐ অল্প বয়স থেকেই ডাক্তারী পড়ব না ঠিক করে ফেলেছি। ইনজিনিয়ারিং-এ দিদির সাফল্য দেখে আমারও ইনজিনিয়ার হবার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠলো। এত অল্পবয়সী একটি প্রায় শিশুর এমন মস্ত ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত সফল হলো মা-বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছে আর চেষ্টায়। বয়স তখন আমার সবে ষোল বছর। তবে দিদিকে দেখে ইচ্ছে হয়েছিল electrical engineering পড়তে কিন্তু বিধির লিখনে পড়া হলো স্থপতিবিদ্যা।

ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, হাসি, আনন্দ দিয়ে শুরু হলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। আমাদের বাড়িতে শাসনের রক্তচক্ষু প্রতিপদে মেয়েদের পথরোধ করে দাঁড়াত না কোনদিনই তাই সেই ষোল বছর বয়স থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে আমাকে টেনে নিয়ে গেলো private practice বা free-lancing করতে, যার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। একটা দুটো perspective এঁকে সেই বয়সেই প্রতি মাসে ৮০০/৯০০ টাকা রোজগার অন্যদের মনে যে এক হিংসা, অপবাদের দ্বার খুলে দিয়েছিলো তা আমার মনের কম ক্ষতি করেনি। আসলে পৃথিবীতে খুব কম লোকই কারুর ভালো চায়। তাই সব ছেড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাব্যচর্চা বা ছবি আঁকার জগতেই আবার ফিরে যাব মনে হতো। ক্লাসে বা কলেজের পুরুষ বন্ধুদের ভালো ছাত্রীদের প্রতি মেয়ে বলেই একটা ঈর্ষাজাত অবজ্ঞার ভাব মনকে আঘাত হেনেছে। এদিকে মা-বাবা যতই modern ধারায় বিশ্বাস করুন না কেন তাঁদেরও একটা বদ্ধমূল (আমার মতে ভ্রান্ত) ধারণা ছিলো যে, মেয়ে যতই উচ্চশিক্ষিতা হোক তার বিয়ে কিন্তু দেখে-শুনে দেওয়া উচিৎ মা-বাবাকেই। আর সে পাত্রের হওয়া উচিৎ মেয়ের থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় উঁচু। নাহলে বরং ভালো মেয়েদের অবিবাহিত জীবন কাটানো! কেন? স্বামীকে স্ত্রীর থেকে এক ধাপ উঁচু হতেই হবে কেন? আমাকে তখন কিন্তু পেয়ে বসেছে নিজেকে, জীবনকে আর পৃথিবীকে দেখার আর জানার নেশায় আর সেই সূত্রেই পরিচয় হয়েছে সমাজের ভেতরে বাইরে বহু মানুষজনের সঙ্গে। সখ্যতা থেকে হয়েছে হৃদ্যতা। হয়তো বা অন্তরঙ্গতা। তার মধ্যে একজন বিদেশী ভদ্রলোক, এখানে এক বিখ্যাত সংস্থায় swiss representative, তার সাথে সম্পর্ক প্রায় বিয়েতে পৌঁছয়। কিন্তু আমি আমার জীবনের ছোট্ট গণ্ডিতে একটা জিনিস দেখেছি, সে হলো, প্রায় সব ছেলেই তার স্ত্রী বা মহিলা বন্ধুর মধ্যে তার মনে গড়া মানস প্রতিমাকে দেখতে চায়। সত্যকে ভালবেসে, একটা মানুষকে তার জন্যেই শুধু ভালবেসে স্বীকার করতে কষ্ট হয় তাদের।

যেরকম এই swiss ছেলেটি আমাকে বলেছিল : "If you want me then you have to leave your future programme regarding becoming somebody big and be an housewife ! এই কথার উত্তরে একটা কথাই বলা চলে, "Bye, I will remain your friend forever." এই রকম লোকেরই জগতে ভিড় বেশী। তারা মানুষ হিসেবে মেয়েদের নিজস্ব সত্তার মূল্য তাই রাখতে পারে না। যাইহোক, এরপর মানসিক অবস্থা হয়ে উঠলো খুবই খারাপ। আমি একা। নিরানন্দ, বন্ধুহীন। কারণ আমি বাঁচতে চাই নিজস্ব একটা মানুষি সত্ত্বা বজায় রেখে। নিজের স্বাধীনতায়, নিজের মতন করে। এই কি আমার অপরাধ ? অপরাধ শুধু মেয়ে হয়ে জন্মানোর ! এই রকম এক মানসিক অবসাদে যখন ভেঙে পড়েছে সমস্ত মন তখন কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শ আর উৎসাহে ঝুঁকলাম আবার পুরনো নেশা থিয়েটারের দিকে। জীবনে এলো এক নতুন আস্বাদন। 'থিয়েটার ফ্রন্ট' নামে এক নতুন গোষ্ঠিতে যোগ দেবার আনন্দ। আমি দেখেছি এইসব পৃথিবীর প্রকৃত শিল্পী মানুষ যেন একটু অন্যরকম। নতুন এই অভিজ্ঞতা অচেনা, আশ্চর্য এক আনন্দে আমাকে যেন ঘিরে রইলো দিনরাত।

আমার শিশুবয়স থেকেই দেখেছি বাড়ির সকলেই কোনো না কোনো গুণের অধিকারী। মা একসময় অপূর্ব Sculpture তৈরি করতেন, ছবি আঁকতেন, তার ওপর ছিলো মস্তবড় একটা সংসারের ঘানি। সে সব সেরে রেখে নিজের প্রাণের তাগিদে আর আমাকে উৎসাহ দিতে প্রায়ই এঁকে দিতেন আমারও অনেক ছবি। সে সব স্মৃতি আজও আমার জীবনে এক অমূল্য সঞ্চয়ন হয়ে আছে। দিদি ভালো ছবি আঁকা, গান, অসাধারণ লেখার অধিকারিণী। বাবা আর আমার জ্যেঠতুতো ভাইরা সকলেই থিয়েটার-অভিনয়ে মগ্ন। তবে সেসব শুধু পাড়ায়। সখের। Professional Stage এ নয়। তাই Professional Stage-এ আমার Success তারা ভালো করে

নিতে পারলনা। এদিকে আত্মীয়-বন্ধুও দিকে দিকে বলতে আরম্ভ করলেন "এত **Brilliant** মেয়েকে শেষপর্যন্ত **prostitute** বানিয়ে দিলেন!" মস্তবড় বাধার পাহাড় হয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলে আর মেয়ের মধ্যে টানা অমোঘ সেই সীমারেখাটা। মেয়ে-মেয়েই। ছেলে হলে এসব কেউ বলত না। আমি কিন্তু চিরকালই কূপ-মণ্ডুক বলে এদের ঘৃণা করেছি। ভয় করিনি। পিছু হটিনি কোনদিন। যে কোনো কলাই হোক না কেন তা চরিতার্থ করতে মনপ্রাণ দিতে হয় কতখানি, কি করে আমি সে সার্থকতায় পৌঁচেছি সে কাহিনী বড় চেনা যে কোনো কলাকারের। আমাদের নতুন সমাজ পুরনো মনে কি করে জানবে? কলকাতা পচছে। **Advancement** হয়েছে এর কতখানি এই **political structure**-এ? যারাই সমাজকে **change** করতে গেছে তারা শহীদ হয়েছে নয়তো ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ব্যর্থতার গ্লানিতে। যেমন কত পরিশ্রম করে সব শাস্ত্র পুরাণ ঘেঁটে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন বিধবা বিবাহ অসিদ্ধ বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ নয়। কিন্তু আজও তার এক শতাব্দী পরেও কি তা সমাজে চলেছে সাবলীল ভাবে? চলেনি কারণ এর জন্যে সব দুঃখভোগ আর সমস্যা শুধুমাত্র মেয়েদেরই একা। আর মেয়েদের সুখ-দুঃখের কোনো কথা সমাজে আর ভেবেছে কে কবে? আমি প্রথম দলের এক মূক প্রতীক। জ্বলছে মন। শরীরটা কেটে রক্তাক্ত করতে ইচ্ছে করে, তবু আশার ছলনায় ভুলেছি। পড়াশোনা করে ঢাকা দিয়েছি চাপা আগুন। নিজের সব কল্পনা আর স্বপ্নকে আহুতি দিয়েছি বর্তমানের ক্রুর চক্রান্তে। কিন্তু কতদিন? বদলাতেই হবে সেই সব মানুষদের যারা ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে যা কিছু নতুন তার সব সম্ভাবনাকে। ভালো লোক আজ বিরল। আমি তাদের মধ্যেই নিজেকে খুঁজেছি। **Brecht** এর **cancasnan chalk Circle** এর নায়িকার ভূমিকায় পদ্মপর্ণা গাঙ্গুলী নামক বেঁটে, সাধারণ মুখশ্রীর কিন্তু প্রাণের আগুনে উজ্জ্বল মেয়েটাকে কে ভেবেছিলো **Successful** হবে এমন-ভাবে? খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় পারি-

বাহ্যিক রণদামামা আরো জোরে বেজে উঠেছিলো। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলোকে অশিক্ষিত, বিভ্রান্ত আর পরশ্রীকাতর মনে হয়েছিলো। একটা কথা 'তোমার বাবার বয়স হয়েছে। তিনি তো নিজেকে change করতে পারবেন না। তুমি যদি না পারো তাহলে তোমার সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি মানুষের তফাৎটা রইলো কোথায় ?' যেন বুকের মধ্যে এসে বাজলো শেলের মতন। আর পারলাম না। থিয়েটার ছাড়লাম।

পড়াশোনায় ভালো ছিলাম চিরদিনই। এখন ঠিক করলাম যে সব ছেড়ে দিয়ে বিদেশ চলে যাব Higher Study করতে। সে ইচ্ছে সফলও হলো। আমেরিকা, ইউরোপ ঘুরে দেখা হলো পৃথিবী-টাকে। জানা গেলো সেখানে মেয়েদের পারিবারিক, সামাজিক মর্যাদা আর অবস্থা। হায় ঈশ্বর! এতদিনের এত স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ আজ রাখব কোথায় ? চারিদিকে এত অলোর ঝলকানি অথচ তারি মধ্যে কঠিন এক বিভেদের রক্তচক্ষু যে নাগপাশের মতন বেঁধে রেখেছে এইসব আপাত উজ্জ্বল বিদেশিনীদেরও। আমাদের প্রান্তে যদি থাকে শুধুই নিশ্ছিদ্র অমানিশা ওদের তবে চোখ ধাঁধানো এক ঝলক বিদ্যুতের আলো। তফাৎটা শুধু এই। সত্যিকার আলো নেই ওদেরও জীবনে। সাধে কি দিকে দিকে আজ এত women lib-এর আন্দোলন! কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার তোলপাড় করে মন। আন্দোলনটা কার বিরুদ্ধে ? শাসনকর্তার বিরুদ্ধে শাসিতের ? এই প্রশ্ন তুললেই তো আবার এসে পড়ে যে নারী পুরুষ মিলেই যদি সংসার তাহলে আর কথা বলতে গেলেই শুনতে হয় কেন, এত গোছানো-সাজানো মনোভাব বলে মেয়েদের ঘরেই মানায় ভালো।

এতদিনে সব শিক্ষা যেন পূর্ণ বলে মনে হলো। দেশে দেশে অর্থাৎ গোটা পৃথিবী জুড়েই মেয়েদের এই অবস্থা দেখে তেতো মন নিয়ে নিরানন্দভাবে যখন পড়াশোনা করছিলাম doctorate-এর জন্যে এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন খবর এলো ক্যানসার হয়েছে মায়ের। জ্ঞান হওয়া থেকে মায়ের ছায়ায় মানুষ। মা শুধু

আমার জন্মদাত্রীই নয় দুঃখ-ব্যথার ঘনঘোর দিনে মা আমার একমাত্র দরদী সহমর্মী। তবু মাও তো মেয়েমানুষ! বিশেষ তখনকার দিনে। তাই মায়ের নিজের সংসারেই বক্তব্য বা অধিকার ছিলো আর কতটুকু? আর মেয়েমানুষ বলেই বোধহয় একজন ডাক্তারের বউকেও এমন এক দুরারোগ্য ব্যধিতে যত্ন নেয়নি, তেমন করে দেখেনি কেউ। মাও শারীরিক সেই প্রচণ্ড কষ্ট যন্ত্রণা এমন নিঃশব্দে সহ্য করেছে যে এতটুকু কিছু বুঝতে পারেনি আমার ডাক্তার বাবাও। হয়তো খেয়ালও দেয়নি যতটা দরকার ছিলো ততটা। আসলে এতবড় পরিবারটার প্রতিটি মানুষের দিকে সদা জাগ্রত যার দৃষ্টি তারও যে একটা মানুষের শরীর আছে, আছে কিছু শারীরিক আর মানসিক চাহিদা সেকথা আর ভেবেছে এতবড় ব্যস্ত সংসারটার মধ্যেই কে কবে? মায়ের সেই নিষ্ঠুর অকাল মৃত্যুর শোকে, দুঃখে, বুঝি পাগল হয়ে যেতে বসে-ছিলাম সেদিন। কিন্তু আজ সেদিন থেকে বহুদূরে সরে এই পরিনত বয়সে এসে মনে হয় মায়ের সেদিনের সেই নিঃশব্দ সহনশীলতা ছিলো বোধহয় গোটা সংসার আর সমাজের ওপর এক নিদারুণ মৌন বিদ্রোহ। আর সেই অসম যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলো আমার মা।

এত কথা ভাববার বা বুঝবার বয়স সেদিন হয়তো তেমন করে হয়নি তাই শুধু দুচোখ মেলে মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে অসহায় যুদ্ধ দেখা ছাড়া আর তো করার কিছুই ছিলনা। মায়ের মৃত্যু হলো। চেয়ে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু সেই প্রচণ্ড শোকেও চোখে জল কেন আসেনা? বুকের মধ্যে অনবরত জ্বলে কেন শুধুই শোকের থেকেও প্রচণ্ড এক বিদ্রোহ আর ক্ষোভের আগুন। ক্ষোভটা সেই মান্ধাতার আমল থেকে মেয়েদের ওপর এই অত্যাচার আর বঞ্চনার কথা মনে করে। বিদ্রোহ জাগে তাই প্রতি মুহূর্তে এর বিরুদ্ধে। ভালো লাগেনা আর কিছুই। তিক্ত বিপর্যস্ত জীবন। মানসিক যখন এই অবস্থা তখন এক স্থপতি প্রতিষ্ঠান প্রায় হাত ধরে জোর করে নিয়ে গেলেন তাঁদের অফিসে। ডুবে গেলাম কাজে। বাঁচলাম

সাময়িকভাবে। কাজ ছাড়া আর যেন কিছু ভাবতেও পারতাম না তখন। কিন্তু সেখানেও স্বীকৃতি কোথায়? বাধা কি সেখানেও শুধু মেয়ে বলে? আবার বুঝতে হলো, এই হলো আমাদের চিরকালের সমাজব্যবস্থা। মেয়েদের এ যাবৎ অধিকৃত কতগুলো পেশা (যা অর্জন করতেও তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিলো বড় কম নয়) ছেড়ে ইনজিনিয়ারিং পড়তে আসা ইস্তক ছাত্রজীবনেই লাঞ্ছনা আর দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে বড় কম নয়। এখন কর্মক্ষেত্রে এসেও অন্যায় অবিচার আর হীনমন্যতা বোধ ভেঙে দিতে পারেনা এতদিনের সব স্বপ্ন আর আশাকে। সব বাধা বিপত্তিকে জয় করবার দুরন্ত ইচ্ছেটাই অফুরন্ত প্রাণশক্তি হয়ে শক্তি যুগিয়ে এসেছে সেদিন থেকে। কিছুটা স্বাধীনভাবে নিজের মতন কাজ করার প্রতিশ্রুতিতে পুরনো প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যোগ দিলাম আর একটি অতি বিখ্যাত সংস্থায় Chief consultant হয়ে। এ ব্যাপারে আমার স্বামী প্রবাল গঙ্গোপাধ্যায়, যে নিজেও কোনো এক বাণিজিক সংস্থার অধিকর্তাদের মধ্যে একজন তার উৎসাহ আর সহযোগিতা আমার ভেতরকার সেই বিদ্রোহী মানুষটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজো। তার অকুণ্ঠ সাহচর্য আমার সব ভয় আর হতাশাকে নষ্ট করে সাহস দিয়েছে মনে বারবার। এ হয়তো নয় যে ও অন্যরকম হলে আমি সব ছেড়ে পরাজয় মেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু দুজনে মিলে জীবনটাকে সত্যি সহজ আর সুন্দর করে তোলা এতটা হয়তো তাহলে হতনা। আমার বিবাহ-পূর্ব জীবনে প্রতিপদে পারিবারিক আর সামাজিক এত অবিশ্রান্ত বাধা পেতে পেতে নিজের জীবন, সমাজে মেয়েদের অবস্থা আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম দিনে দিনে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে, সাহায্যে সমাজের ঘুণেধরা পুরনো কাঠামোটা ধ্বংস করতে আমার মন যেন আঁকুপাঁকু করে সব সময়। কলকাতা যেমন আছে,—তার লোকগুলো,—elite societyর political frontএর সকলকে এইরকমই রেখে পশ্চিমবাংলার আর কিছু হবেনা। Youth front যদি জোরদারভাবে না নিজেকে

এগিয়ে আনে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কি? তাদেরকে তো drugs, sex, violenceএর খপ্পরে ফেলা হচ্ছে। মনের দারিদ্র আরও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই কদিন আগেই ভারত-বিখ্যাত এক স্থপতির সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বললেন, "তোমরা tender-এ participate করে কাজ পাও? তাও এরকম low quotation-এ? Empanellment ছাড়া architect selection ভাবা যায় কি করে? আর ঝামেলা বাড়িয়ে শুধু শুধু নিজেদের দুর্ভোগে ফেলা কেন?" চুপ করে থাকতে হলো। তিনি যদি জানতেন যে empanelled হলেও শুধু মহিলা হবার অপরাধে কি হয় এখানে তাহলে হয়তো কথা বলতে পারতেন না আর। আমাদের পুরনো যা ঐতিহ্য, অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটা মূল্যবোধ ছিলো মানুষের জীবনে। সমাজে নারীর স্বাধীনতা ছিলো অবাধ। সেই ঐতিহ্য ভুলে আমরা আজ এগিয়ে চলেছি এক অনির্দিষ্ট পথ ধরে কোন উদ্দেশ্যে কে জানে? তাহলে আমরা সত্যিকার তৈরি করছি আজ কি?

এইসব চিন্তায় মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই তোলে প্রচণ্ড আলোড়ন। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? সমাজে নারী-পুরুষের এই বিভাজন চলে আসছে তো সৃষ্টির আদি থেকেই, অসংস্কৃত মানুষ যেদিন বাস করত বনে-জঙ্গলে পশুর মতন। তারপর দিনে দিনে কেটেছে সময়। সেই আদিম বন্যতা ছেড়ে এগিয়েছে মানুষ সভ্যতার দিকে। কিন্তু সেখানেও সেদিন থেকেই বিজয়ধ্বজা উড়িয়েছে সমাজে পুরুষই। তারপরও তো বেড়েছে পৃথিবীর বয়স আরো কয়েক হাজার বছর আর আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষে যখন চাঁদে পৌঁচেছে মানুষ স্বচ্ছন্দে, তখন মান্ধাতার আমলের সেই নারী-পুরুষের স্বাধীনতা আর অধীনতার কথাটা থাকবে কেন এমন অনড় হয়ে? কিন্তু আশ্চর্য যে, এই কথাটাই বড় নির্মমভাবে চিরদিন চলে এসেছে, চলবেও কি অনাদি অনন্তকাল ধরে? হয়তো চলবে। আর কথাটা যে কত সত্যি তা প্রমাণ হয় আজ প্রায় একবিংশ শতকে

পা-ফেলা পৃথিবীটার দিকে চোখ ফেরালেই। সমস্ত পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতার শীর্ষে বসে থাকে পুরুষ আপন মহিমায় মহিমামণ্ডিত হয়ে। করমেয় যে কজন নারী অর্জন করতে পেরেছেন এই গৌরবের আসন, নিজেদের প্রচুর কর্মক্ষমতা আর দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পেরেছেন তাঁরা তাবড় তাবড় পুরুষ থেকে অনেক বেশী। তবু আজো যুক্তরাষ্ট্রের মতন উন্নত প্রগতিবাদী বহু দেশেই যুদ্ধ করতে হয় মেয়েদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা উঁচু কোনো প্রশাসনিক পদ পেতে চাইলে। কেন ·এই বৈষম্য? এ কেন'র কোনো উত্তর নেই। ছিলনা। ভবিষ্যতেও হবে কি কোনদিন? না হবার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ কিন্তু নেই। কারণ পৃথিবীর সব বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ বারবার প্রমাণ করেছেন যে, একটি শিশু ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন তাদের সাধারণ বুদ্ধি, বিকাশ, বা মগজে কিছু তারতম্য হয় না। একটী শিশু জন্ম নেয় মানুষ হয়ে। আকৃতিতে অবশ্যই থাকে শারীরিক কিছু পার্থক্য কিন্তু প্রকৃতিতে একই রকম হয়। জন্মের পর মানুষের হাতে পড়ে তার পরিচয় নির্দ্ধারিত হয় ছেলে আর মেয়ে বলে আলাদা ভাবে। আর এই নির্দ্ধারণের ওপর চলে তার ব্যবহারিক আরোপ দেশ, সমাজ, আর পরিবারের ঐতিহ্য আর পরম্পরা অনুযায়ী। এ সম্বন্ধে আমেরিকান এক মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ দীর্ঘদিন কাজ করে দেখেছেন যে পরিবারে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেবার সময় থেকেই মা-বাবা বা বিভিন্ন মানুষজন চিন্তা করতে আরম্ভ করেন তাঁদের ছেলে বড় হয়ে কি হবে! শিশুটির পিতা নিজে যে পেশায় আছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চান তাঁর ছেলেটিও বেছে নিক সেই পেশাই। যেমন ভালো একজন পেশাদার নামী খেলোয়াড়, তিনি ফুটবলার, ক্রিকেটার বা বক্সার যাই হোন না কেন, চাইবেন ছেলেকে নিজের মতন করে গড়ে নিতে। অথচ তিনিই কন্যা সন্তানটির দিকে চাইবেন নরম চোখে। চাইবেন তাঁকে নরম-সরম করে মানুষ (মেয়েমানুষ) করে একটি সচ্ছল সুখী সংসারে সুগৃহিণী হয়ে, মা হয়ে চরিতার্থ হতে!

এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই দুটি শিশু একইভাবে জন্ম নিয়ে একই পরিবারে মানুষ হবে দুরকম ভাবে। মেয়েটি থাকবে অতি রক্ষণার ছায়ান্তরালে। ছেলে বেরোবে বাইরের জগতের অবাধ স্বাধীনতায়, রোদে-জলে শক্ত-পোক্ত হয়ে জীবনের বন্ধুর পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় একা এগিয়ে যাবার পাঠ নিতে। এই বিষয়টির ওপর বিশদভাবে কাজ করতে তিনি শহরের বেশ কয়েকটি ছোট-বড় বিভাগীয় দোকানে অনুসন্ধান করেছেন আর দেখেছেন সেখানেও কাজ করছে একই মানসিকতা। খেলনার দোকানে গিয়ে একটি ছমাসের কন্যা সন্তানের জন্য মা-বাবা অবধারিত ভাবে কেনেন সুন্দর সুন্দর পুতুল, ঝুমঝুমি, ছবি এইসব। অথচ ছেলের বাবা-মা ঐটুকু বাচ্চাটার জন্যেই কেনেন ব্যাট-বল, দম দেওয়া মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন। অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকেই মেয়ের জন্যে ব্যবস্থা ঘর গেরস্থালির। ছেলে অজস্র প্রাণ বন্যায় বাইরের পৃথিবীতে বেড়িয়ে ব্যাটে-বলে ওড়াবে ধূলো, আকাশে উড়বে, জলে ভাসবে। "শুধু খেলাধুলোর জিনিস কেন, মা-বাবার যে কোনো জিনিস কেনার ধরন দেখেই আমরা বলে দিতে পারি যে শিশুটি মেয়ে না ছেলে। যেমন মেয়ের জন্যে পোশাক কিনতে এসে ওঁরা পছন্দ করেন লেস বা ফ্রিল বসানো, ফুল তোলা, লাল, গোলাপী এইসব রঙের ঝলমলে জামা। আর ছেলের বেলায় পাইলটের বা নেভি-স্যুট। মাথায় সেই সঙ্গে মানানসই ক্যাপ। মেয়ের পায়ের জন্যে হালকা সাদা ব্যালেরিনা। ছেলের পায়ে শক্ত বুট"। হেসে বলেন দোকানের মালিক। কিন্তু কেন? সংসারে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকে কোন উদ্দেশ্যে অমোঘ এই সীমারেখা টানা? কিসের জন্যে, কবে থেকে? এর উত্তর ঠিকমতন দিতে পারেনা বোধহয় ইতিহাসও। কিন্তু কোন সেই প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে অন্ধ এক নিয়ম বা আচারের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে মেয়েরা আজ এতগুলো শতক পার হয়ে এসেও? আজো এইসব আরোপিত নিয়ম-আচারের বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে গেলে ঘরে বাইরে আত্মীয়বন্ধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠবেন, 'ওকি আবার একটা মেয়ে নাকি? ওতো একটা

ছন্নছাড়া ডাকাবুকো দস্যি। ছিঃ।" যেমন বলেছিলেন আমার আত্মীয়বন্ধুরা আমার নাটক-থিয়েটারে আগ্রহ আর যোগ দেওয়া দেখে! অথচ আমার পরিবারেই বাবা-আর দাদার একই রকম নাটক প্রীতির জন্যে শুনতে হয়নি একটাও কথা! ওরা যে পুরুষ মানুষ। এতবড় পৃথিবীটাতে যা ইচ্ছে করবার ছাড়পত্র ওদের কপালে বিজয় তিলকের মতন এঁটে দেওয়া হয় ওরা জন্মানোর মুহূর্তেই।

কিন্তু সময় বদলাবার লগ্ন কি আসেনি এখনো? মনের কোণে বিশ্বাসী একটা ভরসা যেন চেয়ে থাকে ভবিতব্যের দিকে। তাই ভাবি। ভাবি আমরা কি যুগযুগান্তর ধরে জমে থাকা যুক্তিহীন অবিবেকী একটা গণ্ডি ভেঙ্গে এগিয়ে যাবনা স্বাধীন একটা আলোর দিকে? হ্যাঁ যাব। পুরনো একটা শতক ঝরে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিচ্ছে পৃথিবী আর এক শতকে। সেই মহা উত্তরণে আমরাও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘিরে থাকা সব অন্ধকার ভেঙ্গে এগিয়ে যাব এক নতুন অরুনোদয়ের দিকে। তখন আজকের পুরনো পৃথিবী হয়তো বসবে এক নতুন তপস্যায়। অসত্য থেকে সত্যে যাবার, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হাত বাড়াবার আকুলতায়। মৃত্যু থেকে অমৃতযাত্রার প্রতীক্ষায়। এই ভারতেরই ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো একদিন যে প্রার্থনা তারই পুণ্যফলে সমাজে নারী হয়তো পাবে তার যোগ্য সম্মান। মিথ্যে হয়ে ভেঙ্গে পড়বে এতদিনের সব বিভ্রান্তি আর অন্যায়ের বাধা। নিজের ভাগ্য জয় করে নেবার অধিকার পাবে নারী নিজের সার্থকতার মূল্যে।

বলতে চাই

ডঃ মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার (নৃত্য শিল্পী)

"আজ আমি" সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বেশ সংকোচ হচ্ছে। যে সব গুণী আর কৃতী মহিলারা এখানে কথা বলেছেন তাঁদের তুলনায় আজকের আমির কথা বেশ নগণ্য। আবার এও মনে আসছে যে আমরা সকলেই তো নারী। এই একটি জায়গায় ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সর্বজনীন মিল থেকে যাবে। গ্রাম, সহর, বাংলা, বাংলার বাইরে, বিদেশে, সে আফ্রিকার সুদূর পশ্চিম হোক বা মার্কিন মুলুকের ন্যুইয়র্কেই হোক নারীকে সব সময় মনে হয়েছে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। নৃতত্ত্বের ছাত্রী হয়ে যখন বিভিন্ন সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে গবেষণা করেছি তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। অবশ্য এমন সমাজও আছে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব কঠোর নয়। তার মূলে আছে সেই সমাজগুলিতে নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আর ধর্মের মধ্যে নারীর স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা। "দেবী দেবী" করে তাকে মূকবধির করার প্রচেষ্টা নেই, আছে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে, বিশেষ করে দাম্পত্যে একধরনের সখ্য। পতি পরমগুরু ব্যাপার নয়। অবশ্য এমন সমাজের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। এরা সকলেই নামী "উচ্চমার্গের" ধর্মশাসনের আওতা থেকে একটু দূরে। যেখানে শাস্ত্র জটিল সেখানেই নারীকে নানাভাবে বন্দী করার ফন্দী। আর যে মানুষ আত্মনির্ভর হতে শেখেনি, যার অন্নসংস্থান, আত্মরক্ষার দায়িত্ব পুরুষের হাতে তাকে কেন পুরুষ সমমর্যদা দেবে? আমাদের দেশের তথাকথিত উঁচুজাতের মেয়েদের সম্বন্ধে এই কথাই খাটে।

অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বড় হয়ে ওঠার সময় ভাই-বোনেদের মধ্যে কোনো বৈষম্য হয়েছিল বলে মনে পড়ে না।

আশ্চর্য স্নেহশীল ও উদার ছিলেন আমার বাবা স্বর্গত ননীগোপাল চাকী। আমার স্বামীর ভাষায়, "উনি নিজের যুগ থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন।" দশ পুত্র-কন্যার অষ্টম সন্তান, কনিষ্ঠা কন্যা আমি। মনে হয় বাবা আমাকে একটি শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

ডানপিটে গাছে চড়া মেয়ে। পাবনার বন-বাদাড়ে ছুটির দুপুরে ঘুরে বেড়াতাম আর শুনতাম 'খুকু পুড়ে খাক হয়ে গেল ওকে সর-ময়দা মাখাও। চুল না বেঁধে বেঁধে চুলের কী ছিরি হল। পা ফাঁক করে অমন বসোনা, ইজেরটা দেখা যাচ্ছে যে মদ্দা মেয়ে।' এ সব কথা মা-বাপের কাছ থেকে শুনিনি, শুনেছি বিরাট পরিবারের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। মনে হয় মা আমাকে বেশ প্রশ্রয় দিতেন। দাদাদের সাইকেল চড়ে যখন তখন চলে যেতাম পাথরতলার দোকান থেকে মা'র রান্নাঘরের টুকিটাকি কিনতে, অতিথি এলে মিষ্টি আনতে। গৃহভৃত্যের অভাব ছিল না কিন্তু এমন ছুটোছুটি করতে আমার উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী। ছুটির দিনে দুপুরবেলায় ছোটভাই পিনাকীকে সঙ্গে নিয়ে সবার অগোচরে চলে যেতাম বাড়ির কাছে কাছারী পাড়ায়। আমাদের বাড়িটা ছিল বেশ প্রশস্ত। সারা দুপুর এঘর ওঘর, বারান্দা উঠোনে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে লাগত। কাছারী পাড়ায় বিরাট বিরাট শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় অনেক পসারীর ভিড়। মলম, চূরণ, আয়না, চিরুনী, জামাকাপড়, বই এমন কত কি বিক্রী হত সেখানে। বিক্রেতারা ছড়া কেটে সুর করে নিজের নিজের পসরার গুণ গাইত। আমরা ভাইবোনে খালিপায়ে উস্কুখুস্কু চুলে ঘুরে ঘুরে সব দেখতাম। চুপি চুপি বাড়ি ফিরে দোকান দোকান খেলতাম। ওখানেই একবার একটি যাযাবরের দলের তাঁবু ফেলা দেখে যাযাবর খেলা বানিয়েছিলাম দুভাইকে নিয়ে। এমন মজায় বাধ সাধলেন এক উকিল কাকা। ওঁর চোগা-চাপকানপরা গৌর মূর্তি দেখেই আমরা শিরীষগাছের আড়ালে অনেকক্ষণ লুকিয়ে বাড়ি ফিরেছি

একদিন। সেদিনই কাছারী থেকে বাড়ি ফেরার পথে ক্ষিতীশকাকা আমাদের বাড়ি এসে মাকে বললেন, "ছি, ছি চাকীবাড়ির মেয়ে কিনা খালি পায়ে ভাইয়ের হাত ধরে কাছারী পাড়ায় ঘুরছে"। ব্যস, ও পথে যাওয়া বন্ধ হল। আর একবার আর এক কাকা মাকে বললেন, "সেজবৌদি, মঞ্জুকে আপনি যে সাইকেলে করে এভাবে যখন তখন দোকানে পাঠান এতে কি বংশের মান যায়না? আপনার চাকর-ঝিরা আছে কি জন্যে? কি জানি দোকানে যাওয়াটা বন্ধ হয়নি তবু কেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে দুপুরবেলায় যখন তুমুল ঝড় আসত তখন নিজেদের বাগানের আম কুড়োতে ইচ্ছা করেনি। ছুটে গিয়েছি সামনের ফুলবাগান, মাঠ রাস্তা পেরিয়ে টেকনিক্যাল স্কুলের আম-বাগানে। অনেকগুলি জেলেপাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি হুটোপাটি করে ফ্রকের কোঁচড় ভরে আম কুড়িয়ে 'পিঠেও দুএকটা পড়েছিল' যেই না বাড়ি ফিরেছি দেখি সবাই দাঁড়িয়ে। ঐ একই ধরণের বকুনি, "মেয়ে এমন হয় কখনো?" এর আগেই আমার দস্যিপনা দেখে মা একদিন প্রায় রাগ করেই তড়িঘড়ি সেজদার সঙ্গে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আরো বছর খানেক পরে দেবার কথা ছিল। আমার সমবয়সী একটি মেয়ে ভর্তি হল ইনফ্যান্টে। আর আমি দুক্লাস এগিয়ে ক্লাস টু'য়ে। যোগবিয়োগই জানতামনা। স্কুলে গিয়ে তো দিশাহারা। টীচার একদিন দিদিকে ডেকে বেশ ধমকে বললেন "তুমি তো বেরিয়ে যাচ্ছ, এর দায়িত্ব কে নেবে?" দিদির তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা। দিদির কথা শুনে মা বাড়িতে আনলেন মাষ্টারমশায় যতীশচন্দ্র চাকীকে। প্রথমদিন মাষ্টারমশায় আসতেই আমার চার বছরের ওপরের দাদা বললেন, "ও কিছু পড়া পারেনা। টিচার দিদিকে খুব বকেছেন।" মাষ্টারমশায় বললেন "তোমার মুখ দেখে তো মনে হয়, বুদ্ধিমতী।" ওঁর স্নেহভরা কথা-গুলি এখনও কানে শুনতে পাই। ওঁর হাতে পড়েই এক বছর না যেতেই আমি ক্লাসে প্রথম হতে স্থুরু করি। মাষ্টারমশায় একবার পূজোর সময় একটি পুতুল ও খেলার রেলগাড়ি আনলেন আমার ও

ভাই-এর জন্যে। পুতুলটুতুল আমার মোটেই পছন্দ ছিলনা। মাষ্টার মশাইকে বোঝালাম যে পুতুল রেলগাড়ি চড়বে আর আমরা দুজনে মিলে ঐ রেলগাড়ী নিয়ে খেলব। ভাই আপত্তি জানায়নি।

ইস্কুলের মেয়েদের জড়ো করে কামিনীদি (স্কুলের ঝি) আমাদের বাড়ীর সামনের বাগানে কুলগাছতলায় দাঁড় করাত। ডাকত, "মুনজুছিার ই ই……।" অন্য মেয়েদের সঙ্গে কামিনীদির পিছন পিছন গিয়ে পথে আর এক বাড়ির বাগানে দাঁড়াতাম। কামিনীদি হাঁক দিয়ে দিয়ে আরো মেয়ে জড়ো করত। প্রথম থেকেই ভীষণ খারাপ লাগত ওভাবে স্কুলে যেতে। ক্লাস ফোরে উঠে বেঁকে বসলাম, "আমি একা হেঁটে যাব।" অনেক সাধাসাধি করে ছোড়দাকে দিয়ে হেডমিষ্ট্রেস-এর নামে চিঠি দেওয়ালাম "মঞ্জুর একা যাতায়াতে অভিভাবকের আপত্তি নেই।" সে বছর ক্লাসে প্রথম হওয়ায় একটু দাপট ছিল বাড়িতে। কিযে ভাল হল এখন জীবনটা। বাড়ি থেকে স্কুল প্রায় দেড়মাইল রাস্তা ছিল। যাতায়াত করতে তিনট পথ বেছে নিয়েছিলাম। কখনো বড় রাস্তা ধরে পাথরতলা হয়ে, কখনো অনেকটা ঘুরে বনওয়ারীলাল ইনষ্টিটিউট এর পাশ দিয়ে হেঁটে কাছারীপাড়া হয়ে। কোনাকুনি সর্টকাট হত কাঁচপ মিঞার পুকুরের পাশে জেলেপাড়ার রাস্তা দিয়ে এলে। এমন আসা যাওয়ার পথে ধোপাপাড়ায় বটার মা ঠিকে ঝির সরাপিঠে ভাজা চেখে এসেছি। সহপাঠিনী হুসেনারার বাড়ি গিয়ে তালের বড়া খেয়েছি। আবার কোনো কোনো দিন নিজেদের বাড়ি ছেড়ে সরুপথ ধরে অনেকটা এগিয়ে ছোটপদ্মার ধারে কুমোর বাড়ি গিয়ে ওদের কাজ দেখেছি। দেখতাম গোয়ালাদের বাড়ির ঝকঝকে নিকনো উঠোন যেন সব সময় চকচক করত। আমার এই মেলামেশার জগতের কথা বাড়ির কেউ জানতেন বলে মনে হয়না।

বড় হয়ে টীচার হবার বাসনা তখন প্রবল। নানাভাবে ইংরিজিতে নাম সই করতে বেঁধে গেলে বেশ দুর্ভাবনা হত। এই সময় আমাদের পাড়ার মেজেন-মার স্বামী মারা যান। সকলে মিলে মেজেন-মার

সব গহনাগাটি খুলে সিঁদুর মুছে কেমন বিধবা সাজাল দেখে ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছিল। পাড়ার বিধবা পিসিরা একাদশীর দিন এসে নির্জলা উপবাসের কথা বলতেন। ব্যাপারটা খুব অন্যায় মনে হোত। আট / ন বছর বয়সেই ঠিক করে ফেললাম কখনো বিয়ে করবনা। বাড়ির নতুন বৌদের মনে হোত জবুথবু। সকলের কথায় উঠবোস করে, স্বামীর এঁটো থালায় ভাত খায়।

এই সময়কার একটি ঘটনা আমার কাছে খুব মূল্যবান। আমার বয়স তখন বড়জোর নয়। কুষ্টিয়াতে বড়দিদির বাড়ি বেড়াতে যাবার কথা হচ্ছে। এক দাদা বললেন, "যদি ভাল মেয়ে হওতো সঙ্গে যাবে। আজ থেকে তুমি বিকেলে সকলকে চা এগিয়ে দেবে। কাপ ধোওয়া হলে সেগুলি সাজিয়ে রাখবে।" বিকেলে আমার খেলার ছুটি। আমার সঙ্গে ছোট ভাই বা ওপরের দাদাকেও যদি একাজ করতে বলা হত ততটা খারাপ হয়ত লাগতনা। প্রতিবাদ করেছি, "কেন ভাই, এনদা (চার বছরের বড় দাদা) এরাও কেন চা দেবে না?" উত্তর "এ হচ্ছে মেয়েদের কাজ"। দারুণ অপমানিত বোধ করেছি। মাকে অভিযোগ জানাতে এবার মাও বেঁকে বসলেন। বললেন, "অসভ্য মেয়ে, গুরুজনদের মান্য করতে শিখবেনা?" জীবনে বিতৃষ্ণা এল। দুপুরের নির্জনে কাঁচের আলমারি খুলে আমার সবগুলি কাপ ও মেডেল (বলা হয়নি, সাড়ে চার বছর বয়স থেকে নৃত্যানুষ্ঠান করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পুরস্কার জড়ো করেছিলাম) ফ্রকের কোঁচড়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে রওনা হলাম। সরুপথ ধরে পদ্মার পার দিয়ে সাত মাইল গেলে নাকি খেয়া নৌকোয় কুষ্টিয়া যাওয়া যায় বলে শুনেছিলাম। আমরা অবশ্য ট্রেনেই যাতায়াত করেছি। বাড়ির সামনের গোল বারান্দা আর ছাদ থেকে মোহিনী মিলের চোঙা দেখে পথটা মনে মনে বাতলে নিয়েছিলাম। পথ চলতে চলতে মনে হল ছোট দুভাইকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলেছি। দুচোখ ছাপিয়ে জল এল। অনেকটা পথ গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে ঢুলছিলাম। এমন সময় দাদারা আর ভৃত্য দেবলাল ছুটে এসে আমাকে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল

"পাওয়া গিয়েছে, পাওয়া গিয়েছে।" আমার পক্ষ থেকে পুরোপুরি অসহযোগ দেখে তারা প্রায় চ্যাংদোলা করে শিকারী কায়দায় আমাকে বাড়ি নিয়ে এলে আমি হাত ছাড়িয়ে ছুটে দোতলার কার্নিসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "এবার আমার গায়ে হাত দেবে তো আমি নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ব।" সবাই আবার চেপে ধরে নামিয়ে আনলেন। মা তিনটি চড় মারলেন (জীবনে বার তিনেক মেরেছেন মাত্র)। বলা বাহুল্য, বাবা বাড়ি থাকলে আমার এই হাল হতনা। দিন কয়েক পর বাবা সরকারী ট্যুর থেকে ফিরলে এনদা বেশ ফলাও করে আমার কীর্তিকলাপের কথা বাবাকে জানালো। লজ্জায়, ভয়ে একটু দূরে দূরেই ছিলাম। বাবা জোরে ডাকলেন, "খুকুরাম (ওটা ছিল খুব আদরের ডাক) কোথায় তুমি? কিছু অন্যায় করোনি। "এই নাও", বলে একটা টাকা হাতে দিয়ে বললেন, "রসগোল্লা খেও।" বেশ জোরে জোরে বলতে লাগলেন, "এমন লেখাপড়ায় ভাল মেয়ে, ভাল নাচে, সে চা করবেনা তো কি হয়েছে? বাড়িতে চা দেবার লোকের অভাব কিসের যে ওকেই চা করতে হবে?" মা মৃদু হেসে বলেছিলেন, "তাই বলে বাড়ি ছেড়ে পালাবে নাকি?"

কবে যে নাচতামনা মনে নেই। বাড়ীতে পূর্ণিমা সম্মিলনী হত প্রতিমাসে। গুণীসমাগম হত বেশ। কবিতা, গল্প, গানের আসরে আমার নৃত্যানুষ্ঠানও হতো। সেজদা, ছোড়দা, দিদির প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল আমাকে নাচ শেখানো। যমুনা-পুলিনে (জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানের সঙ্গে), অজন্তার জাগরণ, দেবদাসী, ব্যাধ, দিবাকর এমন কত নাচ। প্রথাগত আঙ্গিক ছিলনা, কিন্তু প্রচুর কল্পনা নিয়ে ভাস্কর্য, চিত্রকলা থেকে নানা ধারণা নিয়ে বেশ সুন্দর পদ-ছন্দে নাচ তৈরী হত। পরে বিভিন্ন গুরুর কাছে শাস্ত্রীয় নৃত্য শিখে আঙ্গিকে শিক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু শৈশবে সৃষ্টিধর্মী নৃত্যে যে কল্পনা বিকাশের সুযোগ পেয়েছি তার প্রেরণাই বোধহয় বারেবারে নিয়ম-ভাঙ্গার আনন্দ এনে দেয় আমার নিজের নৃত্যনির্মিতিতে। কেবল শাস্ত্রীয় নৃত্য আমার কাছে বড় গতানুগতিক ব্যাকরণচর্চা বলেই মনে

হয়। ক্লাস 'ফোরেই স্কুলের অনুষ্ঠানে হল নৃত্যনাট্য পূজারিণী। বাড়িতে সবার উৎসাহ এতে। মা একটি ছবি দেখে (বোধহয় নন্দলাল বসুর আঁকা) আমার চুল বেঁধে মেকআপ করে দিলেন। ড্রেস রিহারস্যালের সময় মঞ্চের ওপরই আমার দড়িহীন ইজেরের গিঁট খুলে সেটি পায়ে পড়ল। দড়িটা খেলার কাজে লেগেছিল।

তখনই শুনতাম বড় হলে নাচ ছেড়ে দিতে হয়। হয়ত দিতেই হত যদি না দেশবিভাগের দরুন কলকাতায় আসতাম। ঐ বিরাট বাড়ি, বাগান, খোলা পথঘাট ছেড়ে এসে পড়লাম মধ্য কলকাতার একটি ছোট ফ্ল্যাটে। ভর্তি হলাম বেলতলায় আর নাচের স্কুলে। দেশবিভাগের দারুন ধাক্কা সামলে পেনসন পাওয়া বাবা চারটি ছেলে মেয়েকে ইনজিনিয়ারিং, এম. এ. ইত্যাদি পড়ালেন। এই দিনগুলি আনন্দমুখর হয়েছিল পারিবারিক পরিবেশে নৃত্যের প্রেরণা পেয়ে। দাদা, ভাই-এরা রাতজেগে নাচের পোশাক তৈরি করেছেন। মা গ্রীনরুমে আমার ও অন্য মেয়েদের চুল বেঁধে দিয়েছেন। বাবা-মার সঙ্গে সর্ত, ভাল করে পড়াশোনা করলে তবেই নাচতে পারব। এই সময় ক্রমশ গুরু প্রহ্লাদ দাস ও তাঁর তত্বাবধানে গুরু মারুথাপ্পা পিল্লাই-এর কাছে ভরতনাট্যম ও গুরু আতম্ব সিং-এর কাছে মণিপুরী শিখেছি। বাবার সখ ছিল আমি লেখাপড়া করে কলেজের অধ্যাপিকা হব আর সেই সঙ্গে দারুণ নাচের অনুষ্ঠান করব মাঝে মাঝে। বাবার এই ইচ্ছের কথা শুনে এক আত্মীয় বলেছিলেন "বুড়ো বয়সে মেয়ে নেচে রোজগার করে খাওয়াবে তার ব্যবস্থা করছেন নাকি ?" শুনেছি আমি জন্মাবার পর এক আত্মীয়া বাবাকে বলেন, "কি, বুড়োবয়সের চিন্তামণি এলো যে" বাবা উত্তরে বলেন, "এসেছেন মা জগদম্বা খাঁড়া হাতে, অসি হাতে। চিন্তা কিসের ?" মাঝে মাঝে জগদম্বা বলে ডাকতেনও। বাড়িতে আমার বিয়ের আলোচনায় শুনতাম "কলকাতার বাইরে বিয়ে হলে ওর হয়ত নাচই বন্ধ হয়ে যাবে।" বাবার ইচ্ছেতেই প্রেসিডেন্সিতে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়লাম ১৯৫২ সালে। এম. এ. পড়ার পর সাউথ সিটিতে অধ্যাপনার কাজ পেলাম। ভীষণ ভাল লাগত

পড়াতে। দিনরাত পড়তাম। এদিকে ছাত্রীদের নাচ শিখিয়ে অনুষ্ঠানের ভারও নিতে হল। প্রচুর খেটে অনুষ্ঠান করালাম। এবার বোধহয় জীবনে প্রথম ধাক্কা খেলাম। এর কিছুদিন আগে দাদার শ্বশুরমশাই ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের আমন্ত্রণে রাঁচীতে একটি শিক্ষক সম্মেলনে আমরা তিনজন মেয়ে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করি। এ ছাড়া বহরমপুর গার্লস কলেজের শ্রীমতী প্রীতি গুপ্তের আমন্ত্রণে ওখানেও একটি অনুষ্ঠান করে আসি। এ সব সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেনি। অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি Professionally অনুষ্ঠান করেন?" Professional বলতে যদি অর্থের বিনিময়ে অনুষ্ঠান হয় তো তখনও তা সুরু করিনি। এ ব্যাপারটায় বাবার খুব আপত্তি ছিল। মনে আছে রানীদি (রানী রায়চৌধুরী) তখন আমার সহকর্মী। বলেছিলেন, "একজন শিল্পী Professional না হলে বাঁচবে কী করে?" জর্জদা বললেন, "ডাক্তার, মাস্টার Professional যদি হয় তো নাচিয়ে, গাইয়েও হবে। Professional না হলে সমাজে শিল্পীর মর্যাদা থাকেনা।

সেই সময় মিড্‌লটন রোয়ের একটি বাগানে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমাদের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সুচিত্রা মিত্র, মঞ্জু গুপ্ত, অর্ঘ্য সেন, পূরবী মুখার্জী ও আরো অনেকে দেবব্রত বিশ্বাসের পরিচালনায় গাইছিলেন। ভাবলাম এমন বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠান দেখে কলেজের কর্তৃপক্ষ বোধহয় মনোভাব বদলাবেন। ওঁদের নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করবার সময় দারুণ অমায়িক ব্যবহার পেলাম। কিন্তু চাকরিটা গেল। ভদ্র ঘরের মেয়ে হয়ে নৃত্যের মতন একটা গর্হিত (?) কাজ করার অপরাধে। চিঠি এল কিন্তু মজার ভাষায়, "আমাদের পুরুষ অধ্যাপক ছাড়া চলবে না। পুরুষ হলে তিনি পুরুষ বিভাগেও পড়াতে পারবেন ইত্যাদি"। এক সপ্তাহের মধ্যে বহরমপুর গালর্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রীতি গুপ্তের কাছ থেকে তার এল, "পদ খালি, এখুনি কাজে যোগ দিতে পার"। সিটিতে পার্ট টাইমের মাইনে দিয়ে

ফুলটাইম কাজ করাত উপরন্তু ছাত্রীদের নাচ শেখাতে হত। বহরমপুরের কাজটা ছিল ফুলটাইম। নৃত্য শিল্পী হিসাবে প্রীতিদির কাছে আমার একটি বাড়তি মূল্য ছিল।

সিটি কলেজে পড়ানোর সময় আমার অধ্যাপক পার্বতী কুমার সরকারের সঙ্গে আলাপ হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে। দেখাশোনা ও চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে বিয়ে করে দিল্লী পাড়ি দিলাম। আশঙ্কা হল এখানেই বুঝি আমার শিল্পী জীবনের শেষ। অবশ্য এখানে উল্লেখ করবার মতন একটা ঘটনা যে, বিয়ের আসরেই সন্তোষদা (সেনগুপ্ত) ওঁকে বলেন, "এক মাস বাদে মঞ্জুশ্রীকে দরকার বোম্বাই ও আমেদাবাদের অনুষ্ঠানে।" ওঁর উত্তর, "উনি শিল্পী ওঁর সঙ্গেই কথা বলুন না কেন?"

বিয়ের পর ঘরকন্নার উৎসাহে ঘরদোর সাজানো, অতিথি আপ্যায়ণ নিত্য নতুন রান্নার পরীক্ষা কোনটাই বাদ যায়নি। দুতিন মাস যেতেই আমার স্বামী টের পেলেন আমি বেশ bored। এই সময় মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতায় কয়েকবার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। কলাক্ষেত্রে রুক্মিনীদেবী আমার অনুষ্ঠান দেখে এক বছরের একটি স্পেশাল কোর্স দিতে রাজি হলেন। মনস্থির করে দিল্লী ফিরে স্বামীর কাছে কথাটা পাড়তেই দ্বিধা হল। রুক্মিনী দেবী দিল্লী এলে আমরা দুজনে ওঁর আঙ্গিকের শিক্ষার কোন উপায় আছে কিনা জানতে চাইলাম। উনি ললিতা শাস্ত্রীর কাছে নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ইতিমধ্যে লেডি শ্রীরাম কলেজে বাংলায় অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজটি অনেক দূর। যদিও কর্তৃপক্ষ আমাকে কোয়ার্টার দিচ্ছিলেন (উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার পাননি) তবু আমার সে কাজ নিতে বাধো বাধো লাগল। কী করে বলব? যতই স্বাধীনচেতা বলে নিজেকে মনে করি না কেনো, বাস্তব প্রয়োজনের সময় কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে চিরকালের

প্রবাহমান সংস্কার আর সংকোচ বলতেই দিল না যে, "তুমি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বাসা ছেড়ে আমার কোয়ার্টারে এসো।" এর পরিবর্তে রামজস কলেজের পার্টটাইম কাজ পেয়েই খুশী হলাম। স্বাধীন উপার্জনের স্বাদ খুবই ভাল লাগল। ক্রমে দিল্লীতে শিল্পী রূপে পরিচিত হতে সুরু করেছি এমন সময় আমার স্বামী কর্মক্ষেত্র বদলে চণ্ডীগড়ে গেলেন। আমিও চাকরি, নৃত্যচর্চা ছেড়ে ওঁর পিছু নিলাম। চণ্ডীগড়ে তখন সংস্কৃতির দুর্ভিক্ষ। সন্তোষদা ওখানে একবার 'শ্যামা' করানোর পর পাঞ্জাব উইমেনস কলেজে নৃত্যের অধ্যাপিকা হলাম। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর ডাকে কলকাতায় এসে প্রাণভরে নৃত্যানুষ্ঠান করেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেবকী বসু'র অর্ঘ্য ছবিতে পূজারিণী'র শ্রীমতীর অংশ নিয়েছিলাম। এ সময় দু একটি ছবিতে নামবার আমন্ত্রণ পাই। তারাশঙ্কর 'আম্রপালি'র জন্য এসেছিলেন। সিনেমা জগত আমাকে আকর্ষণ করেনি। নৃত্যচর্চায় আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভাল লাগত। সিনেমায় নামলে মনে হত যেন পরিচালকের মর্জি মত চলতে হবে, পোশাক পরতে হবে। এখনও আমি আমার তরুণী নৃত্যসঙ্গীদের এই কথা বলি। নৃত্যে তারা নিজের হাতে, সিনেমায় একটি বাণিজ্যিক চক্রে তারা একটি পুরুষশাসিত আওতায় পড়ে যাবে। কে যে দেবী আর কে যে বারাঙ্গনার ইমেজ পাবে তাতে শিল্পীর হাত নেই।

এবার এলো একেবারে পালা বদলের দিন। স্বামীর সঙ্গে পাড়ি দিলাম সুদূর নাইজিরিয়ায়। বিদেশের উত্তেজনা কমতেই নৃত্যের জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল। নাইজিরিয়ার ভারতীয় নৃত্য বলতে মানুষের ধারণা ছিল সস্তা হিন্দী সিনেমার নাচ। লেগস থেকে ৪৫০ মাইল দূরে শহর ছেড়ে নির্জন গ্রামাঞ্চলে নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাস। আন্তর্জাতিক পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করার পরই অনেকের অনুরোধে একটি নৃত্যকেন্দ্র করালাম। ১৯টি দেশের ছাত্রী পেলাম। বন্ধু নাইজিরিয়ার বিখ্যাত শিল্পী

শ্রীমতী আসিকিয়েকে। ওর আশ্চর্য সুন্দর নৃত্য আমাকে আকর্ষণ করত খুব। ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওর গ্রামের প্রচুর অনুষ্ঠান দেখেছি। এক একদিন গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় আফ্রিকান ড্রামের শব্দ শুনে থেমে, মুগ্ধ হয়ে নাচ দেখেছি। ভালো লাগত মায়েদের বাচ্চা পিঠে নিয়ে নৃত্যাভ্যাস। শিল্পকলাকে ওরা জীবনের বাইরের জিনিস মনে করেনা তাই ঘরকন্না, শিশুপালন, সামাজিক বন্ধন সব কিছুর মধ্যে ওদের নৃত্যচর্চা এমন বলিষ্ঠ ও সজীব হয়ে থাকে। ক্রমশ যখন সংসারে জড়িয়ে পড়লাম, মা হলাম, আমার নৃত্যচর্চাও ঠিক ঐ খাতেই চলল। আমি গার্হস্থ কলার সঙ্গে নৃত্যকলার কোনো বিরোধ দেখিনা। দাম্পত্য কলায় তো মোটেই নয়। নৃত্যের প্রেরণা, তার আনন্দ আমার জীবনের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে।

আসিকিএ'র কাছে শিখে নাইজিরিয় দূরদর্শনে ওক্রিকা, আফিকপো, ইচেকিরি নৃত্যানুষ্ঠান করেছি। নাইজিরিয় পোশাক পরেছি মস্ত পাগড়ী বেঁধে। আসিকিএ আমার স্বামীকে ভাইফোঁটা দিয়ে "blood brother" করেছিল। এমন আত্মীয় সম্পর্কে বিদেশের জীবন মধুময় হয়েছিল। এমন সময় ১৯৬৩ সালে আমাদের সন্তান রঞ্জাবতীর জন্ম। ইতিমধ্যে স্বদেশীয়দের মন্তব্য শুনেছি, "নাচের জন্যে বাচ্চা হচ্ছেনা।" কথাটা আংশিক সত্যি। এবার সত্যিই মা হবার ইচ্ছে হয়েছিল। শিশু রঞ্জাকে আফ্রিকার কায়দায় পিঠে নিয়ে নেচেছি। মোট পাঁচ বছর নাইজিরিয়া বাসকালীন দুবার দেশে এসে ১০।১১ মাস করে মার কাছে থেকেছি। আমার স্বামীর সঙ্গে একটি নীরব সর্ত ছিল যে দুজনে ঘন ঘন চিঠি দেব, সপ্তাহে অন্তত দুটি, পারলে তিনটি। সারা জীবনই এই ধারাটি বজায় আছে। চিঠি হতো কতকটা দিনলিপির মত। এই সময়ই গুজব রটে আমাদের নাকি বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। "আপনি এখনো ফেরেননি?" "তুমি ফিরছনা?" ইত্যাদি—মন্তব্য জর্জদার বাড়িতে মহড়ায় বান্ধবীর শাশুড়ি, সহকর্মীর কট্টর মার্ক্সিস্ট স্বামী, সমবয়সী বন্ধু নির্বিশেষে শুনেছি সকলের কাছেই। একবার আমার মা হাসপাতালে ছিলেন

ক'মাস। শ্বশুরকুলের এক গুরুজন বলেন, "এমন থাকলে পার্বতীর (আমার স্বামী) কষ্ট হবে। বেশ বিনীতভাবেই বলেছিলাম, "কার আমাকে বেশী দরকার এখন ? আমার জোয়ান স্বামী না রুগ্না মায়ের ? কে বেশী অসহায় ?" সমাজ মেয়েদের কর্তব্য বিয়ের সময় ইঁদুরের মাটি আর চাল দিয়ে সেরে দেবার বিধান দিয়েছে। আমি একে মেয়েদের নিজেদের স্বার্থপরতা বলেও মনে করি।

নাইজিরিয়াতেই আমার নৃতত্ত্বের দিকে প্রবণতা আসে। নাইজিরিয় নারীর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, গোষ্ঠীচেতনা আমাকে অবাক করে দিত। দেখতাম একটি নারীর সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত কর্মসাফল্যের উপর! বেশীর ভাগ নারীই তার নিজ নিজ আয়ত্তের মধ্যে এক একটি জীবিকা গ্রহণ করে। বাজারের বড় অংশ পরিচালিত হয় নারীদের দ্বারা। বাজারে, গ্রামে সর্বত্র অজস্র নারী সমিতি। এগুলি আমাদের দেশের তথাকথিত লেডিস ক্লাব নয়। এগুলির মধ্য দিয়ে নারী যেমন অর্থনৈতিক লেনদেন-এর সুবিধা পায় তেমনি পায় একটি গোষ্ঠীর সহায়তা। স্বামী বা শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতন হলে এই সমিতিগুলি এগিয়ে আসে নারীর স্বার্থে।

১৯৬৬ ডিসেম্বর, নাইজিরিয়া ছেড়ে গেলাম আমার স্বামীর নতুন কর্মক্ষেত্র ন্যুইয়র্ক ষ্টেটের ন্যুপাল্‌ত্‌জে। চারদিক বরফে ঢাকা। গৃহভৃত্যহীন, আয়াহীন ঘরে তিন বছরের শিশুকন্যা। একটু আধটু নৃত্যানুষ্ঠানের সুযোগ এলেও শিল্পীর বেঁচে থাকার মত পরিবেশ ছিল না। একদিন নিস্তব্ধ দুপুরে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। বাইরে জুঁই পাপড়ির মত বরফ পড়ে যাচ্ছে। মনে হল সব যেন নিষ্প্রাণ। নৃত্যরস শুকিয়ে গেলে সাংসারিক সুখেও আমার অন্তর শূন্য। হঠাৎ সেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৃত্যাভ্যাস করলাম। এরপর মস্ত দেওয়াল আয়না লাগালাম নিয়মিত চর্চা করবার জন্যে। এমনি সময় প্রথম আশীর্বাদের মত কবি অমিয় চক্রবর্তী দর্শনের অধ্যাপক হয়ে সস্ত্রীক এলেন ন্যুপাল্‌ত্‌জে। আমেরিকার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়

ও গুণীজনের সঙ্গে ছিল ওঁদের যোগাযোগ। আমার একটা অনুষ্ঠান দেখে ওঁরা উদ্যোগী হয়ে নানা বিশিষ্ট জায়গায় আরো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দিলেন। কলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ে **Artist in Residence**, ন্যুইয়র্কের প্রাট ইনষ্টিটিউটে **Scholar in residence** হয়ে কাটালাম সপরিবারে গরমের ছুটিতে। যোগাযোগ হল নামী ইম্প্রেসারিও শ্রীমতী কজুকোর সঙ্গে। এবার নৃত্যশিল্পী জীবনে নতুন অধ্যায় সুরু হল। দেড়দশক ধরে সারা মার্কিন দেশ, কানাডা, মেক্সিকোয় অনুষ্ঠান করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যের অধ্যাপনা করেছি। পড়িয়েছি **Non Western Culture** এর বিভিন্ন বিষয়। বাড়িতেই একটি ষ্টুডিও করে ছাত্রছাত্রীদের নাচ শিখিয়েছি। ওদেশে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এই ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি। আমার স্বামী ও ছোটভাই নীলাদ্রি বারবারই বলতেন "তোমার দেশ ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকা উচিত নয়।" '৬৯ সালে দেশে এসে ১১ মাস ছিলাম। অনুষ্ঠানের ফাঁকে পুরনো শাস্ত্রীয় নাচগুলি ঝালাই করলাম। কন্যার নাচশেখা ও বাংলাচর্চা দুটোই ভাল করে হল। স্বামীর সঙ্গে পত্রালাপ আগের মতই চলেছে। বন্ধু মহলে শুনলাম খুব গুজব, "এবার সত্যি সত্যিই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।" স্বামীর এক সহপাঠী নাকি বলেছিলেন, "অমন ভাল ছেলেটার জন্য বড় দুঃখ হয়!" সহপাঠিনী রিক্তা বলল, "**Wishful thinking**। আসলে একটা মেয়ে হয়ে শুধু চুটিয়ে সংসার করবি তা নয় এমন স্বাধীনভাবে নেচে বেড়ান এতটা কি সহ্য করা যায় কখনো?"

বিচ্ছেদের সরস গল্পটি যারা রটিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে হতাশ করে আমেরিকায় ফিরে ভর্তি হলাম ৯০ মাইল দূরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্বের এম. এ. কোর্সে। আগে বেশ ক'বছর ধরে ন্যুপাল্‌ত্‌জে নৃতত্বের কোর্স পার্টটাইমে নেওয়া সুরু করি। জীবনের আর এক অধ্যায় সুরু হল। এর আগে ট্যুরে গিয়েছি দুএকদিনের জন্য। নতুন জায়গায় গিয়ে ফোন করেছি, মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি আবার ফিরে এসেছি ন্যুপাল্‌ত্‌জের নিভৃত সংসারে।

এবার অনভ্যস্ত ছাত্রীর ভূমিকা। কলম্বিয়ার পরিবেশে জীবনের পরিধি অনেক ছড়িয়ে পড়ল। নৃতত্বে ক্রমশ নারীশিল্পীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন মনে এল। একবছরে বেশ ভাল ভাবে এম.এ. উত্তীর্ণ হলাম। স্বামী ও বন্ধুরা উৎসাহ দিলেন Ph.D করতে। ইতিমধ্যে নৃতত্বে অধ্যাপনা সুরু করলাম ভ্যাসার কলেজে ও ন্যুপাল্তিজে। রান্না করা খাবার ফ্রীজে ভরে ৯০ মাইল দূরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D-এর কোর্স করতে যেতাম। বাড়ি ফিরে দেখতাম খাবার গরম করে টেবিলে সাজান। একবার অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে তো অবাক। দেখি সকন্যা স্বামী তিনচার পদ রান্না করে সাজিয়েছেন। প্রায়ই বলতেন, "তোমার রান্নার কেমিষ্ট্রিটা শিখে নিতে হবে।" এতটা যে শিখে ফেলেছেন জানতামনা। মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম, "এবার আর আমাকে তোমার দরকার নেই।" উত্তরে বলেন" "আমার রাঁধুনী হবার জন্য তোমাকে বিয়ে করেছিলাম বুঝি!"

এবার Ph. D গবেষণার field work এর তাগিদ এল। ছেলেবেলা থেকেই মণিপুর আমাকে আকর্ষণ করে। একাধারে নৃত্যের ঐতিহ্য ও নারীর আত্মনির্ভরতা এ দুটির এমন সংযোগ আর কোথায় পাব? যোগাযোগ হয়ে গেল শিল্পী শানু লাহিড়ীর মাধ্যমে মণিপুরের মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে। অনেক সাহস সঞ্চয় করে দশম শ্রেণী স্কুল থেকে ছুটি করিয়ে মেয়েকে নিয়ে মণিপুর গেলাম। এক বছরে স্বামী দুবার কয়েক সপ্তাহের জন্য ঘুরে গেলেন। কন্যাও থাকল কলকাতায় দিদিমার কাছে। জীবনে প্রথম একা আত্মনির্ভর হয়ে একটি অপরিচিত পরিবেশে এলাম।

ইতিমধ্যে আমার নৃত্য-ভাবনার প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। ছাত্রী জীবনে মার্থা গ্রাহামের নৃত্য, নগুচির মঞ্চস্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছিলাম। ন্যুইয়র্কে কেবল মার্কিন নয়, সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান (বালা সরস্বতী সমেত) প্রাণভরে দেখেছি। নিজে যেমন ওয়ার্কশপ দিয়েছি তেমনি সুযোগ পেলেই

যোগ দিতাম মার্স কানিংহাম, পলটেলর, কোরিয়ান শিল্পী ডঃ চো, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান শিল্পী প্রেষ্টনে—এমন অনেক শিল্পীর ওয়ার্ক-শপে। দূরদর্শনে চ্যানেল ১৩ নিয়মিত শ্রেষ্ঠ নৃত্যানুষ্ঠানগুলি দেখালে চোখ ভরে দেখতাম। নিজে অনেক অনুষ্ঠান করেছি তবে ভারতীয় নৃত্যের অতি পরিচিত পরিবেশ পাইনি। কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক নৃত্যভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের নৃত্যকে মনের গভীরে অনুভব করতে পেরেছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যচিন্তার মৌলিক প্রভেদটি বিশ্লেষণ করতে পেরেছি। খুব ইচ্ছা হত দেশের মাটিতে একটি আধুনিক নৃত্যগোষ্ঠী গড়ে তুলি, যার কাঠামো হবে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের আর মানসিকতা হবে আধুনিক। ক্রমশ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে সংশয় এল। রাধাকৃষ্ণ, রাম-সীতা, হর-পার্বতী আখ্যানগুলির মধ্যে আধুনিক মানসিকতার কতটা যোগ এমন প্রশ্ন মনে এল। দেবদাসী, বাঈজী, মাহারী—সকলেই কি পুরুষের মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়নি ? বহুবল্লভ কৃষ্ণের লীলাকে যেভাবে ওড়িশী, কত্থক, ভরতনাট্যমে (এক মণিপুর ছাড়া) দেখান হয় তার ভিতরে নারীর অবমাননাই লক্ষ্য করতাম। ভরতনাট্যমের বিখ্যাত বর্ণম "দানিকে তাকুজা" অংশ, গীতগোবিন্দের অনেকগুলি পদ কি নারীর যৌনতা নিয়ে পুরুষের fantasy নয় ? শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে আমার অসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু অনেকগুলি নৃত্যের বিষয় পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যই। শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে বেছে নিতাম শিবশক্তি, অষ্টভুজেশ্বরী, যশোদা-গোপাল সংক্রান্ত ও কিছু বিশুদ্ধ নৃত্য। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। নারী শিল্পীর জন্য এমন একটি বিশুদ্ধ আধুনিক নৃত্যের ক্ষেত্র আমরা আর কোথায় পেতাম ? ঝুলন, দুঃসময়, সুপ্রভাত, সবলা কবিতার সঙ্গে, চিত্রাঙ্গদা, প্রকৃতি, মায়া এমন কি শ্যামার নৃত্যের গভীরে যারা একবার যেতে পেরেছেন তাঁদের কাছে ঐসব ন্যাকা ন্যাকা কামকুণ্ডয়ন করা নৃত্যগুলি অসহনীয়।

এই সময়ই মীরার জীবনের আধুনিক নৃত্যভাষ্য নিয়ে নৃত্যকথা রচনা করি। মেক্সিকোয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলনীতে একটি

ক্যারিবিয়ন লোককথা আশ্রয় করে ১১টি দেশের শিল্পী নিয়ে তৃতীয় বিশ্বে ঔপনিবেশিকতা আর নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে নৃত্যনির্মিতি করি। ১৯৭৫ এ মেক্সিকো যাবার অভিজ্ঞতাটি বলার মত। যখন আমন্ত্রণ এল সে সময় আমার স্বামী আফ্রিকা সফরে। ১২ বছরের মেয়েকে একা রাখি কোথায়? ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে মেক্সিকো এমবাসী থেকে জানাল, আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কন্যাকে আমেরিকার বাইরে নেওয়া চলবে না। "আপনিই যে ওর মা তার প্রমাণ তো ওর পাসপোর্টে নেই"। তাইত, ভারতীয় সংবিধানে নাকি আমরা পুরুষের সঙ্গে সমমর্যদার! তাই গাড়ী চালাবার লাইসেন্স, জমি কেনা, পাসপোর্ট সর্বত্র বিবাহিত হলে স্বামীর পরিচয় থাকে। অবিবাহিতের পিতৃপরিচয় থাকে, মায়ের কোন মর্যাদা নেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সেই ভিসা পেলাম।

১৯৭৭ এ মণিপুরে একটা বছর কাটিয়ে অনেকের পিসি, দিদি, বোন হয়ে যখন ফিরলাম মনে হল আমার আর এক জন্মের পরিবার ছেড়ে চলেছি। মণিপুরী পোশাক পরে মানুষের কাছাকাছিই কেবল আসিনি, নারী জন্মে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। বাঙালীর অনেকের কেমন বদ্ধমূল ধারণা নারী প্রগতি ও স্বাধীনতার অর্থ উগ্রতা, অসাংসারিক হয়ে যাওয়া। মণিপুরী মেয়েদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বনির্ভরতা একটি শালিনী নমনীয়তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি।

মণিপুরী নারী যেমন আত্মনির্ভর তেমনি কতকটা পশ্চিম আফ্রিকার নারীদের মত একটি গোষ্ঠী চেতনায় বিশ্বাসী। বাজার, হাট, গ্রামের চাষবাস, সংকীর্তন সব কিছু পরিচালিত হয় অজস্র নারী সংঘের দ্বারা। কোন নারীই ঠিক একা নয়। গ্রামে, সহরে প্রতিটি নারী একাধারে ৪/৫টি সঙ্ঘের সভ্য। বাজারের পসারিণীকে বলা হয় "বইথেলগীইমা" বাজারের মা।

এবার মার্কিন মুলুকে ফিরে আর মন টিঁকছিল না। তার একটা বড় কারণ মেয়ে স্বদেশের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। অনেক অনুষ্ঠানের ডাক এল। মন ভরল না। সন্তানবিরহ মর্মে মর্মে অনুভব করতাম।

দেশে ফেরার আগিদেই এক বছরে **Ph. D** থিসীস শেষ করলাম। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় **"Distinguished"** খেতাব দিয়ে **Ph. D** দিল। বেশ অভিভূত হলাম। কনেকটিকট বিশ্ববিদ্যালয় আড়াই বছরের জন্য গবেষণার কাজ দিল বীরভূমের গোয়ালপাড়া গ্রামে। দুজনেই ঠিক করলাম এবার দেশে ফেরা যাক। একটি আস্তানা গড়ার প্রস্তুতি শুরু হল। এরপর প্রায় চারবছর কখনো একা, কখনো দুজনেই কখনও বা তিনজনে দুদেশে যাতায়াত চলেছে। গোয়ালপাড়া-শান্তিনিকেতন থেকে সপ্তাহান্তে এসে সল্টলেকের আস্তানা আর নাচের দল গড়ে তুলেছি। অনেক কাল বাদে কলকাতার মাটিতে কিছু প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের নিয়ে সল্টলেকের বাড়িতে 'ডান্সার'স গিল্ড করেছি। রুদ্রমধুর, সবলা, রক্তে মোর জাগে রুদ্র-বীণা, মীরাবাঈ, চিরন্তনী, তোমারি মাটির কন্যা, গঙ্গোত্রী, রাগ ও রূপান্তর আরও বেশ কয়েকটি নৃত্য পরিকল্পনা করলাম আধুনিক শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে। নৃত্যের মধ্যে একটা কিছু বলার থাকলে প্রেরণা পাই। "সবলা" কবিতাটির পটভূমিকায় নারীর দৈবাগত ভাগ্য ব্যাপারটি বোঝাতে তিনটি অধ্যায় দেখিয়েছি: বিবাহ, সন্তানের জন্ম ও ঘরবাঁধা। 'মাটির কন্যা'য় অন্ত্যজ নারীর দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়, ব্রাহ্মণ্য সমাজের আওতার বাইরে ধর্মাচারে নারীর পুরোহিত ভূমিকা আমাকে আকর্ষণ করে। 'গঙ্গোত্রী'-ও নারীর বিচিত্র সম্ভাবনা তুলে ধরেছে। রাগ ও রূপান্তরে—শাস্ত্রীয় রাগের নৃত্যভাষ্যে 'শক্তি রূপকেই নানা-ভাবে দেখান হয়েছে। যেমন আনন্দজাহ্নবী (মালকোষ), সূর্যসম্ভবা (বৃন্দাবনীসারং), পিতরৌ (রুদ্রভৈরব), পরমা (সোহিনী) ইত্যাদি। এবার স্বামী পাকাপাকি ভাবে দেশে এলেন। পুরনো পারিবারিক ছন্দ ফিরে এল।

গোয়ালপাড়ায় মুচি মেয়েদের ভাজো দেখতাম রাত জেগে। ভাদুর দলে ঘুরতাম। রাত জেগে ধর্মপূজা দেখলাম দুবছর। এখানেও মানুষের প্রীতিতে প্রাণ ভরেছে। কিন্তু মণিপুরে যেমন মেয়েদের সজীব জীবনে একটি প্রাণোচ্ছল প্রেরণা পেয়েছি, পশ্চিম-

বঙ্গের এই গ্রামাঞ্চলে তা হয় নি। উচ্চবর্ণের মেয়েদের ফ্যাকাসে চেহারা, পণ, দেনা-পাওনা, মেয়ে দেখার দর কষাকষি, সন্তান জন্ম আর "অপ্রেসন" (female sterilization) সব সময় এই ধরনের কথা শুনে মন দমে যেত। কোন গোষ্ঠি চেতনাই নেই। মেয়েরাই যেন মেয়েদের বড় প্রতিবন্ধক। মণিপুরে আমার নৃত্যশিল্পী পরিচয় ছিল একটি সম্পদ। লাইহরাওবা উৎসবের শোভাযাত্রায় গ্রামের মা, মেয়ে, বউদের মধ্যে মেয়েদের সারিতে আগে দাঁড়িয়ে নৃত্য ভঙ্গীতে বাজার, বড় রাস্তা দিয়ে সবার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছি নাম্বোলের খোরিফবা মন্দিরের টিলায়। মন্দির প্রাঙ্গণে শত দর্শকের সামনে দেবার্চনার নৃত্য করেছি। ভক্তরূপে অনেক পুরুষ নমস্কার করে পায়ের কাছে দক্ষিণা রেখে গিয়েছে। গোয়ালপাড়ায় আমার নৃত্যশিল্পী পরিচয় দিইনি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নৃত্যশিল্পী সম্মানের ব্যক্তি নয় তা শান্তি-নিকেতন থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে হলে কী হবে? এই সংস্কার শিক্ষিত বাঙ্গালীরও মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। নইলে বারবারই কেন শুনব আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে? এও শুনেছি যে আমি প্রচুর মদ্যপান না করে মঞ্চে নামিনা। (প্রসঙ্গত বলি আমরা দুজনেই মদ্য স্পর্শ করিনা)—এই গুজবগুলির পেছনেও শিল্পী, বিশেষ করে মহিলা শিল্পীদের প্রতি একটি অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ প্রকাশ পায়।

স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কে গণ্ডগোল আছে বলেই বিবাহবিচ্ছেদ নয়, শিল্পীদের ক্ষেত্রে হলে তাদের শিল্প সাধনাকেই কেবল দায়ী করা হয়।

সেই ১৯৫৮ সালে মাদ্রাজে অসুস্থ হয়ে অনুষ্ঠান করতে গেলে বৌদি (সন্তোষ সেনগুপ্তের স্ত্রী) আমাকে ও আরো কজনকে ২০।২৫ ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে চাঙা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বছর পরে এক আত্মীয় সে কথা শুনে এলেন এক আড্ডায় "মাদ্রাজে তো মদে চুর হয়ে নেচেছিলেন!"

এক ছেলেমানুষ বন্ধু এসব শুনে বলল, "আসলে তুমি নির্ভেজাল একটি ঘরের গিন্নী না হয়ে থেকে একজনের মা হয়েও

মেয়েকে নিয়েই নাচবে, আচার দেবে, সস্ করবে, রিহারস্থাল দেবে, বই ছাপাবে—এতসব একসঙ্গে বড় খাপছাড়া বলেই অনেকের কাছে অসহ্য।" আমি বলি, "কেন আমার মা তো দশটি সন্তানের জননী হয়ে কেমন একটা বিরাট প্রশাসনের সংসার চালিয়েছেন। আমার তো একটি সন্তান; আরো নটি সন্তান মানুষ করার ক্ষমতা আমার থাকা উচিত। আমি মায়ের দেওয়া ক্ষমতা কেবল এদিক ওদিক চ্যানেলাইজ করছি মাত্র।"

আমেরিকা ছাড়বার আগে এক বাঙ্গালী অধ্যাপক শোনালেন, "আপনি তো বেশ থাকবেন। নাচের দল আছে, অনেক কিছু করতে পারেন। ডঃ সরকারের কথা একবার ভেবে দেখেছেন কি? যদিও দেশে ফেরার ব্যাপারে আমাদের দুজনেরই প্রবল উৎসাহ (আমার স্বামী দেশে ফিরেও যথেষ্ঠ ব্যস্ত) তবু না বলে পারলাম না, "সারা জীবন তো চাকরী ছেড়ে, নৃত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে ডঃ সরকারের পিছন পিছন ঘুরলাম তখন আমার কথা কি আপনারা ভেবেছেন?" সমাজ মেয়েদের ত্যাগে এত অভ্যস্ত যে তার কোন মূল্যই নেই। সারাদিন রান্না করে, অতিথি সৎকারের পর আমার স্বামী যদি সাহায্য করতে আসেন তখন অতিথিরাই হাঁ হাঁ করে ওঠেন। এখানে আমার শ্রান্তি তাদের নজরে আসেনা। বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই একই ধারা লক্ষ্য করেছি।

এখন পরিণত বয়সেও শুনি একই বস্তাপচা প্রশ্নগুলি "মেয়ে এত পড়াশোনায় brilliant, এমন নাচে, ওর পাত্র পাবেন কোথায়?" অর্থাৎ নারী পুরুষের চেয়ে নিচু মর্যাদার না হলে গার্হস্থ্য সুখ থাকবে না। আমি বলি, "আচ্ছা সংসারের কটি দজ্জাল বউ লেখাপড়ায় brilliant আর নৃত্যশিল্পী একটু দেখাবেন? স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শিল্পচর্চা বা ডিগ্রী কোন কিছুরই সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক নেই। আমার তো মনে হয়, আমাদের মাতা-কন্যার শিল্পচর্চা পারিবারিক জীবনকে সুষমাময় ও সজীব করে রেখেছে। আর এই যে মাঝে মাঝে প্রোষিতভর্তৃকার জীবন এতে দাম্পত্য রোমান্স বরঞ্চ সারা-

জীবনই সজাগ থাকে। তাই বলি পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, স্বামী—কোনো জায়গা থেকেই বাধা পেলাম না, কেবল যুগ যুগ ধরে চলে আসা এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডির আবর্তে পাক খাওয়া কিছু স্ত্রী-পুরুষের গাত্রদাহের ঝাঁঝ পেয়েছি বারবার। তবে সহৃদয় বন্ধুরও কোনো অভাব নেই আমাদের। আশার কথা এটাই।

আমার "আজ আমি" কথাটা নানা আমি'র গল্প হয়ে গেল। হয়ত ওভাবে সারাটা জীবন স্বামীর পিছু পিছু না ঘুরে একই জায়গায় শিল্প সাধনা করলে বড় শিল্পী হতে পারতাম, কিন্তু জীবনের অনেক মজা এতে বাদ পড়ে যেত। শিল্পী জীবনে অনেক বাধা অনেক হতাশা এসেছে। তবু যে পরিবেশেই গিয়েছি নিজেকে প্রকাশের একটা ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছি। বাঁচবার তাগিদেই এটা সম্ভব হয়েছে। মনে হয় ঐ অন্য আমিগুলি না থাকলে আজকের এই শিল্পী আমিকে বোধহয় এতটা পছন্দ করতাম না। তাই কোন খেদ নেই আজ আমার কিছুতেই।

লেখালিখি

মহাশ্বেতা দেবী (সাহিত্যিক)

লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে বাধা আসতে পারে পরিবার থেকে, এবং কর্মজগতে। আমাকে তাই পিছনে ফিরে তাকাতে হচ্ছে, ভাবছি।

পরিবার থেকে বাধা পাবার কথাই ওঠে না। আমি যেমন পরিবারের মেয়ে, তেমন পরিবার অনেক থাকা সম্ভব, আমি জানি না। পাবনা জেলার নতুন ভারেঙ্গা গ্রাম আমার মাতুলালয়, পিত্রালয়, ছুটোই। আমার দিদিমার বাবা ছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তীর পিতামহ যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর প্রতিটি মেয়ে বাড়িতে লেখাপড়া শেখেন। আমার মাতামহ নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী আমার দিদিমাকে সংস্কৃত ও বাংলা পাঠে সাহায্য করেন। আরেকটা জিনিষ ছিল পিতৃ ও মাতৃ বংশে। মেয়েদের, বধূদের, খুব সম্মানিত স্থান ছিল বাড়িতে। ঠাকুর্দার চার মেয়ে, মায়েরা চার বোন, আমরা পাঁচ বোন। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কোনও তাচ্ছিল্যও ছিল না। মায়েরা, পিসিরা, পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান, অভিনয় সব কিছুতেই বাড়িতেই উৎসাহ পেয়েছেন। দুই বাড়িতেই ছিল বড় লাইব্রেরি। দিদিমা খুব মনস্বিনী মহিলা ছিলেন।

তাঁর বড় ছেলে (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গত শচীন চৌধুরী) এম. এ পাশ করার পর দিদিমা ইংরিজি শেখেন। ইংরিজি ও বাংলা ভালো বই পড়ার উৎসাহ দু'তরফেই পেয়েছি। মামাবাড়ি স্বদেশী আন্দোলনেও উৎসাহী। দিদিমা ও দাছুর ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে ব্যক্তিসম্পর্ক ছিল। অন্যান্যও রাজনীতিক সংযোগ ছিল।

লেখালেখি? দিদিমা, মাসি শকুন্তলা দেবী (রায়) ও আমার মা, তিনজনেই লিখেছেন লীলা নাগ (রায়) সম্পাদিত "জয়শ্রী"

কাগজে। আমার মায়ের গল্প ও কবিতা সুধীন দত্তের "পরিচয়" কাগজে বেরিয়েছে। "বসুমতী" তে মা তাঁর প্রিয় লেখিকা পার্ল বাকের একাধিক লেখা অনুবাদ করেছেন একদা। বড়মামা শচীন চৌধুরীর সহায়তায় মা বম্বেতে পার্ল বাকের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর সাক্ষরিত বই উপহার পান।

এমন পরিবার থেকে লেখালেখিতে আমাকে বাধা দেবে কে? শৈশবে শান্তিনিকেতনে লিখেছি। কলকাতায় ১৯৩৯ সালে খগেন সেন সম্পাদিত "রং মশাল" কাগজে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা বিষয়ক লেখা বেরোয় তখন তো আমার বয়েস তেরো। জন্ম ১৪, ১, ১৯২৬ সালে।

শুধু লেখালেখি নয়। তখনকার সংকীর্ণ সমাজে আমি সাইকেল চড়তাম। খেলাধুলো করতাম। গান গেয়েছি, নেচেছি, অভিনয় করেছি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ত্রাণকার্যে জড়িয়ে গেছি।

নিজের মতো করে বড় হওয়ার পথে কোনো বাধা পাইনি। কোনো দিনই না। ভাইবোনেরা কেউই পায়নি। দুই বাড়িই ছিল নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। "পণ" শব্দটি ছিলো অজানা।

মায়ের মামীমা, অমিয় চক্রবর্তীর মা অনিন্দিতা দেবী "বঙ্গনারী" নামে মেয়েদের সামাজিক অধিকার ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে লিখতেন।

এসব মিলিয়ে মিশিয়ে পরিবারে একটা পরিবেশ ছিল। সব চেয়ে ঋণী আমি মায়ের কাছে। যিনি আমার জীবনের সর্ববস্থায় ছিলেন প্রেরণা। যুঝে চলবার প্রেরণা। আমার স্বাধীন আচরণে দুঃখ পেলেও, তার পরিণামের ভার আমার, এটাকে সম্মান করতেন। পরিবারে দুদিকে সকলের কাছেই উৎসাহ, সাহস, ও যাকে বলে আনডারস্ট্যানডিং পেয়েছি। বাবা তো সাধারণ মানুষের অনেক উপরে ছিলেন। চরৈবেতি ছিল তাঁর মন্ত্র। তাই পরিবার আমাকে কোনো বাধা দেয় নি।

প্রথম বিবাহ বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বিজন "নবান্ন" স্রষ্টা, বিজন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গের লোক। এই বিয়েটাই আমাকে "আজকের

আমি”—হয়ে ওঠার ভিতটা গড়ে দেয়। সে সময়েই সংগ্রামের প্রয়োজন। সাধ্যমতো বিবেকী ও সৎ থাকার দরকার, আর বাম-পন্থার রাজনীতির প্রতি অগাধ বিশ্বাস, রক্তে ঢুকে যায়।

সে সব দিন খুব মহান ছিল। মানুষ গড়ার দিন। কম্যুনিষ্ট বলে যাদের ভাবা হত, তাদের জীবিকার্জন ছিল কঠিন। দারিদ্র ছিল, তাতে লজ্জা ছিল না। সাজসজ্জার প্রতি আকর্ষণ যদি বা কৈশোরে কোনদিন থেকে থাকে, তা তো আগেই চলে গিয়েছিলো। সাধারণের মত সাধারণ হওয়াতেই ছিল আনন্দ। ওই সব দিনই আমাকে মোটামুটি তৈরি করে দেয়।

সে সময়ে শুধু জীবিকার্জনের জন্যে “সচিত্র ভারত” কাগজে “সুমিত্রা দেবী” নামে হালকা গল্প লিখেছি। সে সময়েরই সৃষ্টি “অনবরত বাগচী।” যাকে এখনো ত্যাগ করিনি।

“ঝাঁসীর রানী” লেখার সময়ে লোকবৃত্ত থেকে উপাদান সংগ্রহ করব, রানীর ভাইপোর সঙ্গে দেখা করব বলে চার বছরের ছেলে বাপ্পাকে রেখে গেলাম ওর বাবার কাছে। ঘুরলাম ঝাঁসী-গোয়ালিয়র, খরছা কত জায়গা। সে সময় ডাকু মান সিংয়ের সময়। বিজন কোনো বাধা দেন নি। ও সব জায়গার লোকরা অবাক হলেও সাহায্য করেন অকুণ্ঠ উদারতায়।

“ঝাঁসীর রানী” সাপ্তাহিক “দেশ” কাগজে ধারাবাহিক বেরোয়। বই বেরোয় ১৯৫৬-তে। তারপর থেকে কলম আর থামেনি। আমার প্রথম বই থেকেই কর্মক্ষেত্র পেশাদারী লেখার জগত। সেখানেও সে সময়ে পেশাদারী ভাবে সুপ্রতিষ্ঠায় ছিলেন আজও অগ্রগণ্যা আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু। কিন্তু লেখার ব্যাপারে পুরুষ সম্পাদক-প্রকাশকের কাছে প্রচণ্ড বাধা ?

আমার অভিজ্ঞতায় পাইনি। বই লিখে অর্থোপার্জন করা আমার দরকার ছিল। পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকের কাছে আহ্বানই পেয়েছি।

পুরুষ লেখকরা অনেক নামী দামী ছিলেন। কিন্তু মেয়ে হলেও

আমি বই ছাপতে লেখা ছাপতে পারতাম, এটাও ঘটনা। আর এ কথাও অস্বীকার করবনা যে শুধু পয়সার জন্যে, জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে উত্তরিত করার পরিশ্রম, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে, অনেক বই লিখেছি যা চাল-ডাল তেল নুনের জন্যে।

"অমৃতসঞ্চয়" বা "আঁধার মাণিক" এ সব লেখা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ কথা সত্যি যে তার পর থেকে ক্রমশই সমালোচনার পাতায় আমি অনুপস্থিত থাকতে শুরু করি। আমি মনে করিনা যে এর কারণ আমি মহিলা। মহিলা বলেই বিশেষ উপেক্ষা বা বিশেষ সম্মান আমি পাই নি বলে ভালো লাগে। বরাবরই আমি ছিলাম পেশাদারী লেখক এবং সে ভাবেই প্রকাশক জগতও আমাকে গ্রহণ করেন। এবং এটাও সত্যি যে বরাবরই আমার কাজটুকু, অর্থাৎ বইটি লেখার পরে আমি বইটি প্রকাশকের দায়িত্ব বলেই মনে করতাম। কেন বড় বিজ্ঞাপন নিয়মিত বেরোয় না, সমালোচনা কেন হয় না, এ সব কখনো ভাবতে যাই নি।

জীবনও আমাকে ব্যস্ত রেখেছে বরাবর, ভাবার সময় বা রুচি ছিল না। কিন্তু "অরণ্যের অধিকার", "হাজার চুরাশির মা", "অগ্নিগর্ভ" থেকে আমি মূলত অন্য রকমের কাগজগুলিতে সমালোচকদের আগ্রহের পাত্র হই। গ্রাম ও শহর-নগর বাংলায় বহু ছোট কাগজের তরুণতরোরা আমার লেখা বিষয়ে লেখালেখিতে আগ্রহী হন। আমার প্রকাশকের অকুণ্ঠ সমর্থন, অসামান্য ভূমিকা, আমি কি ভুলব? প্রথম থেকেই তিনি আমার বই ছেপেছেন। কেমন বিক্রি হবে তা ভাবেন নি।

কলেজ ষ্ট্রীট, সম্পাদকদের কাছে, প্রথম দিকে নিশ্চয় গিয়েছি। কতকাল যাই না তা মনে করতে পারি না। তখন যাওয়াযাওয়ির মধ্যে একটা অন্য ব্যাপারও ছিল। বাবার কারণে, (তাঁর সমসাময়িক লেখকদের তো চিনতাম) বাংলা লেখালেখি, লেখক বিষয়ে একটা শ্রদ্ধা ও আগ্রহও ছিল। তা ছাড়া, মনে রাখতে হবে, আমি যখন লিখতে এলাম "ঝাঁসীর রানী" নিয়ে, তখন আমার বয়স

তিরিশ। বাংলায় তখন বহু লেখকই বিপুল ভাবে জনপ্রিয়। আলাপ করার আগ্রহও ছিল।

খুব তাড়াতাড়ি জীবনের সে অধ্যায়ও ফুরায়।

খানিক বাধা, খানিক অসুবিধা তো ছিলই। কেন না আমার লেখক জীবন গড়তে হয়েছিল বড় ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের ভরসায় নয়। বাইরে থেকে।

যেটা বলার কথা, একজন মহিলা লিখছেন, সেইজন্য কোনো বিশেষ তাপ বা নিরুত্তাপের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আজও মনে করি, দশকের পর দশক শুধু লিখব বলেই যদি কোনো লেখক শ্রম করে চলেন, তা হলে পত্রিকা ও প্রকাশক জগৎ তাঁকে পেশাদার হিসেবেই দেখবে। আশাপূর্ণাদেবী স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করে বেঁচে আছেন জীবন্ত কলম নিয়ে।

এটাও সত্যি যে, আজ শুধু মেয়েদের কেন, তরুণ, প্রতিশ্রুতিবান লেখক (বিশেষ যদি কলকাতার লেখক না হন), এঁদের বেলাও পত্রপত্রিকা যথেষ্ট নিরুত্তাপ। আমাদের সময়ে প্রতিযোগিতা এমন ধারালো ছিল না।

মেয়েরা সাহিত্যজগতে যথেষ্ট সাদর প্রবেশ পত্র পান না, এ কথা খুব শুনি। এটাও দেখি যে কবিতা সিংহ, যশোধারা বাগচী, আমার সহপাঠিনী রাজলক্ষ্মী দেবী, এমন আরো কয়েকজন ব্যতীত যে যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট লেখেন না।

লেখাই আমার মূল জীবিকা থেকেছে। কলেজে পড়ালাম ১৯৬৪ থেকে। দেড়শো টাকায় বেতন শুরু। বর্তমান সরকারের আমলে বেতনক্রম বাড়ল। তা আমি তো ১৯৮২ থেকে কলেজে অবৈতনিক! যুগান্তরে দুই বছর ভ্রাম্যমান সাংবাদিক। ১৯৮৪তে ঠিক একদিন জয়েন করে কলেজে পদত্যাগপত্র দিলাম। আজও কলেজ থেকে যা প্রাপ্য তা পাইনি। লেখা আজ একমাত্র জীবিকা এবং ১৯৬৪—১৯৮২, লেখাই ছিল জীবিকার্জনের প্রধান উৎস। অনেক আগেই জেনে গিয়েছিলাম যতদিন আঙুল চলে, অক্সফোর্ড

য়ুনিভার্সিটি প্রেসের পাঠ্যবই লিখেই হোক, গল্প, উপন্যাস, দৈনিক কাগজে 'কলম', কলম আমাকে ধরে থাকতেই হবে। আরেকটি কথাও বলব, লেখালেখির জগতে কখনো কোনো অসম্মান প্রথমেও পাই নি, আজ তো নয়ই। বুড়োদের কেউ অসম্মান করে না।

স্বীকার করা যাক, লেখালেখির জগতে মেয়েদের তেমন দেখা যাচ্ছে না।

এটা কি তাঁরা মহিলা বলেই ?

তাঁরা কি যথেষ্ট পরিশ্রমে পাঠকদের দিয়ে পড়িয়ে নেবেন, এমন অবশ্য পাঠ্য লেখা লিখছেন ?

"মহিলা লেখক" বলেই কি তাঁদের তুচ্ছ করা হচ্ছে ?

মহিলা লেখক বলেই এ অবহেলা, না যোগ্যতার বিচারে প্রতি-যোগিতার বাজারে এঁদের লেখা ওজনে কতটা ভারি, সে বিচারও করা হচ্ছে ?

আমি মনে করি সবরকম ব্যাপারেরই খানিকটা সত্য বটে।

ইংরিজি সাংবাদিকতায় মেয়ে সাংবাদিকরা অনেকে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। সমস্যাকুল পাঞ্জাব ও শ্রীলঙ্কা থেকে সর্বত্র ছুটছেন, লিখছেন।

বাংলা কাগজে মেয়েরা সাংবাদিকতা করছেন, কিন্তু তাঁদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্র সীমিত রাখা হয়েছে। তাঁরা আরোয়ালে হরিজন হত্যা বা ভূপাল গ্যাস বিস্ফোরণে দৌড়চ্ছেন না। গ্রাম-বাংলা ঘুরে ঘুরে দিচ্ছেন না সংবাদ।

ফ্যাশন, রান্নাবান্না, সেলাই, সাজগোজ, পণপ্রথা, বিবাহ সমস্যা, শিশুপালন, এমন কয়েকটি ক্ষেত্র এবং কিছু সাক্ষাতকার গ্রহণের মধ্যেই তাঁদের কর্ম জগৎ।

এমন কি সিনেমা-থিয়েটার-সঙ্গীত, এ সব বিষয়েও তথ্যপূর্ণ ভালো রিপোর্ট, প্রবন্ধ, এ সব লিখতেও কম মেয়েকেই দেখছি।

সাংবাদিকতার সম্ভাবনা আজ অনেক। সেখানে মেয়েদের জায়গা বেশ সংকুচিত। এমন কি কোনো মহিলা সাংবাদিক

সাহিত্যের পাতা এবং পূজা সংখ্যা সম্পাদনা করেন, এমনও দেখা যাচ্ছে না।

সুযোগ পাচ্ছেন না বলেই কি যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছেন না? না যোগ্যতা প্রমাণ করে নিজে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগোতে পারছেন না?

কাগজের লোকজন না হয় ধরে নিয়েছেন, আপনি রান্নার নির্দেশিকা, সেলাই-বোনা, শীতের সন্ধ্যায় কি শাড়ি পরবেন, কি মাখলে হবেন মনোলোভা। এর বাইরে আপনার ক্ষমতা বড় জোর কুকুর পালন বা বনশাই বিষয়ে লেখা।

আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে যে আপনি তার বাইরে। আপনি পারেন, যা লিখছেন তাতেই আপনি তৃপ্ত নন।

সৃজনধর্মী লেখা যাঁরা লেখেন, আর সাংবাদিকতা যাঁরা করেন, প্রত্যেককেই নিজেদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়াতে হবে। এই তো মনে হয়।

লেখালেখির ব্যাপারে কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়।

অসামান্য বই "বাংলার মেয়ে"র লেখিকা অপরাজিতা দেবীকে (ইনি রাধারানী দেবী নন) আমরা হারিয়ে যেতে দেখেছি। আশালতা সিংহ অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেন এবং দীর্ঘকাল না লিখে বেঁচে থাকলেন। মারা গেলেন।

পত্রপত্রিকা বা প্রকাশনা ক্ষেত্রে এঁরা বাধা পাননি। আশালতা তো বিদগ্ধ মহলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন?

পারিবারিক ক্ষেত্রে বাধা পেয়েছিলেন?

জানি না, কেউ জানায় নি।

আবার, ১৯৭২ সালে যাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়, সেই গিরিবালা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়-দেবী, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সীতা ও শান্তা দেবী, এদের এককেজনের জীবনের পটভূমি একেক রকম। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এঁরা তো নিজেদের যোগ্যতাতেই জায়গা পেয়েছিলেন।

আজ বাঙ্গালী মেয়েরা কত রকম ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। কিন্তু "লিখব আমি লিখবই", এরকম জেদ নিয়ে অনেক মেয়ে এগিয়ে আসেন না।

আগেকার লেখিকাদের জীবন অবশ্য পরিবার ভিত্তিক ছিল। সীতা ও শান্তা দেবীর ঘরানা অন্যরকম। যেমন লীলা মজুমদারের। সীতা ও শান্তা ছবি এঁকেছেন। অনুবাদ করেছেন। প্রবন্ধ লিখেছেন। আশ্চর্য ক্ষমতা ও নিজের বিশেষ জগৎ ছিল যাঁর লেখার, সেই বাণী রায় দীর্ঘকাল নীরব। বরঞ্চ প্রতিভা বসু আজও লেখেন। মায়া বসু, কণা বসু মিশ্র, এঁরা অনেকদিন লিখছেন। তবু খুব চোখে পড়ে না সব সময়ে।

এখন বাংলা পড়েন না যাঁরা, ইংরিজি পড়েন, তাঁদের কথা আলাদা। বাংলা বইয়ের পাঠক পাঠিকা প্রচুর। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিচারশীল পাঠক পাঠিকা, লেখার মধ্যে যাঁরা সমাজের সেই বাস্তব উদ্ঘাটন চান, যা তাঁদের ভাবাবে, অবহিত করবে সমাজ ব্যবস্থা বিষয়ে,—তাঁদের কাছে ক'জন মেয়ের গল্প উপন্যাস লেখার জোরেই গ্রহনীয়, এ কথাও সাহিত্য ইচ্ছু মেয়েদের ভাবতে হবে।

রাজনীতি, সমাজব্যবস্থার গলিত রূপ, মূল্যবোধে দেউলিয়া সমাজ ও রাজনীতি, এ সব যতদিন না তাঁদের ভাবাবে, ততদিন তাঁদের উত্তরণ ঘটবে না সেই পর্যায়ে, যেখানে তাঁরা পেশাদারী লেখক হিসেবে নিজের জোরে স্বীকৃতি পাবেন।

সামাজিক অবক্ষয় আজ নিদারুণ। টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন, ঝকঝকে পত্র-পত্রিকা, এর মাধ্যমে নিরন্তর প্রচার চলেছে নারীর শেষ সার্থকতা পুরুষের মনোরঞ্জনে। সাবানের ফেনায় নগ্ন হও। যৌনতা প্রচারে ব্যবহৃত হও। ভালবেসে বিয়ে করো অথচ বাপের গলায় মোচড় দিয়ে দামী যৌতুক নাও,—মেয়েদের মধ্যে এ সব কি দেখি না?

সমাজ ব্যবস্থা তাই চাইছে।

পত্রিকায়, কাগজে ডাক্তারের পাতায়, মেয়েরা শুধু রোগের মুক্তি চান না, কেমন করে সুন্দরী হবেন সে কথা জানতে বড়ই উৎসুক।

কেমন ব্যক্তিত্ব অর্জনের সাধনা করলে তাঁরা সম্মান পাবেন তাও ভাবতে হবে।

যে সব মেয়েরা লেখেন, তাঁদের বুঝতে হবে যে সবাই আশাপূর্ণা বা জ্যোতির্ময়ী নন। পরিবারের বৃত্তেই মেয়েদের যে ভাবে শোষণ করা হয় তা সত্ত্বেও যে মেয়েরা বিদ্রোহী হতে পারেন (ঝাণ্ডা তুলে বা হাতিয়ার ধরে নয়) তা দেখার মন, দেখাবার কলম সকলের থাকে না। আমার তো নেই।

কিন্তু তাঁরা নিজেদের বৃত্ত বাড়ান, জীবনের গভীরে প্রবেশ করুন।

আজকের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের দাবিয়ে রাখার ব্যাপারটা ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। সামান্য বিদেশ দেখার অভিজ্ঞতায় জেনেছি সেখানেও মেয়েদের অবস্থান পুরুষের নিচে। সেখানেও ব্যাপক প্রচার, মেয়েরা ভোগ্য পণ্য মাত্র। কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাবার ব্যাপারেও অনেক সময়েই তাঁরা অবিচারের শিকার।

ভারতে সমাজ ব্যাবস্থার নগ্নরূপ অনেক প্রকট।

এখানে লেখালেখির ক্ষেত্রে মেয়েরা যদি আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পান তাহলে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ রূঢ় কথা, তাঁদেরকে যোগ্যতা বাড়াতে হবে। ঋদ্ধ হতে হবে। আর শেষ কথা,—দম রেখে সংগ্রাম করতে হবে।

আমি যে বললাম, ব্যক্তি-পরিবার-কর্মজীবনে "মহিলা" বলে বিশেষ বাধা পাইনি,—তার পিছনে এটাও আছে যে বাধা বিপত্তি জীবনে থাকে এটা জানতাম। সংগ্রাম থামানো যায় না, এটা শিখেছিলাম। রান্না করে, সংসার দেখে, দারিদ্রের মধ্যেই "ঝাঁসীর রানী" লেখায় গবেষণা শুরু করি।

বহু বিপর্যয় জীবনে এসেছে। কলম ধরেই উঠে দাঁড়িয়েছি। বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা, সমাজ কি বলবে কোনো কিছু ভেবেই বসে পড়ি নি।

এবং নেতিবাচক বাস্তবতাগুলি সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখিনি।

এখনো কি প্রবল প্রতিকূলতার অদৃশ্য অথচ অদৃশ্য নয়, এমন বাতাবরণ আমাকে ঘিরে থাকে না ?

আমার সম্পর্কে কি নানা মুনির নানা মত নেই ?

কৌশলী আক্রমণ কি চলে না ?

অতীতে চলত না, আজ খুব চলে।

সে অন্য পর্যায়ে।

বুঝি, জানি, শুনতে পাই।

কিন্তু তাতে নিরস্ত হব, সে মন আমি অনেক দাম দিয়ে জয় করেছি। লেখনেচ্ছু মেয়েদেরও বলব, এ সমাজব্যবস্থা আপনাদের পথ সুগম করে দেবে না। চাইবে আপনারা ষোলো গুটি বাঘবন্দী হয়ে থাকুন।

প্রবল সাহসে লিখতে থাকুন। আত্মজিজ্ঞাসা করুন পদে পদে, আমি মেয়ে বলেই স্বীকৃতি পাচ্ছি না ;— না আমার লেখায় ব্যাপ্তি. গাম্ভীর্য, অন্তর্দৃষ্টি, লেখার ক্ষমতা, এ সবেও ঘাটতি থাকছে ?

আমি মেয়ে সেজন্যেই···এ রকম ভাবনার মধ্যে আত্মবিশ্বাসেরও অভাব আছে। আর সমাজ ব্যবস্থাও চায় মেয়েরা আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিরাপত্তাবোধের অভাবে সমাজের দুর্বলতরো অংশ হয়ে থাকুক।

আপনার কলমই তার উত্তর দিতে সক্ষম। তবে আপনাকেও চোখের জানলা, মনের জানলা খুলে দেখতে হবে। শিখতে হবে। ঋজু হতে হবে। লেখায় আনতে হবে ব্যাপ্তি, গভীরতা, সন্ধান, জিজ্ঞাসা।

সংগ্রাম তো কখনো ফুরায় না।

এর বেশি আমি বলতে পারলাম না। যেদিন আত্মজীবনী লিখব, সেদিন সব কথা বলে যেতে চেষ্টা করব।

ওই চেষ্টাই করা যায়। মা ফলেষু,—।

কাজ করতে

ডঃ মুকুলিকা কোনার (ডাক্তার)

গৌরিয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা হাটখোলার সনাতন দত্ত পরিবারে জন্মেও ছেলেটা স্বপ্ন দেখলো ইঞ্জিনিয়ার হবার। শুধু পড়াশোনা, খেলাধূলো আর খাওয়াদাওয়া নিয়ে একঘেয়ে জীবনে মন ওঠেনা। দস্যি ছেলেটা ষোলো সতেরো বছর বয়সেই পালালো তাই বাড়ি ছেড়ে। পৌঁছলো তখনকার দিনে প্রায় বিদেশ, বম্বেতে। সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পাড়ি দিল আরো অচেনা, অজানা, একেবারে সেই চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুরের রাজদরবারে। এ হেন দামাল দস্যি একটা ছেলেকে রাজা যে সহজেই পছন্দ করে ফেলবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? বহাল হলো সে রাজার স্টেটে জল আর বিদ্যুৎ দপ্তরে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। সঙ্গে চললেন এবার তার মা।

আর এক বাঙালি ভদ্রলোক তখন সুপ্রতিষ্ঠিত মণিপুর রাজদরবারে মস্ত চাকরিতে। প্রৌঢ় মানুষটি যৌবনে ছিলেন নতুন আসা ইঞ্জিনিয়ারটির মতনই দুঃসাহসী, দুর্নিবার। নিজের যুগ থেকে চিন্তায়-ভাবনায়, কাজেকর্মে চলতেন অনেকখানি এগিয়ে। শহরে নতুন বাঙালি এসেছেন শুনে আদর করে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। ছেলের সঙ্গে মাকেও নিয়ে এলেন সমাদর করে।

বাড়ির উঠোনে পাড়ার একদল সঙ্গী সাথীর সঙ্গে বল খেলছিল বারো/তেরো বছর বয়সের ফ্রক পরা একটি মেয়ে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল এদিক ওদিক উড়ছে বাতাসে আর এলোমেলো দৌড়-দৌড়িতে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়া দুচোখ কপালে তুলে।

মেয়েটিকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছেনা? এত দূর বিদেশে এই বেশেবাসে এতবড় একটা বাড়ন্ত মেয়ে নেচে-খেলে বেড়াচ্ছে এমন সহজ সচ্ছন্দে! এ আবার কেমন তরো ব্যাপার স্যাপার গো?

মেয়েটি গৃহস্বামীর, যার আতিথেয়তা নিতে এসেছেন তাঁরা আজ অতদূর থেকে। ভদ্রলোকের ছয় মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে পাঁচজনেরই। বিয়ের জন্যে অবশ্য প্রথা আর আচার মেনে যেতে হয়েছে কলকাতায়। কুলশীল দেখে মেলাতে হয়েছে পাত্র। এতদূরে চাকরি করতে করতে বড় কম নয়তো সেসব ঝঞ্ঝাট। শেষ মেয়েটি একে সবচেয়ে ছোট তার ওপর কালোকোলোও বেশ, তাই বারো তেরো বছর পার হয়ে গেলেও আছে অনূঢ়া।

যতই যাহোক, তাই বলে গেরস্থ ঘরে আইবুড়ো করে রাখা এতবড় মেয়েকে! গলায় এই কাঁটা নিয়ে আছ কি করে গো তোমরা এমন নিশ্চিন্তে ?

ভাবি তো রাতদিন তাই, কিন্তু ভালো ঘর বর পাওয়াটা কি আর চাট্টিখানি কথা ? বিশেষ কুলিন ঘরে। তার ওপর মেয়ে যেখানে আবার কালো।

তা বটে, তা কি আর করবে, পালটি ঘর যখন আছে তখন দাও নাহয় আমার ঘরেই। এক কুলিন কায়স্থের জাতধর্মের চিন্তায় উদার হলেন প্রৌঢ়া মুহূর্তে। কালোকোলো হলেও মুখশ্রী তো বেশ ভালই।

বেশ বেশ, খুব ভালো কথা। খুশি হলেও মনে মনে হাসলেন পরিজনেরা। কালোকোলো মেয়ে সত্ত্বেও তাকে বৌ করে ঘরে তোলার এত আগ্রহ কেন সে কথাটা কি আর বোঝেনা কেউ ? মেয়ে কালো কিন্তু মেয়ের বাবার টাকার চেকনাই-এ যে চোখ ধাঁধায় পথের মানুষেরো। এমন মেয়ে ঘরে এলে সঙ্গে আনবেও যে জিনিসপত্র একরাশ।

তা বিয়েতো হবে, কিন্তু আগে পরেও তো জানতে হবে পরিচয়টা ঠিকমতন। জাতে পাল্টি ঘর হলেও বিত্তে, বংশগৌরবেও তো হতে হবে সমান সমান।

"আমার পরিচয় আমি নিজেই। সেই পরিচয়েই যদি আপনারা মেয়ে দিতে রাজি থাকেন তো রাজি আমিও। শুধুমাত্র আমার

বাবার বংশগৌরব আমাকে মর্যাদা দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করিনা।” রাজার দরবারে মস্ত মানীগুণী মানুষটার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন তরুণ ইনজিনিয়ার।

বয়স্ক জহুরি কিন্তু চিনেছিলেন আসল রত্ন। দামও দিতে চেয়েছিলেন তার ঠিকমতন। কিন্তু বেঁকে বসলো পাগল ছেলেটা তাতেও। টাকা পয়সার লেনদেন হবে বাইরে কর্মক্ষেত্রে। জীবনে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন আছে। সে অর্থ অর্জন করতে হবে নিজের পরিশ্রমে, অর্জিত বিদ্যায়, বুদ্ধিতে। বিয়ের পণ আর যৌতুক? ঈশ্বর আর ধর্ম সাক্ষী রেখে যে আসবে জীবন সঙ্গিনী হয়ে তার প্রিয় পরিজনের কাছ থেকে? অসম্ভব।

সুতরাং নগদ, দান, জিনিসপত্রের তো প্রশ্নই নেই বিয়ে হলো মেয়ের শুধু ফুলের গয়নায় কনে সেজে। সময়টা আজ থেকে অন্তত সাত দশক আগের!

এত ঘটনার অবতারণা করলাম বাবার মানসিকতার একটা ঠিকমতন ছবি দেবার জন্যে। কিন্তু তারপর তো কেটে গেলো এতগুলো বছর তবু সেদিনের সেইসব চিন্তাধারা, সংস্কার বা সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এগোলাম কি আমরা এতটুকু? পণ প্রথার অভিশাপে মেয়ে জন্মালে ঘরে ঘরে আজো মা-বাবার চোখে নামে অন্ধকার। বাপের বাড়িতে জোটে অবজ্ঞা আর অবহেলা। শ্বশুরবাড়িতে পুড়তে হয় আগুনে। কি আশ্চর্য ধৈর্য্য আর মমতা আমাদের জীবন আর অতীতের প্রতি!

তারপর যে কথা বলছিলাম। নিজের যুগ থেকে এতখানি এগিয়ে ছিলেন বলেই আমার পনেরো বছর বয়সে ঠাকমা যখন অস্থির হলেন বিয়ের জন্যে তখন নির্দ্বিধায় বাবা বললেন যে ম্যাট্রিক পাশ না করলে প্রশ্নই ওঠেনা বিয়ের। মাকে বারো বছর বয়সে কুমারী দেখে গলার কাঁটা বলে মনে হয়েছিল ঠাকমার আর আমি হয়ে উঠেছি পনেরো বছরের ধিঙ্গি। ঠাকুমার গলা ছেড়ে সেই কাঁটা তাই চোখে ফুটছে

তখন রাতদিন খচখচ করে। কিন্তু কি আর করা। অটল বাবা নিজের সঙ্কল্পে।

ম্যাট্রিকে পেলাম স্কলারশিপ। সাহস বাড়লো আমার তাতে আরো, আর সেই সাহসে মুখর হয়ে জানালাম আরো পড়ব মেয়েদের জন্যে বিজ্ঞান পড়বার ব্যবস্থা নেই তখন মণিপুরে কোথাও। পড়তে হলে তাই যেতে হবে কলকাতাতেই। থাকতে হবে হস্টেলে। এই বয়সে বিয়ে-থা না করে আরো পড়া! তারজন্যে আবার থাকতে হবে অতদূরে অচেনা অজানা হস্টেলে! অসম্ভব। ঠাকমা আর দিদিমা এবার জেহাদ ঘোষণা করলেন একযোগে। আপত্তি আত্মীয়-স্বজনেরও প্রবল। কিন্তু শক্ত হয়ে রইলাম আমি প্রবলতম জিদে। বাবা নিজের মত আমাকে আরো পড়ানো।

এলাম কলকাতায়। ভর্তি হলাম বেথুন কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে। কথাটা বললাম খুব সহজে কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক শতাব্দী পার হয়ে এসেও সেদিনের কথা মনে হলে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে যেন আজো। কিন্তু সব রাতের অন্ধকারের পরেই যেমন আছে আলোমাখা একটা নতুন দিনের আশ্বাস তেমনি বোধহয় সেই প্রচণ্ড বাধাই সেদিন এনে দিয়েছিল আমার মনে একটা স্থির সঙ্কল্প। সেই অল্প বয়সেই আমি জেনেছিলাম আমাকে যুদ্ধ করতে হবে একটা বিরুদ্ধ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে। প্রমাণ করতে হবে 'মেয়েরা জন্মেছে শুধু যে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের মধ্যেই আনাগোনা করে জীবন কাটাতে'—যুগযুগ ধরে জমে থাকা এই বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ভুল। আমি প্রমাণ করব মেয়েরাও মানুষ। সুযোগ আর সুবিধে পেলে বাড়ির ছেলেটার থেকে মেয়েটাও যে কোনো অংশে কম নয় এই কথাটা প্রমাণ আমাকে করতেই হবে।

পড়াশোনাতে মন দিলাম তাই একটা সাধনার মতন করে। সিদ্ধিও পেলাম। ফিজিক্স-এ রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হলাম আই. এস. সিতে। পেলাম স্পেশাল স্কলারশিপ। এবার? খুব ছোট-বেলা থেকেই ঝোঁক ছিল ইনজিনিয়ারিংএর দিকে। কিন্তু মেয়েদের

সেসব পড়বার কোনো ব্যবস্থা ছিলনা সেদিন কোনখানে। ভাবতেই পারতনা কেউ তেমন কথা। অগত্যা বাছলাম ডাক্তারি কিছু একটা করবার জন্যেই। মনের মধ্যে তখনো স্থির হয়ে আছে এক প্রতিজ্ঞা —প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করলাম। এম. বি. বি. এস. এ প্রথম পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পেলাম রমাদেবী স্বর্ণপদক এ্যানাটমি আর হাইজিনে। ভাইসরয় রৌপ্যপদক পেলাম সর্বভারতীয় মেয়েদের মধ্যে।

এতকথা বলতে গিয়ে আত্মকথন দোষে দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ভয় পাচ্ছি বারবার। কিন্তু কারণটা তো তার বলেছি আগেই। আমার সমস্ত জীবনটা ধরেই স্থির একটা তপস্যার মতন আমি মনে রেখেছি একটাই সঙ্কল্প। আমাকে ভাঙতে হবে যুগযুগ ধরে চলে আসা একটা ভ্রান্ত ধারণাকে। নিজের সার্থকতার আলোয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে শুধু কতগুলো ভিত্তিহীন নিয়ম আর শাসনের বেড়াজালে বন্দী হয়ে জীবনে সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত, হতভাগ্য নারীসমাজটাকে নিজের মর্যাদায়।

ডাক্তারি পাশ করলাম আর এতদিনের স্বপ্নের সঙ্গে সংঘাত বাঁধলো জীবন্ত বাস্তবের। এতকাল ধরে ভেবে এসেছি সার্জন হব। নিজেকে তৈরিও করেছি সেইমতন কিন্তু এ কোন যুগে আছি আমরা এখনো, হে ঈশ্বর! মেয়ে হয়ে এত কষ্ট করে পাসটাস করেছ, দেখতে শুনতে বেশ। বলতেও ভালো। কিন্তু তাই বলে শক্ত অসুখে বা অস্ত্রোপচারে সত্যিসত্যি ভরসা করা যায় নাকি একজন মেয়ের ওপর? পাগলেও করে নাকি তাই? ডাক্তার হওয়াটা কি আর তরকারিতে ফোড়ন দেবার মতন চাট্টিখানি কথা নাকি?

আজ পরিণত বয়সের বুদ্ধি নিয়ে সেদিনের সেইসব অপমান, অবহেলা আর সীমাহীন হতাশার দিনগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয় মহিলা ডাক্তারের প্রতি এই অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতেন কিন্তু তখন পুরুষ ডাক্তারেরাই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য তখনো চাইতেন মেয়েরা থাকবে পরদার

অন্তরালে। আমরা যারা সেইসব নিষেধের বেড়া ভেঙে বেরিয়েছিলাম বাইরে তাদের ওপর প্রচণ্ড বিদ্বেষে তিক্ত হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেন পদে পদে।

সার্জন হবার স্বপ্ন ভেঙে গেলো এত বিভিন্ন রকম বিরোধিতার সঙ্গে যুঝতে না পেরে। এবার তবে পথ বদলাতে হবে। সাধারণ বুদ্ধি আলো দেখায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। কিন্তু কোন পথ?

কঠিন পরদা প্রথা তখনো আছে মেয়েদের ঘিরে। সন্তান প্রসবের সময়ও বেশীর ভাগ প্রসূতি লজ্জা আর পরদা সরিয়ে যেতে পারেনা হাসপাতালে পুরুষ ডাক্তারের কাছে। বাড়িতেই আঁতুড় ওঠে অশিক্ষিত দাই-এর হাতে। এইতো তবে পথ আছে সামনে। সীমাহীন হতাশা আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠলো যেন ক্ষীণ একটা আলোর রশ্মি। ক্ষীণ হোক, তবুতো আলোর ইসারা। কিন্তু সে আলো পেতে গেলে তৈরি করতে হবে নিজেকে আর একটু 'অন্যভাবে'। সাধারণ ডাক্তার হিসেবে ভরসা না পেলেও বিচক্ষণ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ বলে তো আসবেই মেয়েরা খানিকটা সহজ আস্থা নিয়ে। ১৯৪৮ সাল সেটা। এই চিন্তা মাথায় নিয়ে গেলাম লণ্ডনে গাইনোকলজিতে স্পেশালাইজ করতে। ফিরলাম '৫০ সালে।

এবার নিশ্চয়ই ডাক আসবে অন্তত একজন ধাত্রী বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বলে। কিন্তু হায় কপাল, পিঁপড়ে সাধ করে পাখা মেললেই পাখি হতে পারে নাকি কোনদিন? মেয়ে আবার করবে অপারেশান! ছেলেখেলা নাকি মানুষের প্রাণ নিয়ে? সাধারণ প্রসব হলে তাও নাহয় চলতে পারে। হাজার হোক ডাক্তারিটাতো পাশ করেছে বটেই। দাইএ-র থেকে কিছুটা ভালো তো হবে।

তাই সই। দাই-এর কাজই নিলাম। রুগীতো আসুক হাতে। ভালো কাজ হলে প্রচার হবে নিজে থেকেই। মেয়ে ডাক্তার বলে ভয় আর অবজ্ঞার ভাবটা যাবে নিশ্চয়ই ক্রমশ।

রুগী আসতে আরম্ভ করলো। রুগী মানে প্রসূতি। কিন্তু

শহরের শিক্ষিত সম্পন্ন পরিবারের নয়। দূর গ্রামগঞ্জ থেকে গরীব চাষি, মজুর ঘরের মেয়েরা, নামকরা দামী ডাক্তারের কাছে যাবার ক্ষমতা নেই যাদের কোনদিন, তারাই এসে ভিড় করলো আমার চারপাশে। তা হোক, তবুতো এসেছে তারা আমার কাছে আশা ভরসা নিয়ে। এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম তো আমি এই সুযোগেরই। নিজের খরচে নিয়ে তুললাম তাদের নামকরা নার্সিংহোমে। চিকিৎসা, সেবা-যত্ন করলাম নিজের হাতে। এত অর্থ ব্যয় করে, শক্তি, সময় সব দিয়ে দিন গুণেছি এক আশায় ;—সাধারণ মানুষের মনে মেয়ে ডাক্তার বলে এই যে অবিশ্বাস আর অবজ্ঞা এটা ভাঙতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা মনে নিয়ে পরিশ্রম করেছি অনলস। তার ফলও ফলেছে। দুঃসাধ্য অস্ত্রপচার করে যে সব রোগিণীকে ফিরিয়ে এনেছি মৃত্যুর হাত থেকে, গরীব হলেও তাঁরাই হয়েছেন আমার সবচেয়ে বড় প্রচার মাধ্যম। মেয়ে ডাক্তারের কাজে নিজেরা বিশ্বাসী হয়ে ভরসা এনে দিয়েছেন সব স্তরের মানুষের মধ্যে এক একটি সচল বিজ্ঞাপন হয়ে। সফল হয়েছে আমার এতদিনের সব স্বপ্ন আর সাধনা।

এই তো গেল ডাক্তারি পাশ করবায় পরের ঘটনা। কলেজে পড়তে পড়তেও নানারকম বাধার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে বারবার। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মহিলা ডাক্তার বা ছাত্রীদের ডিউটি দেওয়া হত না রাতে। কেন হবে না? কিসের অসুবিধে? মেয়ে মেয়ে বলে এইভাবে আড়াল সৃষ্টি করা কার কাছ থেকে কাকে রক্ষা করতে? মেয়ে বলে আমরা কি এতই ঠুনকো? দাবী তুললাম আমরা শক্ত হয়ে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তখন কর্ণেল ভয়েভ। তিনি বললেন, 'সত্যিই তো, মেয়েরা যখন নিজের দায়িত্বে এগিয়েছে আজ এতদূর তখনও এইসব পুরনো বস্তাপচা নিয়ম-কানুনের অর্থই হয় না আর কোনো!

জিতলাম আর এগোলাম বুঝি আমরা প্রথম কদম। দ্বিতীয় কদম জয় ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ্‌ সার্ভিসে মেয়েদের প্রবেশাধিকার—, বন্ধ ছিল যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। অখণ্ড বাংলায় তখন মুসলিম লীগ

সরকার। তাঁরাও মেনে নিলেন আমাদের এই ন্যায্য অধিকারের দাবী। চাকরি পেলেন কয়েকজন মহিলা ডাক্তার।

যাইহোক পাশ করে বেরোলাম '৪৪ সালে। এর মধ্যে জীবনে এসেছে প্রেম। ডঃ সত্যরঞ্জন কোনার ছিলেন সতীর্থ। দুজনের মধ্যে পড়াশোনা নিয়ে প্রতিযোগিতা গোটা ছাত্রজীবনটা ধরেই ছিল তুঙ্গে। সেই প্রতিযোগিতাই হয়তো কাছে আনতে পেরেছিল পরস্পরকে। পাশ করার পর যুদ্ধ শেষে যখন সাব্যস্ত হলো সন্ধির দুজনে মিলে সংসার করার সর্তে, তখন আবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ডঃ কোনারের বাবা। জাতপাতের বর্ণ বিচারের একটা ব্যাপার তো ছিলই, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে আপত্তি একজন ডাক্তারনিকে ঘরের বৌ করে তোলায়। রাত নেই, দিন নেই, নেচে বেড়াবে ডাক্তার-বৌ শুধু বাইরে বাইরে রুগী আর হাসপাতাল করে, সংসার করবে তবে আর কখোন গুছিয়ে? গেরস্থ ঘরে চলে নাকি এমন বৌ? অসবর্ণ বলে আপত্তি মায়েরও। কিন্তু সকলের একযোগ আপত্তিতে যদি আবার ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে কোনদিকে চলে যায় চিরকেলে অবুঝ আর বিদ্রোহী মেয়েটা! শঙ্কিত হয়ে উঠল মায়ের প্রাণ। কিন্তু যতই যা হোক সামাজিক ভাবে তো আর সম্প্রদান করা যায় না কুলিন কায়স্থ ঘরের একটা মেয়েকে নিচু (!) জাতের একটা ছেলের হাতে। বিদ্যাবুদ্ধিতে হোক না সে যতই বড় আর উজ্জ্বল রত্ন। তাই বিয়ে হল কাগজে কলমে সই করে। বাবা লোকান্তরিত হয়েছেন কয়েক বছর আগেই।

পাতলাম নতুন সংসার। এলো সন্তান আর এতদিনে আমার মধ্যেকার ডাক্তারটির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আর একটি সত্তা। এতকাল ঘুমিয়ে থাকা একটি নারী জেগে উঠল স্ত্রী আর মায়ের মধ্যে। এই যুদ্ধে চিরকালই বোধহয় জয়ের মুকুট পরেছে চিরন্তন নারী সত্তা যে মগ্ন নিজের সংসার আর সন্তান নিয়ে আর নিঃশব্দে, নিরুপায়ে তার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে অন্য জীবন তার সবকিছু দাবী ছেড়ে দিয়ে।

আমার এতদিনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকার একটা বিশেষ স্কলারশিপ দিয়ে পাঠাতে চাইলেন বিদেশে। কিন্তু সবে পাতা সংসার আর এতটুকুন কচি বাচ্চা ফেলে স্বর্গে যেতেও রাজী নই তখন আমি আর। আমি ভেবেছি, যে নারী মা হয়েছে, তার দায়িত্ব নিজের সংসারে সন্তানের প্রতি সবচেয়ে আগে। মায়ের কোনো বিকল্প নেই। পরিপূরক নেই। একটি সন্তানকে ঠিকমতন মানুষ করে তুলতে মায়ের সাহায্যের প্রয়োজন সব থেকে বেশী। একজন মা আর ডাক্তার হয়ে এই কথাটা আমি সেদিন যেমন জেনেছি নিজের জীবনে, আজও বলি তাই তেমনি বিশ্বাসে।

নষ্ট হলো এই চিন্তাতে সেই স্কলারশিপ তখনকার মতন। তিন বছর পর '৫৩ সালে বাচ্চাটা আরো একটু বড় হলে গেলাম আবার লণ্ডনে ডাক্তার কোনারের তাগিদেই। '৫৫ সালে ফিরে এসে যোগ দিলাম মেডিকেল কলেজে রেসিডেণ্ট সার্জন হয়ে। সেই ব্যস্ত কর্ম-জীবনেও আমার সন্তান আর সংসার, সংঘাত আনেনি কিন্তু কোনখানে এতটুকু, কারণ সহমর্মিতার হার্দ একটা বোঝাপড়ায় চিরদিন চলেছে আমাদের সংসার একসঙ্গে, দ্বৈত দায়িত্বে। মেয়েদের সব দায়িত্বের শেষ শুধু অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে একথাটা ডঃ কোনার বিশ্বাস করেননি কোনদিন।

এরপর এলো আর একটু পরিবর্তনের পালা। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পি. জি হাসপাতালে স্ত্রী-রোগ বা মেটারনিটি বিভাগ ছিল না। মুখ্য-মন্ত্রী তখন ডঃ বিধান রায় পশ্চিমবঙ্গের। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে অসুবিধেটা বুঝলেন তিনি ভাল করে আর তাই '৫৬ সালে খুললেন মেটারনিটি বিভাগ। ডঃ চুনিলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম তখন গাইনোকোলজিস্ট বলে খ্যাতির তুঙ্গে। তিনি স্বভাবতই হলেন বিভাগের প্রধান। আর আমি একজন সামান্য মেয়ে (?) ডাক্তার হলাম কিনা দ্বিতীয় প্রধান! দিন তাহলে বদলাতে শুরু করেছে সত্যিকরে?

হ্যাঁ, দিন বদলেছে। বদলেছে বলেই অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৬৫ সালে ইডেন মেডিকেল কলেজে ডাক পেলাম অধ্যাপনার। ভারতীয়

মেডিকেল কলেজের দেড়শ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলা অধ্যাপক !

ঘনঘটায় কালো মেঘে ছাওয়া আকাশটার ভয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকলে মেঘভাঙা আলোটুকু আর ঢুকবে কোন পথ দিয়ে ? আলো পেতে হলে তুলতে হবে মুখ আকাশের অসীম উদারতায়। শক্ত, বিশ্বাসী পায়ে নামতে হবে উন্মুক্ত পথের অনিশ্চয়তায়।

তারপর কেটে গেছে কতদিন, কত বছর। আজ এতগুলো বছর পর ফেলে আসা জীবনটার দিকে পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে গোটা জীবনটাকে মনে হয় শুধু একটা 'হার্ডল রেস' খেলা, যাতে সময় আর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে শুধু টপকেছি বাধার পাহাড়। লক্ষ্যে কি পৌঁছতে পেরেছি তবুও ? না। পারিনি। আজো এত বছর ধরে এত মেয়ে অনেক কৃতিত্ব আর সাফল্যের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করা সত্ত্বেও শক্ত, সঙ্কটজনক কোনো অসুখে, খুব দুরূহ আর বড় অপারেশনে ডাকেনা বড় কেউ একটা মেয়ে ডাক্তারকে ! চোখের জন্যে, বাচ্চাদের জন্যে বা সাদামাটা প্রসব করানোতে ঠিক আছে। কিন্তু······, মস্ত এই কিন্তুর বাধা সরেনি আজো এতটুকু। এত বছর পরেও। আজো ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের মতন অসাধারণ প্লাষ্টিক সার্জন স্বীকৃতি পান না নিজের দেশে।

কথাগুলো ভেবে মন খারাপ হলেই মৃতসঞ্জীবনীর মতন মনের তারে বারবার ঝঙ্কার তোলে কবির গানের পঙক্তিগুলো—"তা বলে ভাবনা করা চলবে না।" জীবনের পথে চলতে চলতে হয়তো বার-বারই ছিঁড়ে পড়বে সব 'আশালতা' তবু ভাবনা করা চলবে না। জীবন মানেই এগিয়ে চলা আর সেই চলার পথে বারবার যদি ঘনঘটায় 'নেমে'ই আসে 'আঁধার' 'অমনি কি তুই পড়বি থেমে ?' না। তুই 'বারেবারে ঠেলবি দুয়ার, হয়তো দুয়ার খুলবেনা।' 'তাবলে'ও তো 'ভাবনা করা চলবে না।'

ভাবনা করা চলবেনা। থামলে চলবে না। এ বাধা ভাঙতে

যুদ্ধ করতে হবে আরো। যুগযুগ ধরে পুরুষশাসিত একটা সমাজে জন্মে আমাদের রক্তে, মজ্জায়, বিশ্বাসে বসে গেছে মেয়েদের প্রতি এই অবজ্ঞা আর অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাস ভাঙতে হবে মেয়েদেরই। আমাদের ভাবতে হবে মুখের সামনে বাড়া ভাত খেতে সুবিধে, কিন্তু দেবে কে তা এত সহজে? এরজন্যে পরিশ্রম করতে হবে অনলস আর নিঃস্বার্থ। নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা বুঝি আমি তাই। যে মুক্তি আন্দোলন শুরু করতে চেয়েছি আমি এককভাবে, সাফল্য দেখতে চেয়েছি নিজের কাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসে স্থির হয়ে, সেই আন্দোলন সার্থকভাবে এগিয়ে চলে একটা সুস্থ বোঝাপড়ায় এসে পৌঁছবে তখনই যখন সে সম্বন্ধে সচেতন হবে প্রত্যেক মেয়ে। কিন্তু তার আগে ভাবতে হবে এই আন্দোলনের অর্থ টা কি, প্রয়োজনটাই বা কতদূর।

ইতিহাসের নথি ঘাঁটলে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, প্রায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নারী পদানত হয়ে আছে পুরুষের। কারণ তার বহু। কিন্তু আজকে বোধহয় সময় এসেছে এতদিনের চলে আসা অভ্যেস আর চিন্তার ধারাটা নতুন করে ফিরিয়ে দেখবার। নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়না। তাহলে এরমধ্যে কি নিয়ে যুদ্ধ এত? পুরুষ শারীরিক শক্তিতে নারীর থেকে সবল। কায়িক পরিশ্রমের কাজ তাই তাকে করতেই হবে। সন্তান ধারন করতে পারে একমাত্র নারী। তাই সন্তান প্রসব আর তাকে পালনের দায়িত্ব নারীর। বহু যুগ আগে কোনো একটা সুবিধের চিন্তায় নারী-পুরুষের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল কাজের এই ধারাটা। সামাজিক সব কাজের একটা সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্যে যেমন ভাগ হয়ে গিয়েছিল সমাজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি প্রধান ভাগে। যে সমাজের প্রয়োজনে একদিন হয়েছিল এই বিভাজন আজ আবার সেই সমাজেরই প্রয়োজনে ভেঙেছে সেই পুরনো ব্যবস্থা। আজ ব্রাহ্মণ থাকেন না শুধু পঠন-পাঠন, যজন-যাজন নিয়ে। ক্ষত্রীয় ব্যস্ত থাকেন না শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে।

বৈশ্য, শূদ্র নিজ নিজ ক্ষেত্রে। আজ সকলেই বৃত্তি গ্রহণ করেছেন নিজেদের প্রয়োজন, পছন্দ আর ক্ষমতা অনুসারে। ঠিক এমনি প্রয়োজনের তাগিদে বহুযুগের নির্ধারিত গণ্ডি ভেঙে মেয়েরাও আজ বেরিয়েছেন পথে। রুজি-রোজগারের জন্যে বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন বৃত্তি। এই ভাঙাভাঙিতে সংসারের মধ্যেও আগেকার আরোপিত কিছু নিয়ম ভাঙতে বা পরিবর্তন তো করতে হবেই।

আমার বিশ্বাস নারী আন্দোলনের যদি সত্যি কোনো প্রয়োজন থাকে তবে তা হলো মেয়েদের নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকার অর্জন, যার থেকে বঞ্চিত আজ নারী সমাজ গোটা পৃথিবী জুড়েই। নিজের সংসারের গণ্ডির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী কে ঘরের কাজ করলো আর কে বাইরের এটা কোনো বিশেষ একটা ঘটনাই নয় যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকে ভালবাসার সেই সুস্থ বোঝাপড়া যেখানে ছোটবড়র প্রশ্নটা লজ্জা পায় নিজের কাছেই। আমার নিজের জীবনে তো দেখি আমি তাই। আমরা ডাক্তার দুজনেই। বাইরের কাজে ব্যস্ত সারাদিন, তবু তারই মধ্যে বেশী কাজের চাপে ঘরে ফিরি যেদিন দেরীতে আর সারাদিনের ক্লান্তিতে তখন ভেঙে পড়ে যদি শরীর-মন, তবে আমার জন্যে তক্ষুনি এক কাপ গরম চা করে আনতে ডঃ-কোনারের পৌরষত্বে বাধবেনা এতটুকু। তেমনি তাঁর ব্যস্ত মুহূর্তে পায়ের জুতোটা, মোজাটা এগিয়ে দিয়েও গৌরবান্বিত থাকব আমি গৃহিণীর মর্যাদাতেই।

আসল কথাটা আমি বুঝি যে, সমানাধিকার কথাটাই আসলে হলো একটা আপেক্ষিক বোধ আর এই বোধ থাকে প্রতিটি সংসারে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে। সুস্থিত বোঝাপড়ায়। এই বোঝাপড়া তখনই শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারে যখন নারী সচেতন থাকে নিজের মর্যাদা বোধে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে নিজের শক্তিতে। বাইরে থেকে কোনো আন্দোলনই মুক্তি আনতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত তা কার্যকর না হচ্ছে নিজের ঘরের মধ্যে।

জীবন দিয়ে

মমতা গুপ্ত (সমাজ সেবী)

তখন আমি খুব ছোট। বোধহয় আট কি ন'বছর বয়স হবে। স্কুলে যাচ্ছি আরো কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে হঠাৎ চোখে পড়লো পথের পাশে এতটুকুন ছোট্ট একটা বেড়ালছানাকে চারদিক থেকে ঠোকরাচ্ছে চার পাঁচটা কাক। কেমন করে কোথায় যেন পড়ে গিয়েছিলো, সারা গায়ে তাই জল আর কাদা মাখামাখি। কনকনে শীতের সকাল। জলমাখা শরীরের ওপর কাকের ঠোকরের ভয়ে কাঁপছে বাচ্চাটা থরথর করে। সঙ্গে অসহায় সরু গলায় মিউ মিউ করে আর্ত কান্না। থেমে পড়েছিলাম চলতে চলতে। এখন ভালো করে দেখে জল এসে গেলো দুচোখ ভরে। বুকের ভেতরটাও মুচড়ে উঠলো ভয়ানক একটা কষ্টে আর মায়ায়। স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছিলো। যাবার জন্যে তাড়া দিলো বন্ধুরা। কিন্তু আমার তো তখন আর পা উঠছেনা অন্য দিকে। কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছি আগেই এখন হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে তুলে নিলাম বাচ্চাটাকে দুহাতের মধ্যে। ওর গায়ের কাদা লেগে নোংরা হয়ে গেলো স্কুলের জামা-কাপড়। মায়ের কাছে হয়তো বকুনি আছে কপালে, সে ভয় আছে মনে ষোলো আনা। এদিকে বন্ধুরাও আমার জন্যে আর অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেছে অনেকখানি, বেশ রাগ করেই। এই সময় কাদা-মাখা একটা বেড়ালছানা হাতে বাড়ি ফিরে গেলে কানদুটো বোধহয় থেকে যাবে মায়ের হাতেই। স্কুলে ঢুকলে দিদিমণিদের হাতেও শাস্তি-ভোগ। সে যে কি এক ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। সেই বেড়ালছানা নিয়ে দুর্ভোগ গড়িয়েছিলো সেদিন আর তারপরেও অনেকদিন পর্যন্ত। তারপর কি হয়েছিলো সেকথা আজ এত বছর পরে আর মনে নেই ঠিক করে, তবে দুঃখী আতুরদের জন্যে প্রাণ কাঁদা বোধহয় শুরু হয়েছিলো সেদিন থেকেই। উত্তর জীবনে পেশাগত ভাবেও সমাজ-

সেবায় এসে পড়লাম বোধহয় সেই কারণেই। নাহলে এমন একটা পরিবারে জন্মে যেখানে অগ্নিযুগে সবাই প্রায় ঝাঁপ দিয়েছেন বিপ্লবে তখন সে পথে না গিয়ে এদিকে এসে পড়লাম কেমন করে ?

জন্ম সিলেটে। বাবা শিক্ষকতা করতেন ঢাকায় তাই পড়াশোনা সেখানেই। স্ত্রী-শিক্ষা পরিবারের মধ্যে চল হয়ে গেছে বেশ কিছু আগে থেকেই। আমার মায়ের পিসিমা সেই ভয়ানক পর্দা আর রক্ষণশীলতার দিনেও পড়াশোনা করেছিলেন বিদেশিনী গভর্নেসের কাছে। সেইজন্যে কলেজ ছেড়ে মেয়েদের ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে দিতে মোটেই আপত্তি ছিলনা আমাদের পরিবারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মেয়েকে এতখানি উদারভাবে ছেড়ে দিতে আপত্তি ছিলনা যাদের মেম-গভর্নেসের কাছে সেই এক অন্ধ রক্ষণশীল যুগে, তারাই এতগুলো বছর পার হয়ে এসেও পড়াশোনা ছাড়া মেয়েদের অগ্রগতির আর কোনদিকে চোখ মেলে দেখতে চাইলেন না কিছুতেই। স্কুল কলেজে যাবার ছাড়পত্র পেলেও বাইরের জগতের, বিশেষ ছেলে সহপাঠীদের সঙ্গে কোনরকম ভাবে যোগাযোগ রাখা বা মেলামেশা করা বাবা একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমার মেসোমশায় এদিক থেকে অনেক বেশী উদারপন্থী ছিলেন। রাজনীতি ছিলো সকলের রক্তে-মজ্জায় জড়ানো। স্ত্রী-শিক্ষার চল ছিলো সেখানে অনেক বেশী। স্ত্রী-স্বাধীনতাও। মেসোমশায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছেতেই বাবা আমাকে শেষ পর্যন্ত কলেজের কিছু কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিয়েছিলেন। বি. এ পড়বার সময় কলেজের পত্রিকা সম্পাদনা করবার দায়িত্বও নিতে পেরেছিলাম মেসোমশায়ের ভরসাতেই। প্রায় জ্ঞান হবার সময় থেকে এইসব নানারকম নিষেধের ভ্রূকুটির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলাম ভয়ানক একটা ভীতু আর লাজুক স্বভাব নিয়ে। রাতদিন ভয়ে ভয়ে থাকার ফলে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বা শিখিইনি বললে বোধহয় ঠিক হবে।

বি. এ পাশ করবার পর বাড়ির সকলে ভেবেছিলেন যে আর্টস নিয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশান করব। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এতগুলো

বছর ধরে অনির্বাণ হয়ে জেগে আছে সেই পুরনো ইচ্ছেটা। জীবনে যদি কিছু করতেই হয় তাহলে সেবা করব আর্ত আতুর মানুষজনের। কিন্তু রাস্তা থেকে একটা বেড়ালছানা কুড়িয়ে এনে বা দু-একজন কাঙাল-ভিখিরিকে সাহায্য করলেই তো আর সেকাজ সম্পূর্ণ হবেনা। বয়স আর বুদ্ধি দুই কিছুটা বাড়ার সঙ্গে তখন বুঝেছি, এ কাজ করতে হলে রীতিমতন পরিশ্রম করতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে। আর্টস না করে কোর্স করলাম তাই সমাজবিজ্ঞান নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের সহযোগিতায়। বিভাগে প্রথম আর একমাত্র মেয়ে হবার ফলে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগেই কাজ পেয়ে গেলাম। 'সিয়াটো'তে 'সোসিওলজিস্ট'-হয়ে। সেখানে ৮/৯ মাস কাজ করবার পর ঢাকাতে নতুন করে শুরু হয়ে গেলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর টেঁকা গেলনা। আমরা সবাই চলে এলাম কলকাতায়, ঢাকার এতদিনকার পাট, মায়া সব কাটিয়ে।

কলকাতায় এসে দেখলাম কাজের ক্ষেত্র প্রশস্ত অনেক বেশী। এতদিনের অনেক ইচ্ছে আর কল্পনা কাজে লাগাতে পারব মনে করে ভারি খুশি হয়ে উঠলো মন। যোগ দিলাম ওয়াই. ডবলিউ. সি. এর গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় খড়িবারি ক্ষেত্রে। গ্রাম ভিত্তিক কাজ। কয়েক ঘর গরিব চাষি-মজুর আর তাদের জমিজমা, চাষবাস নিয়ে টানা গণ্ডি। আছে পঞ্চায়েত। এতদিন কাজ করেছি বাড়িতে থেকে। এখন একেবারে ভিন্ন পরিবেশে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে যেন দেখলাম পৃথিবীটাকে একেবারে নতুন চোখে। মাটির দেওয়ালের ওপর টালির ছাদ বা দরমার ওপরে খড়ের ছাউনি ঘেরা আমাদের ঘরের ব্যবস্থা। তারমধ্যেই থাকা, স্কুল, তাঁতঘর সব চালানো। এতেও কোনো দুঃখ ছিলনা। মনে জানতাম কাজ করতে এসেছি তো জীবনের সবকিছু থেকে বঞ্চিত এইসব অসহায়, দুঃখী মানুষগুলোর জন্যে। কাজ আরম্ভ করলাম আর তক্ষুনি দেখলাম আর বুঝলাম যে পথটা কতখানি দুর্গম। সমাজের একটা বিরাট অংশকে মুষ্টিমেয় একটা দল নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে কি অন্যায় ভাবে শোষণ করে চলেছে তাদের অশিক্ষা

আর নানারকম সংস্কারের পচা জলে ডুবিয়ে রেখে। আর তার থেকেও মর্মন্তুদ অবস্থা মেয়েদের। ওদের ঘরে যেসব পালিত পশু আছে তাদের থেকেও অসহায়, অসহ। একটা মানুষ সংসারের জন্যে প্রাণপাত করবে সারাদিন, যেখানে যার যতটুকু প্রয়োজন সেবায় যত্নে ভরিয়ে দেবে সব অথচ তারই সংসারে বক্তব্য নেই এতটুকু। ইচ্ছের এতটুকু প্রকাশও থাকবেনা কোনখানে। ওরা যে সত্যি সত্যি এক একটা মানুষ, দৈনন্দিন জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও নিজস্ব একটা অস্তিত্বও ওদের আছে সেকথাটা জানেনা বোধহয় ওরা নিজেই। হঠাৎ মনে হলো চেষ্টা করলে চিরটাকাল ধরে বন্ধ হয়ে থাকা চোখগুলোকে কি খোলা যায়না সত্যি? সেই খোলা চোখ নিয়ে সত্যের আলোয় নিজেকে দেখতে পেয়ে, নিজের অধিকারে, ভাষাও নিশ্চয়ই ফুটবে ঐসব নির্বোধ বোবা মুখগুলোতে। কিন্তু কি করে করা যায় তা ঠিকমতন? ব্যাপারটা ভাবা যত সহজ করাটা তো মোটেই তা নয়। ভাবতে ভাবতে গেলো মনের শান্তি, রাতের ঘুম। শেষে একদিন বেরোলাম পথে। কাছাকাছি বেশ কয়েকটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে কথা বললাম ওদের সঙ্গে দিনের পর দিন। বোঝালাম মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন নিজেকে মানুষ বলে জানবার জন্যেই। তার ওপর যেটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তা হলো মেয়েদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা। 'একটা সংসারকে নিজের ভেবে সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করে দুবেলা জুটবে দুমুঠো অবজ্ঞার অন্ন, এই ভয়ানক অপমান থেকে রেহাই দাও তোমরা নিজেদের। যে কোনো ভাবেই চেষ্টা করো স্বনির্ভর হ'তে। এইটুকু সার্থকতা তোমাদেরকে এনে দেবে অনেক গৌরব। নিজেদের সম্মানে দাঁড়াবে তোমরা নিজেদের অধিকারের মাটিতে শক্ত পায়ে।' সাড়া পেলাম অভূতপূর্ব। দলে দলে মেয়েরা সব নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে এসে পড়লো আমাদের কেন্দ্রে। এক প্রাণ উৎসাহ নিয়ে শুরু করলো পড়াশোনা। দিনরাত চলতে লাগলো তাঁতবোনা আর নানাধরনের হাতের কাজ। সমবায় সংগঠন করে সেইসব জিনিস বিক্রি করে ওরা পেতে লাগলো ওদের পরিশ্রমের অর্থ মূল্য ঠিকমতন

ভাগে। হাসি ফুটলো ওদের মুখে। চোখেমুখে উপছে উঠলো উৎসাহ। আর তাই দেখে তির্যক হয়ে উঠলো সমাজের কর্তাদের চোখ। মেয়েমানুষদের আবার এসব কি ব্যাপার! তাদের জন্মই তো শুধু বংশ রক্ষার জন্যে। শাস্ত্রে বলেছে না যে, পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা? তবে? মেয়েমানুষ সংসারে কাজকর্ম করবে, সন্তান জন্ম দেবে, স্বামী-সন্তানের যত্ন-আত্তি করবে তা নয় কি ধিঙ্গিপনা এসব?

ক্লাস নিচ্ছি একদিন যথারীতি দুপুরবেলা হঠাৎ দুদ্দাড় করে এসে হাজির এক দঙ্গল ছেলে। রক্তচক্ষু, রুদ্রমূর্ত্তি। 'এসব কি আরম্ভ করেছেন আপনি এখানে?'

ছোটবেলা থেকেই কি জানি কেমন করে, কোনো ব্যাপারেই ভয় কাকে বলে জানতাম না কোনদিন। এখনো ওদের ঐ ভীষণ মূর্তি বিচলিত করতে পারলনা এতটুকু। 'স্কুল হচ্ছে, দেখতেই তো পাচ্ছেন,' বললাম শান্ত গলাতে।

'তাতো দেখছি, কিন্তু তাতে লাভটা কি হচ্ছে শুনি? এনারা লেখাপড়া শিখে কি জজ-ব্যারিস্টার হবেন সব?'

না, জজ-ব্যারিস্টার হবেন কেন, তবে লেখাপড়া করাটা মানুষের জন্মগত অধিকার।

'আরে রাখুনতো মশাই ওসব অধিকার-টধিকার। ওসব থিয়েটার চলবেনা এখানে তাই বলে দিলাম।'

'তোমরা তাহলে কি করবে?'

ভয়ে সাদা হয়ে ওঠা মুখে নিঃশব্দে চেয়েছিলো ওরা এতক্ষন গরুর মতন ভাষাহীন চোখ মেলে। আমার প্রশ্নের সঙ্গে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো অনেকেই বুকের মধ্যে থেকে ডুকরে ওঠা কান্নাটা চেপে ধরতে। পরদিন ক্লাসে এলোনা বেশীরভাগই। বাড়িতে না কি প্রচণ্ড মারধোর করেছে ওদের স্বামীরা। এত বাড়াবাড়ি ভালো নয় মেয়েদের।

শূন্য চোখে বসে থাকবার পালা এবার আমার। কোথায় কোন আদিম যুগে বসে রয়েছি আমরা আজো! পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ শুধু মেয়ে হয়ে জন্মে ফেলার অপরাধে হারাবে তার একটা

মানুষি সত্ত্বা। অধিকার থাকবেনা তার নিজের ভালো মন্দ ইষ্ট-অনিষ্ট সম্বন্ধে ভাববার ক্ষমতাটুকুতেও! আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ভগিনী নিবেদিতা এদেশে এসে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মেয়েদের এই দুরবস্থা দেখে। খাঁচায় বন্ধ কতগুলো জন্তুর মতন বন্ধ রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের মধ্যে। সেই ব্যথা বুকে নিয়ে মমতাময়ী ঘুরেছিলেন সেদিন ঘরে ঘরে। ভিক্ষে করেছিলেন মেয়েদের জন্যে একটু আলো, পরিপূর্ণ প্রাণের একটু কণার জন্যে। মুখ ফিরিয়েছিলেন গৃহস্থ সেদিন সভয়ে। লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হয়। ধারনা মনে বদ্ধমূল ছিলো মানুষের। সেই সংস্কার ঝেড়ে ফেলে লেখাপড়া করার নামে মেয়েকে এমন বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা কি সহজ কথা? কিন্তু তবু তা সম্ভব করেছিলেন সেই অসাধারণ মহিলা। দিনের পর দিন ভিখিরির মতন ধরনা দিয়েছিলেন ঘরে ঘরে, লজ্জা ঘেন্না, মান-সম্মান সব বিসর্জন দিয়ে। ফল ফলেছিলো সেদিন সেই আকুল আন্তরিকতার। অধ্যাবসায়ের। চার দেওয়ালের সেই দুর্ভেদ্য পাঁচিল ভেঙ্গে একটি দুটি করে মেয়ে এসে বসেছিলেন পড়ুয়ার আসনে। তারপর কেটে গেছে প্রায় একটা শতাব্দী। কিন্তু সেই দিনগুলো থেকে আজ আমরা এগোতে পেরেছি আর কতটুকু? কলকাতা আর তার আশেপাশের বর্দ্ধিষ্ণু কয়েকটা শহর-গঞ্জ ছাড়া সত্যিকার লেখাপড়া করবার সুযোগ পায় কি মেয়েরা আজো? মেয়ের সাত বছর বয়স না হতেই তাকে গৌরীদান করে অক্ষয় পুণ্যার্জন করেন তার বাবা-মা এই বিংশ শতাব্দীর শেষে বসেও। সতীদাহ উঠে গেছে কত যুগ আগে। কিন্তু তার ফলে মেয়েদের জীবনে কোনো মঙ্গল এনেছে কি? গাঁয়ে-গঞ্জে ঘরে ঘরে ঘুরতে গিয়ে তোলপাড় করেছে মন এইসব চিন্তায়। কারণ ঘরে ঘরেই দেখেছি যে মেয়েদের ওপর, শুধু বিধবা হবার অপরাধে সারা-জীবন ধরে চলে কি অন্যায় আর অত্যাচার। স্বামী-স্ত্রী, সম্পর্কিত দুটি মানুষ একই বন্ধনে। স্ত্রী বিয়োগ হলে অশৌচ নেই স্বামীর একটি দিনের জন্যেও। তারপর একটা মাসও কাটতে না কাটতেই চল্লিশ থেকে

চুরানব্বই বয়স পর্যন্ত যে কোনো পুরুষ বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে পারেন কাঁসর-ঘণ্টা, ঢোলক-সানাই বাজিয়ে। অথচ সেই পরিবারেই কিশোরী বধূ বা মেয়েটি বিধবা হলে নিষ্ঠুর নিস্পৃহতায় ঘসে ঘসে তোলা হবে তার সিঁথির সিঁদুর। আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গা হবে হাতে এয়োতির আনন্দ আর শোভা। পরাবে থান। শহর অঞ্চলে দু-একটি পরিবার একটু উদারপন্থা হয়ে হয়তো থাকতে দেয় সাদা সাড়ির ধারে একটু কালো বা খয়েরী পাড়ের ছোঁওয়া কিন্তু মোটামুটি সকলেরই, তা সে যে কোনো বয়সই হোক না কেন, একই নিরাভরণা রিক্ত মূর্তি। বিয়ে-পৈতে বা যে কোনো সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে প্রবেশ নিষেধ বিধবার। সে নাকি অলক্ষণা, অপয়া। কেন? মৃতদার পুরুষ যদি অলক্ষণে, অপয়া না হন তাহলে বিধবাই বা তা হবেন কোন যুক্তিতে? খাওয়া-পরা, বেশেবাসে যদি কোনো পরিবর্তন না করতে হয় স্বামীকে তাহলে তার উল্টো বিধান আরোপিত হবে কেন স্ত্রীর ওপর? কোন ব্যাখ্যায়? ব্যাখ্যা একটাই। পৃথিবী জুড়েই সমাজ চলে আসছে পুরুষের শাসনে। তাই সমাজের নিয়ম-আচার-গুলো যে পুরুষের স্বার্থে, তাদেরই সুখ-সুবিধের মুখ চেয়ে হবে এটাই স্বাভাবিক কথা। কিন্তু তার থেকেও একটা বড় কথা আছে। কথাটা হলো যে, দেশে রাজা শাসন করেন রাজ্য। তৈরী হয় নানারকম বিধি আর নিষেধের অনুশাসন। একা হাতে রাজা সবকিছু করেন না। সবদিক দেখেন না। করে তার পারিষদবর্গ। আর বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো বলে যে একটা কথা আছে যার দিকে আর একটু ব্যঙ্গ করে কবি বলেছিলেন 'রাজা যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।' সমাজের শাসক পুরুষ। তাই সমাজের সব-কিছু নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করেছে পুরুষ। কিন্তু সেই সব নিয়ম প্রতি ঘরে ঘরে কার্যকর করা তো একা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তার আছে বাইরের জগতে আর পাঁচটা কাজ। তাই এই দায়িত্ব-ভার দেওয়া হয়েছে নারীর ওপর। আর রাজার থেকে পারিষদের আস্ফালন বেশীর মতন বিধানকর্তা পুরুষের থেকে বিধানগুলো কার্যকর

করতে নিষ্ঠুর হয়েছে এক নারী অন্য নারীর প্রতি অনেক বেশী। এই মানসিকতা থেকেই সংসারে বিধবা আত্মজনের প্রতি নানা নিয়ম আর নিষেধের ভ্রূকুটি তুলে থাকে নারীরা আগে। কারণে অকারণে বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে সবে বিয়ে হয়ে আসা ভীত, সন্ত্রস্ত নববধূটির ওপর। পুরুষ এই ব্যাপারে তুলনায় অনেক সহনশীল, যুক্তিবাদী।

আমার আগের বক্তব্য থেকে দূরে সরে এসেছি অনেকখানি। আসলে দীর্ঘদিন গ্রামে-গঞ্জে বা বড় বড় শহরেও এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে সমাজ থেকে পরিবারের মধ্যেও মেয়েদের এই দুর্বিসহ, সব রকমেই হীন অবস্থা দেখে এত তিক্ত আর হতাশ হয়ে ওঠে মন যে সে বিষয়ে কথা বলতে গেলে যেন আর শেষ হতে চায়না কিছুতেই। যাইহোক, আবার ফিরি আগের কথায়। স্কুল প্রায় বন্ধ হতে চললো ওদের অত্যাচারে। কেন্দ্রটি একজন মহিলা পরিচালিত আর মহিলা বা মেয়েদের জন্যে বলেই বীতরাগ ওদের এত। উপায়ান্তর না দেখে ধরনা দিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে। বহুদিন অনেক তদ্বির তদারকি করে, অনেক কথাবার্তা বলে পাষাণ বুঝি গললো কিছুটা। ওরা আসতে লাগলো আবার। ভয়ানক খুশি হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিলাম কাজে। একদিকে চললো স্কুল, তাঁত, অন্যদিকে সংলগ্ন জমিতে চাষ শুরু হলো শাক-সব্জির। আর একাজে ডেকে আনলাম এবার গাঁয়ের অল্প বয়সী ছেলেদের। ওরা দোকানে বাজারে নিয়ে যেতে লাগলো আমাদের জমির ফসল, তাঁতে তৈরি জিনিসপত্র। হাত লাগালো মাটি কোপানো, জল সেচের কাজেও। আমার উদ্দেশ্য ছিলো এমনিভাবে ওদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ওদের সব বিরূপতা ভুলিয়ে একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে টেনে নেওয়া তেমনি আবার অন্যভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা কতগুলো কর্মহীন, দিগভ্রান্ত ছেলেকে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে পারলে হয়তো এমন দিন আসত যে দেশে একজনও আর বেকার বসে থাকত না। চলছিলও বোধহয় সবকিছু সেইভাবেই।

এই সময় কিছু কাজ এসে পড়ায় কয়েক দিনের জন্যে যেতে হলো কলকাতায়। কিছু নতুন পরিকল্পনা আর নতুন আশা নিয়ে কেন্দ্রে ফিরে দেখি এক অভিনব ওলোট পালোট ব্যাপার হয়েছে সেখানে। আমি যেদিন গেছি সেদিনই কলকাতা থেকে এসেছেন কমিটি মেম্বাররা। এঁরা সব কেষ্ট-বিষ্টু মানুষ। কেউ গৃহিণী মস্ত কোনো শিল্পপতির, কেউ বা ঘরনী মন্ত্রী, সচীব বা নিজের গুণেই কেউকেটা। এঁরা সমাজসেবা করেন বড় বড় শহরে থেকে। গরীবদের দুঃখে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন মস্ত মস্ত সভা ডেকে। কিন্তু গরীবদের এলাকা মাড়ান না কোনদিন ভুলেও। অর্থাৎ এঁরা 'যেমন বেণী তেমনি রাখেন, চুল ভেজান না'। সমাজসেবা করেন এঁরা তাবড় তাবড় গোষ্ঠির 'চেয়ারপার্সন' 'কমিটি মেম্বর', 'অনারারি ভলানটিয়ার্স' এইসব হয়ে বড় বড় সভা সম্মেলনে বক্তৃতা-বক্তব্য রেখে, নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে টিকিট বিক্রীর টাকায় রাজ্যপালের 'রিলিফ ফাণ্ডে' মোটা টাকা 'ডোনেশান' দিয়ে। বিভিন্ন কেন্দ্রের কমিটি মেম্বর হবার অধিকারে যখন তখন তদারকিতে আসেন এঁরা গাঁয়ের-গঞ্জের কেন্দ্রগুলোতে। এমনি এক তদারকিতে এসে তছনছ করলেন এঁরা আমার কেন্দ্রের তাঁতঘর, অফিসঘর, স্কুলবাড়ি। এদিক ওদিক করে ভাগাভাগি করলেন সারা মাসের বিক্রির জন্যে সাজিয়ে রাখা জিনিসপত্র। আমার কেন্দ্রের সুনাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। সবকিছু কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা মতনই। একটু আগেই যে কথা বলছিলাম যে, মেয়েদের পথে, তাদের যে কোনো অগ্রগতি বা ভালো কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মেয়েরাই সবথেকে আগে, সবচেয়ে বেশী, প্রমাণ করে গেলেন বোধহয় এঁরা সে কথাটাই। এত আগোছালো একদম কিছু না থাকা একটা কেন্দ্রকে প্রায় একলা হাতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক মহিলা এমন এক সুপরিকল্পিত সংগঠনে, অসহ্য হয়ে উঠেছিলো বোধহয় ওদের এই চিন্তাটাই। আঘাত দিয়েছিলো অহংবোধে।

পদত্যাগ করতে চাইলাম তক্ষুনি। কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন না। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন তখনই ডাক এলো জেনিভা থেকে

ওয়াই. ডাবলিউ. সি.-এর গ্রাম ভিত্তিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিপদে, সমাজের বিভিন্নস্তর থেকে কাজে বাধা পেতে পেতে ক্লান্ত, বিষন্ন হয়ে উঠেছিলো সমস্ত মন-প্রাণ। ভালো লাগলো মানসিক এই বিপর্যয়ের দিনে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে ডাক পেয়ে। গেলাম জেনিভা আর এই সুযোগে সে দেশের শহরে-গ্রামে ঘুরে ঘুরে খুব খোলা চোখে দেখলাম সেখানে মেয়েদের অবস্থা। দেশের আকাশে তখন ঝড় উঠেছে 'উইমেন লিবের'। তবু কত সহজে দাঁড়ায় মেয়েরা সেখানে নিজের অধিকারে পায়ের তলায় শক্ত মাটি নিয়ে, মাথা উঁচু করে। এক শতাব্দী আগেও মৃত স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে কালো পোশাক পরে থাকতে হত বিধবা স্ত্রীকে এক বছর। নিষেধ ছিলো কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার। আজ শুধুই একটা হাস্যকর গল্পকথা হয়ে আছে সেদিনের সেই বিধান। বিবাহ সেদিনও ছিলো আজও আছে একটা অতি স্বাভাবিক সাধারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপার হয়ে। বেশবাস বা খাওয়া-দাওয়ার অন্য ব্যবস্থার কথা তো অচিন্তনীয় ব্যাপার। ডিভোর্স হলে পুরুষ মানুষটি মাথা উঁচু করে হেঁটে বেড়ায় গটগটিয়ে। যখন যেমন ইচ্ছে বিয়ে করে আবার বাদ্যি-বাজনা বাজিয়ে আলো-উৎসবে রমরম করে আর ডিভোর্সি মেয়ে লজ্জায় গ্লানিতে মুখ লুকোয় গিয়ে ঘরের কোণে মায়ের বুকের মধ্যে, এমন বিচিত্র এক সমাজ ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারেনা সারা পৃথিবীটা জুড়ে আর কোনো দেশেব মানুষ। আসল কথা সেসব দেশের মেয়েদের আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। একজন মানুষের উপার্জনের ওপর ভরসা করে বসে থাকবার মতন দুর্বিপাক ভোগ করতে হয়না তাদের কোনদিন। যে শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার তা তারা পায় ছেলেদের মতন করেই সমান ভাগে। এই আলো সামনে নিয়ে পথ চলাটা হয় তাদের অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ। জীবনের পথে চলতে হলে আসলে চাই শিক্ষার আলো। যে আলো যে কোনো মানুষকে দেয় বিচারশক্তি, বোধ আর আত্ম-বিশ্বাস। পেছনে একটা মস্তবড় অন্ধকার রাজ্য ফেলে এসে এদের চোখে-

মুখে দেখছি যে আলোর ছটা তার খানিকটা নিয়ে যাব আমার ঘরে। আলো জালবো আমি ওদের জীবনে নিশ্চয়ই। এই সংকল্পে স্থির থেকেই দেশে ফিরে কাজ নিলাম জে. ডি. বিড়লা কলেজ অফ হোম সায়েনসে আর ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম আমার মাসিক যে সম্মান-দক্ষিণা তার সব টাকাটাই জমা পড়বে ওয়াই. ডবলিউ. সি-এর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে। বেশ কিছুদিন এই টাকা জমে ঘর তৈরি হলো খড়িবারিতে নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র খুলে। কাজ চলছে সেখানে আজো।

কারবারটা যদিও আমার সমাজতত্ত্ব নিয়েই তবু বড় বড় তত্ত্বকথা আমি বেশী বুঝিনা। ধর্ম বলতে ফুলবেলপাতা নিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রণামেও মন ভরেনা। আমার ধর্ম বলতে আমি সেবা ধর্ম্ম বুঝি। কিন্তু তা বলতেও যেন বড় বেশী গালভরা বড় কথা বলে শোনায়। কিন্তু আমার চারপাশে ছড়িয়ে আছে আজ যে অসহায় মেয়েগুলো তাদের দিকে চেয়ে এর থেকে আর অন্য কি কথা বলতে পারি? মুহূর্তের ভুলে মা হয়েছে এইসব কচি মেয়ে গুলোর অনেকেই। কুমারী মা। কত শতাব্দী আগে কুমারী কুন্তি নদীর গর্ভে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালবাসার সন্তানটিকে। আজ এতগুলো আলোক বর্ষ পার হয়ে এসেও কি আমরা এতটুকু আলো জ্বালতে পেরেছি আজকের একটি কুন্তিরও জীবনে? সেদিনের সেই ভ্রূকুটি কুটিল মানুষগুলোর মতন আমরাও তো আজ মুখ ফিরিয়ে নিই ওদের দিক থেকে, দেখি দুচোখ ভরা ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা দিয়ে। নিস্পৃহ ঔদাসিন্যে একটি অসহায় শিশুকে ফেলে দিই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালে। অথচ এতসবের জন্যে দায়ী যে পুরুষটি সে পরম নিশ্চিন্তে হাত-পা ধুয়ে ফিরে যায় আবার নিজের স্বাভাবিক জীবনে। বিয়ে করে। নতুন সংসার পাতে। সন্তান আসে পিতৃ পরিচয়ের গৌরব নিয়ে। মালিন্য স্পর্শ করেনা কোনখানে এতটুকু। আর আছে ভীরু পায়রার মতন সন্ত্রস্ত কতগুলো জেল ফেরৎ মেয়ে। জেলে গিয়েছিলো কোনো পাপ বা অন্যায় করে নয়। ঘর বাঁধতে চেয়েছিলো ওরা নিজেদের স্বপ্নের। পাততে চেয়েছিলো একটা সুখের সংসার। সেই সুখের

ছবি তাকে দিনের পর দিন দেখিয়েছে একটি পুরুষ। অভিনয় করেছে ভালবাসার। সরল বিশ্বাসী মেয়েটা সেই মেকী প্রেমে ভুলে তার হাত ধরে নেমেছে পথে। ঘর হয়নি এরপর ওদের একজনেরও। ঘরনীর সম্মান দেয়নি ওদের হাত ধরে পথে নামিয়ে আনা পুরুষটি। বাসি ফুলের মতন ফেলে দিয়ে গেছে পাশে। অদ্ভুত বিধি ব্যবস্থা শুধু এদের বেলাতেই নয়। আশ্চর্য সব ব্যবস্থা আর নিয়ম তো সমাজে যে কোনো স্তরে প্রতিটি মেয়ের বেলায়। একজন অবিবাহিত পুরুষ নির্দ্বিধায় থাকতে পারেন যেখানে ইচ্ছে, অথচ একজন অবিবাহিতা বা বিধবা মহিলার সামান্য একটা বাড়ি ভাড়া পেতেও প্রয়োজন একজন অভিভাবকের। কেন? এ কেনর কোনো উত্তর কারুর জানা নেই অথচ এই নিয়মই চলে আসছে যুগযুগান্ত ধরে। কোন সে সত্য যুগে ত্রিকালদর্শী মহাজ্ঞানী মুনি ঋষিদের দিনেও মানুষকে প্রথমে দিতে হতো তার পিতৃ পরিচয়। নাহলে দেওয়া হতোনা অবোধ শিশুটিকে গুরুগৃহে শিক্ষার অধিকার। মেয়ের বিয়ের সময় আজো বিধবা মাকে দারস্থ হতে হয় কোনো একজন আত্মীয় পুরুষকে অভিভাবক হয়ে দাঁড় করাবার জন্যে। পাঁচজন ভদ্র মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের মতন গুরুতর একটা কথা একজন মহিলার সঙ্গে বলা চলেনা নাকি একা!

কেন, কেন এই বৈষম্য? কোন যুক্তিতে? যে কোনো কারণেই এমনকি চরিত্রহীন লম্পট স্বামীর কাছ থেকেও বিবাহ-বিচ্ছেদ নেওয়া বা অবিবাহিতা কোনো মহিলা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটি ভদ্র পাড়ায় বাড়ি ভাড়া যদি নিতেও পারেন তাহলেও প্রতিবেশী পাঁচ জনের কখনো অতি উৎসাহ, কখনো অদম্য কৌতুহল আর ভেতর ভেতর চোখ ঠারাঠারি অসহ্য করে তোলে নাকি তার জীবন? কেন এমন হবে সে কথা ভাববার সময় আসেনি কি আমাদের আজো? সময় হয়নি একজন মানুষকে মেয়ে আর পুরুষ, বিভেদের কঠিন গণ্ডিটানা এই পরিচয়ে না দেখে, শুধু তাকে একজন মানুষ হিসেবে দেখবার?

পেশাগত ভাবে সমাজ সেবা করতে গিয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা এইসব বৈষম্য আর বিভ্রান্তি মনকে নাড়া দিয়েছে বারবার। এই নিয়ে কথা বলেছি অনেক সমাজসেবী, ইতিহাসবেত্তা, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। কিন্তু খুঁজে পাইনি প্রশ্নের ঠিক মতন উত্তর। কেউই ঠিক করে বলতে পারেননি কবে থেকে কেমন করে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে এলো এই বিভাজন। পুরুষ শাসনকর্তা হয়ে উঠল নারীর। প্রতাপান্বিত অনেক বেশী। আর নারী হলো তার নেহাতই যেন সুন্দর করে সাজানো একটা সখের জিনিস মাত্র। গোটা পৃথিবীটার দিকে চেয়ে সত্যি বলে প্রতিপন্ন হয়না কি এই কথাটাই? না হলে এতবড় পৃথিবীর মধ্যে এতগুলো মহাদেশের কর্ণধার হতে পেরেছেন কজন মহিলা? কেন কোনো দেশে সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতি হতে পারেননি একজনও মহিলা? পৃথিবী জুড়ে যখন চলে বড় বড় শীর্ষ সম্মেলন তখনো সেইসব সভায় এক হাঁড়ি চালের মধ্যে কয়েকটি সরষের দানার মতন করে খুঁজে বার করতে হয় মহিলা প্রতিনিধিদের। দেশ বিদেশের কর্ণধারেরা যখন বসেন সমস্যাকীর্ণ তাবড় তাবড় সব আলোচনায় তখন এক একটি সাজানো পুতুলের মতন তাঁদের সঙ্গে আসা স্ত্রীরা টুকটাক কেনাকাটা সারেন শহরের দোকানে বাজারে। কেন? তাঁরা কি স্বামীর পাশে বসে যোগ দিতে পারেন না এইসব আলোচনায়? কেন পারেন না? স্বামীদের থেকে কম তাঁরা কোন দিক দিয়ে? কোনো দিকেই কম নন, শুধু তাঁরা 'মেয়েমানুষ' এই অপরাধ। এই অপরাধেই ফ্রান্সের মতন এক সুসভ্য দেশে শত লোকের চোখের সামনে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছিলো জোন-অফ-আর্ককে শুধু দেশকে ভালবাসার, দেশের জন্যে কিছু করার অপরাধে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে 'বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' একা যুদ্ধ করতে হয়েছিলো আর্ত, আহত সৈন্যদের সেবা করবার অধিকারটুকু অর্জন করতে। তবু তার পরেও আছে। আজ থেকে মাত্র দেড়শো বছর আগে ইংলণ্ডের মতন এত উন্নত দেশেও মেয়েদের জন্যে হাসপাতালে কোনো শয্যার

ব্যবস্থা ছিলনা। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এলিজাবেথ গ্যারেট ঠিক করেছিলেন তিনি ডাক্তার হবেন। কিন্তু ঠিক করলেই তো হয়না। নারীকে অত সহজে নিজের ভাগ্য নির্ণয় করতে দিয়েছিলো কি সেদিন দারুণ প্রগতিশীল সে দেশও?

পৃথিবী জুড়ে মেয়েরা আজ সোচ্চার হয়েছেন। ভয়ানক প্রতিবাদে ঋজু হয়েছেন এমন একটা ঘুণে ধরা স্থবির সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কিন্তু 'ব্রা পোড়ানো' এই নারী জাগরণে শুধু সাময়িক খানিকটা উত্তেজনা ছড়ানো ছাড়া কিছুই কাজ হবে না যতদিন না ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারে পরিবর্তন আসে সহিষ্ণু চিন্তাধারায় আর যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনায়।

কিছুদিন আগে একবার গিয়েছিলাম মেয়েদের একটি 'ফাটক' দেখতে। বেশ কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। এরা সব এক বছর থেকে বারো বছর আছে জেলে।

কিন্তু কোন অপরাধে এদের এই শাস্তিভোগ? অপাপবিদ্ধ কয়েকটি কিশোরীর দিকে চোখ ফেলে জিজ্ঞেস করলাম ভয়ানক অবাক হয়ে।

'পাপ করবে কেন, ওরা হারিয়ে গিয়েছিলো এই ওদের অপরাধ। হারিয়ে গিয়েছিলো নয়, হারিয়ে দেওয়া হয়েছিলো ইচ্ছে করে। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো পথের ধারে আবর্জনার জঞ্জালে'। বহুদেখা একটা আশ্চর্য পৃথিবীর অভিজ্ঞতা গলায় নিয়ে বললেন রুক্মিণী তেতো হেসে।

সামনে দাঁড়ানো চোদ্দো পনেরো বছরের ফুটফুটে একটি কিশোরী। বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। 'একে দেখে কি আপনার হাবা বোবা বলে মনে হয়? বোবা-হাবা ও জন্মগতভাবে নয়। হয়েছে ভয়ে। মা-বাপ মরা মেয়েটা দশ বছর বয়সে গিয়ে উঠেছিলো পিসিমার বাড়ি। তেরো বছর বয়সে পড়তে না পড়তেই কিশোরী শরীরটার ওপর চোখ পড়লো পিসেমশাইএর। তারপরের গল্প তো অনেক জানা। নিজের চোখের সামনে, সংসারের মধ্যে

এমন ব্যাপার-স্যাপার দেখে তো ভয়ানক রেগে মারধোর করে পিসিমা তাড়িয়ে দিলেন হতভাগা অলক্ষ্মী মেয়েটাকে বাড়ি থেকে। পিসেমশাই অন্নদাতা তাই তাঁর ওপর রাগ দেখাবার সাহস কোথায় পিসিমার! রাগ দেখালে তিনি নিজেই বা ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবেন কোথায়? সহায়-সম্বলহীন একা মেয়েটা কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালো পথে পথে অনির্দ্দিষ্টভাবে তারপর একদিন পুলিশের নজরে পড়ে গিয়ে বন্ধ হলো জেলের মধ্যে। কোনো বিচার হলনা। খোঁজ করতে এলনা কোনোখান থেকে কেউ। পুলিশেরই বা কি মাথাব্যথা নামগোত্র-হীন কোথাকার একটা মেয়ের জন্যে এর থেকে বেশী কিছু ভাবনাচিন্তা করতে? জেলের ভেতর আত্মীয় পরিজন-শূন্য এইরকম একটা মেয়ের অবস্থা কেমন? বাঘের খাঁচার মধ্যে টাটকা মাংস খণ্ডর মতন। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো তাকে হাবিলদার, জমাদার থেকে দুধ দিতে আসা গোয়ালাটা পর্যন্ত। জেনানা ফাটক, তবু অবাধ প্রবেশ-অধিকার সেখানে সকলের। নালিশ জানাবার কেউ নেই। শুধু এক অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণা আর বিভীষিকার রাজত্বে বছরের পর বছর বন্দী থেকে আধপাগল, বোবা হয়ে গেছে কচি মেয়েটা'।

ষোলা বছরের বিধবা পারুল মা হতে চেয়েছিলো। যে পুরুষ-মানুষটির প্ররোচনায় সে নির্দ্বিধায় দিয়েছিলো নিজেকে উজাড় করে নিরুদ্দেশ হলো সেই বীরপুঙ্গব মেয়েটার অন্তসত্ত্বা হবার খবর পেয়েই। একে বিধবা হবার অপরাধ, (?) তার ওপর আবার এতবড় পাপ? পথে নামিয়ে দিলো বাড়ির লোক সঙ্গে সঙ্গে। পথ থেকে একই নিয়মে পুলিশের হাতে। সেখান থেকে 'হোমে।' এমনি একই গল্প, মেনকা, শকুন্তলা, সরস্বতী সকলেরই। কেউবা প্রেমাস্পদের হাত ধরে বেরিয়েছে পথে নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দুচোখে ভরে নিয়ে, কেউ আবার আত্মীয় পরিবারের কোনো পুরুষের লালসা থেকে আত্মরক্ষা করতে। ফল হয়েছে সেই এক। বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্টকাল জেল ভোগ করবার পর কোনো দরদী সমাজসেবীর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত উঠে এসেছে 'হোমে।' হোমে আনবার সময় মেয়েগুলির অতীত

ইতিহাস সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে এইসব অসহায় সরল মেয়েগুলোর এত দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী যে বিশ্বাসঘাতক বা লোভী পুরুষ তাদের জন্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই সমাজে। তাদের নিজেদের ঘর বা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার কথা ভাবতেই পারেনা কেউ। বরং বিপথগামী ছেলের ঘরে মন বসাতে তার বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করেন সানাই বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে তার জন্যে একটা রাঙা টুকটুকে বৌ এনে দেবার। পরনারী আসক্ত স্বামীকে ক্ষমাঘেন্না করে নেন পতিব্রতা (!) স্ত্রী অচিরেই। 'পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করেই থাকে। অতসব ধরলে কি আর সংসার চলে?" বর্ষীয়সী মহিলারা বলেন বুঝিয়ে। "ঘাড় থেকে ভালোয় ভালোয় তোমার যে পাপ নেমে গেছে এই মনে করেই ধন্যবাদ দাও ভগবানকে।"

সব হোমের সব মেয়ের বৃত্তান্ত এক। ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয়, জানায়-অজানায় যে কোনো বয়সে একবার পদস্খলন হলে ক্ষমা নেই তার আর সংসারে কোনরকমে, কিছুতেই। নিষ্ঠুর সংসার সেই মুহূর্তে ঠেলে ফেলে দেবে তাকে ঘরের বাইরে। দুদিন না যেতেই জায়গা হবে তার হয় শহর বা গাঁয়ের কোনো নিষিদ্ধ পল্লীতে নাহলে আরো দুর্বিসহ কোনো অন্ধকার জীবনে। এই নিয়ম চলে আসছে কত শত বছর আগে 'নগরের নটী বাসবদত্তার' দিন থেকে সমানভাবে আজো। চলবে আরো কতযুগ যদি আমরা এ সম্বন্ধে আজো চোখ ফিরিয়ে থাকি নির্লিপ্ত উদাসীনতায়?

আমি সমাজ সংস্কারক নই। তারজন্যে আছেন বড় বড় সব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সব ভাগ্যতাড়িত অসহায় মেয়েগুলোর জন্যে এতটুকু কিছু করতে গেলে শত বাধা যেন ধেয়ে আসে চারদিক থেকে। তবু এত সব বাধা-বিপত্তির মধ্যেই যদি কাজ করতে পারি আর সেই চেষ্টায় যদি গড়ে দিতে পারি একটি মেয়ের জন্যেও তার স্বপ্নের সংসারখানি, ফিরিয়ে দিতে পারি ওদের পায়ের নিচে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়ানোর নতুন একটা বিশ্বাস তবেই সার্থক হবে আমার সব কাঁটা মাড়ানোর যন্ত্রণা।

দ্বিধা তবুও

মঞ্জু ভট্টাচার্য (শিল্পপতি)

আপনার ছেলে কেমন আছে মিসেস ভট্চায্? দেখা হলেই বলতেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। আর বলবেন নাই বা কেন? জন্ম থেকেই ভুগছে ছেলে অপুষ্টিতে। যা দরকার ততটা টাকা-পয়সা কোথায় যে পরিচর্যা করব তার ঠিকমতন? সেজন্যেই সকাল-সন্ধ্যে দৌড়োদৌড়ি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে। ছেলেকে গর্ভে ধরিনি। বহুদিন ছিল সে আমার স্বপ্নে। তারপর রূপ নিলো বাস্তবে। আমার মানসপুত্র হিমাদ্রি পাখা। শিল্প জগতে প্রবেশ আমার ওকে নিয়েই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবার আগে বলে নিই জীবনে চলবার এত দিক আর পথ থাকতে শিল্পদ্যোগে মন গেলো আমার কেন আর কেমন করে।

বাবা ছিলেন দিনাজপুর জমিদার ষ্টেটের পর্যবেক্ষক। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার এতটা চল ছিলনা তবু পড়াশোনায় মন আর আগ্রহ ছিল আমার প্রচণ্ড। তখন সংসারে মায়েদের তো কোনো কথাই চলতনা। বাবা মনে প্রাণে বা মতবাদে কি ছিলেন বুঝবার বয়স আমার তখন হয়নি। লেখাপড়ায় আমার মন আর ঐকান্তিক আগ্রহই হয়তো নরম করতে পেরেছিলো বাবাকে কিছুটা। কিন্তু সে প্রশ্রয় রইলো ঐ ম্যাট্রিক পর্যন্তই। আগেই খোঁজ খবর চলছিলো পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসিয়ে দেওয়া হলো বিয়ের পিঁড়িতে। অবশ্য পাশ-ফেলের অপেক্ষায় কেউ যে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকত তাতো আর নয়। আসলে তখনকার দিনে একটা মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতো আর কটা পরিবারে কজন? পড়তে দেওয়া হয়েছিলো তখনকার মতন করবার জন্যে হাতের কাছে

অন্য আর কিছু ছিলনা বলে, নাহলে নেহাতই স্নেহের একটা আবদার রাখতে।

বিয়ে হয়ে গেলো ভালো করে কিছু বুঝবার বা ভাববার আগেই।

শ্বশুড়বাড়িতে মস্তবড় একান্নবর্তী সংসার। পণ্ডিত বংশ। বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা আর সাহিত্য চর্চার পিঠস্থান। দাদাশ্বশুর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঈশ্বরচন্দ্রের বহু জীবনী গ্রন্থে আছে তাঁর নাম। এ হেন শিক্ষিত পরিবারে মেয়েদের বেলায় ব্যবস্থা কিন্তু সেই চিরন্তন কঠোর পর্দার। চক মিলোনো সেকেলে বাড়ি। পেছনের দিকে তার অন্দরমহল। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে? সূর্য-চন্দ্র তো কোন ছাড়, এক ফুটকি জোনাকির আলোও যাতে ঢুকতে না পারে তাই চারদিকে দরজা-জানলা সব বন্ধ শক্ত হাতে। চোত-বোশেখের নিস্তব্ধ ঝাঁ-ঝাঁ বেলায় যখন কাক পাখিটাও ডানা মুড়ে বসে গাছের ছায়ায়, শোবার ঘরের চারদিকে দরজা জানলা বন্ধ ছায়াছায়া ঘরে শরীর এলিয়ে দেয় বাড়ির কর্তারা ভাত-ঘুমে, তখন গলির মোড়ে ডেকে যায় ফেরিওয়ালা 'পুরনো, ভাঙ্গা পেতল-কাঁসার বাসন বদলিয়ে নতুন বাশুন নেবেগো মা……'। বড় চেনা সেই ডাকে চারদিক থেকে ছুটে আসেন বাড়ির গিন্নিরা। সিঁদুর, আলতা, ফুলেল তেল, চুলের কালো ফিতে, সরু কাঁটার ডাকে আসে মেয়ে-বৌয়েরা। ঘুমে অচেতন কর্তারা। এই অবসরে ডাক পড়ে ফেরিওয়ালার। পেছনে কঠিন নিষেধের রক্তচোখ ভ্রূকুটি। সামনে হাতছানি এক ঝলক মুক্ত প্রাণের। এদিকে দরজায় জানলায় আগল তোলা শক্ত করে। কি করা যায়? খাঁচায় বন্ধ পাখির একমাত্র মুক্তির পথ তখন পাখি-তোলা জানলা। সেইটুকু অবকাশেই চলে বিকিকিনি, দরদস্তুর। সব চুপি চুপি, প্রায় নিঃশব্দে, কর্তাদের চোখ-কান এড়িয়ে। মেয়ে-শাসনের এহেন উত্তুঙ্গ পাঁচিল পেরিয়ে পড়াশোনা করতে স্কুল-কলেজে যাবার পথ কোথায় বাড়ির মেয়েদের? সে না হয় তবু বাইরের পর্দা বা শাসন। আর ঘরে? আমার ননদেরা জন্মেছিলেন যেন গলায় সুর নিয়ে। মিষ্টি সুরেলা গলা তার ওপর গানের প্রতি আশ্চর্য

এক আকুল ভালবাসা। কিন্তু নিষেধের প্রচণ্ড ভ্রূকুটি তো সেখানেও। ভদ্র গেরস্থ ঘরের মেয়েরা গান করবে কি আবার গলা বার করে ? বাইজী নাকি ? ওসব চলবেনা বাড়ির অন্দরমহলে। নাচার ননদেরা সব শাসনের তর্জন মেনে নিয়ে গান করতেন ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে, প্রতিবেশীদেরও চোখ কান বাঁচিয়ে, বাড়ির পুরুষ মানুষেরা যখন যেতেন বাইরে তখন। আজ থেকে সে আর কতদিন আগে ? আমার বিয়ে হয়েছে ১৯৩৮ সালে। তার মানে পঞ্চাশ বছরও পুরো হয়নি তো. অথচ তখনো সমাজে মেয়েদের এই অবস্থা !

কপালগুণে আমার বাপের বাড়ি রক্ষণশীল ছিলনা ঠিক এতটা। অন্তত আমার পড়াশোনা করবার ইচ্ছেটাকে টুঁটি টিপে মারা হয়নি এমন নৃশংসভাবে। অন্য কিছু কিছু পরিবারেও মেয়েরা যেতে শুরু করেছে স্কুল-কলেজে, একজন দুজন করে। কিন্তু তবু ছেলেদের মতন মেয়েদের লেখাপড়া করানোটাও যে একটা অতি জরুরি কাজ বা উচিৎ কর্তব্য একথা খেয়াল করতেন না বড় একটা কেউই। নাহলে ম্যাট্রিকে মোটামুটি ভালো ফল করা সত্ত্বেও আমার আর বেশী পড়ার ইচ্ছেটা তো আমল দেওয়াই হলোনা তার ওপর আবার না জেনে, না খবরাখবর করে, এমন একটা বাড়িতে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো যেখানে জ্ঞানের আলো তো দূরের কথা, সূর্যের আলোরই প্রবেশ নিষেধ অন্দরের উঁচু পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে। আসলে মেয়েরাও যে মানুষ, আর তাদেরও একটা আশা-আকাঙ্খা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে, একথা ভাবতেনই কোন পরিবারে কজন অবিভাবক ? নিরপেক্ষ প্রশ্ন তুললে বলা যায়, ঠিকমতন ভাবা হয়কি আজো সব পরিবারে ? তা সে যাহোক, ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আমাকে আর পড়তে দেওয়া হলনা শ্বশুরবাড়ি থেকে। কারণটা শুধু বাইরে কলেজে যেতে হবে তাতো নয়। তাহলে তো পরীক্ষা দেওয়া যেত ঘরে বসে পডাশোনা করেই। আসল কারণ পাশ করলে 'গেজেটে' যে নাম বেরোবে ঘরের বৌয়ের সেই লজ্জা ! বয়সটা তখন হয়েছেই আর কত ? ষোলো বছর হবে বোধহয়। সেই কচি বয়সে জীবনের সব সাধ আর স্বপ্নগুলো স্লেটে লেখা কতগুলো

হিজিবিজি অক্ষর মুছে ফেলবার মতন করে ধুয়ে মুছে মন দিলাম বাধ্যসাধ্য একটি অতি ভালো বৌ আর মা হতে। তফাৎটা শুধু, স্লেটের অক্ষর মুছতে লাগে শুধু জল। ষোলো বছরের একটা কচি বুক থেকে সবটুকু ইচ্ছে আর আকাঙ্খার রঙ ধুতে লাগে বুকের রক্ত।

তিন দশক কেটে গেলো এরপর। সংসার করলাম মন দিয়ে। আর সত্যি কথাটা বলতে গেলে এখানে স্বীকার করতেই হবে, স্বামী সন্তান নিয়ে গুছিয়ে সংসার করতে গিয়ে কবে কেমন করে যেন ডুবে গেলাম এর মধ্যে। এর বাইরেও যে কোনো জীবন আছে বা আমারও এ ছাড়া অন্য কোনো চাহিদা ছিলো এ কথাটা যেন ভুলেই গেলাম নিঃশেষে।

১৯৬৯ সাল। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। ব্যস্ত সকলে যে যার কাজে, নিজেদের জীবনে। শ্রী ভট্টাচার্য অবসর নিয়েছেন নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানির দায়িত্ব থেকে। বেশ কিছুদিন আগে চাকরিতে থাকতে থাকতেই সীতারামপুরের কাছে একশো বিঘে জমি কিনেছিলেন নেহাতই খানিকটা সখ বা হুজুগের বশে। অবসর নেবার পর এখন হঠাৎ করে মন দিলেন সে জমি দেখা শোনাতে, ফলে বছরের বেশীরভাগ সময়ই কাটাতে হতো তাঁকে সেখানে। আমার পৃথিবী ছোট হয়ে এলো আরো। জীবন থেকে সব ব্যস্ততা ঝরে গিয়ে এখন শান্ত সমাহিত সময়। নিঃসঙ্গও বুঝি কিছুটা। আর সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই আস্তে আস্তে কেমন করে যেন জেগে উঠলো অনেকদিন ঘুমিয়ে থাকা আর একটা মন। এই মনটাই তো একদিন শুধু নৈমিত্তিকতার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে করতে চেয়েছিলো আরো কিছু। ভুলে যাওয়া অনেকখানি পথ পেরিয়ে অনেকদিন পর সামনে এসে দাঁড়ালো আবার সেই মন। অনেক হয়েছে, আর নয়। কিছু একটা করতেই হবে এবার। করতে তো হবে, কিন্তু কি করা যায় ঠিক মতন? এইরকম কি করি, কি করা যায় যখন মনের অবস্থা তখন নতুন একটা আলোর সন্ধান নিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার মামাতো দাদা শ্রীকালীপদ গাঙ্গুলী। উষা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। ব্যবসা বোঝেন ভালো।

ব্যবসাতে উৎসাহও প্রচুর কিন্তু যে কোনো একটা ব্যবসা দাঁড় করাতে গেলে যতখানি সময় দিতে হয়, বড় একটা কোম্পানির বেশ দায়িত্বের কাজে থাকার ফলে সে সময়টুকু নিজের কোম্পানিতে দেওয়াটা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। সময় তখন আমার হাতে প্রচুর। তার থেকেও বেশী পাগল করে তুলেছে কিছু একটা করার ইচ্ছেটা। আজ অনেক-খানি দূরে ফেলে আসা অতীতটার দিকে বহু অভিজ্ঞতার পোড় খাওয়া চোখ নিয়ে দেখতে গেলে বড় নিষ্ঠুর আর অপ্রিয় সত্য হয়ে ভেসে ওঠে যে বাস্তব ছবি তা হোলো যে, একজন নেহাতই অনভিজ্ঞ মানুষ, আর বিশেষ করে একজন মেয়ে হিসেবে সহজেই আমাকে দাবিয়ে রেখে বা নিজের ইচ্ছেমতন চালানো যাবে বলেই একরকম মাটির পুতুল করে আনা হয়েছিলো আমাকে।

শুরু হলো কাজ। উষা কোম্পানিরই চিফ্ ডেভেলাপ্‌মেণ্ট অফিসারের স্ত্রীকে নিয়ে খোলা হলো নতুন পাখার কারখানা। হিমাদ্রি। ইনটারপ্রেনিয়ার হলেন উষা কোম্পানির আর একজন টেকনিকাল পার্সন মুরারি গাঙ্গুলী। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া গেলো দুলাখ টাকা। ১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর, বেহালায় পত্তন হলো আমাদের হিমাদ্রি পাখার কারখানা।

টাকার অঙ্কে মূলধন আমাদের কিছুই ছিলনা বলা চলে, কিন্তু আমাদের উদ্যোগে ছিল যে সততা আর নিষ্ঠা মস্তবড় সেই মূলধন নিয়ে যদি আমরা চলতে পারতাম ঠিকভাবে. 'হিমাদ্রি ফ্যান' তাহলে হয়তো তখনই যায়গা নিত ভারতের যে কোনো উচ্চমানের নামী 'ফ্যানের' সারিতে। কিন্তু তা হলোনা। বেশীরভাগ বাঙালি অংশীদারী ব্যবসার কপালে যা ঘটে আমাদেরো হলো তাই। সব কাজেই মতবিরোধ থেকে দিনে দিনে খুব প্রচ্ছন্ন রেষারিষি আর নিঃশব্দ একটা ঠাণ্ডা লড়াই ধূপের মতন জ্বলতে লাগলো ভেতরে ধিকিধিকি আগুন নিয়ে। এইরকম অবস্থায় ব্যবসা থেকে লাভের অংশ দেখা তো দূরের কথা, অসাধ্য হয়ে উঠলো ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করাই। সুতরাং অনিবার্যভাবে শুরু হলো ব্যাঙ্কের সঙ্গে ভুল

বোঝাবুঝি আর তার ফলে ব্যাঙ্ক তালা ঝুলিয়ে দিলেন কারখানার দেউড়িতে।

এতদিন মস্তবড় একটা সংসার করেছি প্রথমে শ্বশুর-শাশুড়ির বৌ হয়ে। তারপর থেকে গৃহিণীত্বে প্রমোশন পাবার পর একটা সংসারে মা হয়ে, কত্রী হয়ে, মাথায় তুলতে হয়েছে অনেক দায়-দায়িত্বের বোঝা।

এ ব্যাপারে যদি ঠিকমতন খুঁটিয়ে দেখা যায় তাহলে কিন্তু প্রতিটি সংসারকেই বলা চলে এক একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে সুখ আর সাফল্যের সঙ্গে আনন্দ আর সার্থকতা যেমন আছে তেমনি আছে আবার সমানভাবেই ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-বিপদ। স্থির আর নিশ্চিত একটা পরিণতিতে পৌঁছতে এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় গেরস্থকে অহোরাত্র। যেহেতু গৃহিণীকেই সামলাতে হয় সংসারের প্রাথমিক সব ঝড়-ঝাপটা তাই পরিচালকের একটা গুরুদায়িত্ব-বোধের প্রশিক্ষণ হয়ে যায় তার নিজেরই অজান্তে। খুব কম গৃহিণীই কিন্তু জানেন এই একান্ত সত্যি কথাটা। জানবেন কেমন করে, দরকারই হয় আর কার কবে এমন সত্যি কথাটা ঠিকভাবে জানবার? দরকার পড়লো আমার। ঝড়ে পড়া টালমাটাল একটা প্রায় ডুবন্ত জাহাজের হাল ধরতে হলো শক্ত হাতে। এতদিন যে হাতে ধরেছি একটা মস্ত সংসারের হাল, মাথায় নিয়েছি সব দায়-দায়িত্বের বোঝা সেই হাতে তেমনি করেই এবার প্রায় ডুবন্ত কারখানাটাকে বিপদের সমুদ্র থেকে টেনে তুলতে এগিয়ে এলাম আমি সব আগে। আসলে এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন আমার কাছে মস্তবড় একটা চ্যালেঞ্জের মতন। এতদিন যখন শুধু সংসার করেছিলাম তখন তাতেই ডুবে গিয়েছিল মনপ্রাণ। সেই কর্তব্য শেষ করে নিজের দিকে যখন ফিরে চাইলাম তখন মনে হলো যেন সর্বাঙ্গে ভবে উঠেছে শুধুই দিন যাপনের গ্লানি। জীবন বাঁধা হয়ে গেছে শুধুই 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার' গতানুগতিক ছকে। এরকমটা কিন্তু আমি চাইনি কোনদিন। তাই বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেলেও

গতানুগতিকতার ছাপ মারা 'সংসার করা' ছাড়া করতে ইচ্ছে করলো অন্য কিছু। নতুন কিছু। এই অন্য কিছুর কথাতেই গেলো গেলো রব তুলেছিলেন চারদিক থেকে সবাই মিলে। 'বেশতো এতদিন করছিলে সংসারধর্ম, ভূতে ধরলো নাকি এই বুড়ো বয়সে এসে'? বললেন কেউ। 'একটা বেগুন তুলতে আঁকশি দিতে হয় যাদের গাছের ডালে তাদের আবার শিল্পপতি হবার সখ! মেয়ে হয়ে জন্মেছো, বিয়ে-সাদি করেছো, এখন স্বামী-সন্তানের দেখাশোনা করো, খাওদাও তা নয় যতসব উদ্ভট সখ। মেয়েরা পারবে কেন সবকিছু চাইলেই? চাইলেই কি আর পুরুষের সমান হওয়া যায়, ভগবান যাদের গড়েছেনই আলাদা করে?' বললেন হয়তো আর এক দল সকৌতুক বিদ্রূপে ঠোঁটের পাশ সরু করে।

কেনো পারবনা, সাহসে শক্ত হলাম আমিও সমানভাবে। দেশে আজ চূড়ামণি হয়ে বসে আছেন যখন 'বেগুন গাছে যাদের আঁকশি দিতে হয় তাদেরই একজন, তখনো কেনো মেয়েদের ওপর এই অনাস্থা আর অবজ্ঞা? এতকাল জীবন কাটিয়েছি তো ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে সংসারের ছত্রছায়ার নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়। কিন্তু আজ আমি প্রমাণ করে দেব, নারী আর পুরুষের মধ্যে যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডি টেনে রাখা হয়েছে চিরকাল ধরে তা মিথ্যে। মিথ্যে আর অন্যায়। প্রকৃতি যদি কোনরকমে দুর্বল করে থাকে নারীকে তা সে তার শারীরিক শক্তিতে। বুদ্ধিবৃত্তি বা বোধে তো নারী পুরুষের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। কোনোদিকে কারুর কথায় কান না দিয়ে তাই শুরু করেছিলাম আমি এই ব্যবসা। পত্তন করেছিলাম কারখানা। এখন সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম যেন মস্ত একটা চ্যালেঞ্জের সামনে। ভয় পেলে হবেনা। ভরসা হারালে চলবেনা। আমার যেন মনে হলো আমি হয়ে উঠেছি গোটা একটা নারী সমাজের প্রতিভূ আর সমস্ত পৃথিবী যেন নিঃশব্দে সহাস্য চোখ মেলে চেয়ে আছে আমার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে।

দেখা করলাম গিয়ে এস. আই. এস. আই-এর শ্রী অশোক ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। হৃদয়বান মানুষ। মেয়ে বলে অবজ্ঞা করলেন না। সকৌতুক বিদ্রূপও চিকচিক করলোনা ওঁর চোখের কোণে, বরং হার্দ্য হলেন সহৃদয় সহযোগিতা আর সাহায্যে। সাহস যোগালেন বুদ্ধি আর পরামর্শ দিয়ে। উনি পাঠিয়ে দিলেন 'ফ্যাসি'র প্রেসিডেন্ট শ্রী এস. এন. শিবোপুরির কাছে। কৃতজ্ঞ আমি তাঁর কাছে যে তিনিও আমাকে একজন মেয়ে বলে নরম চোখে দেখলেন না। বিশেষ করে, আলাদাভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধে দেবার কথা ভাবলেন না। আসলে আমি মেয়ে বলে বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধে নিতে ঘৃণা করি চিরকাল। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ মানুষের জীবনে আছেই। তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে চেষ্টা করে, যুদ্ধ করে মানুষ। আমিও তেমনি একজন মানুষ হিসেবেই চেষ্টা করব এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে।

শ্রী আর. কে. তালওয়ার তখন চেয়ারম্যান স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার। বম্বে থেকে কলকাতায় এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের কিছু রুগ্ন শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে। 'ফ্যাসি' আমাদের হিমাদ্রির 'কেসটা' রুগ্ন শিল্প হিসেবে তাঁর কাছে পাঠালো কোনরকমে একটা সমাধান খুঁজে বার করবার জন্যে। বড় সাহসে বুক বেঁধে হিমাদ্রির মুখপাত্র হয়ে গেলাম আমি। জীবনে এই প্রথম আলোচনায় বসলাম রথী-মহারথী মানুষজনের সঙ্গে। আশ্চর্য, জীবনে সেই প্রথম এতবড় একটা দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়েও দুরদুর করে উঠলোনা বুক একেবারের জন্যেও।

ব্যাঙ্গের হাসি কিন্তু হাসলেন শ্রী তালওয়ার।

মহিলা পরিচালক! ওঃ তাই! বললেন দাঁতের পাশে কলম চেপে।

অনেক রাত জেগে, প্রচুর নথিপত্তর ঘেঁটে তৈরি করে এনেছিলাম লাগসই সব সওয়াল জবাব। সেসব দিকে না গিয়ে মহিলা বলে কলম কামড়ানো প্রথম দর্শনেই! ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন

অনুভূতি হয়েছিলো খুব স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে বলা যাবেনা আজ তা স্পষ্ট করে, কিন্তু ভয়ানক ক্ষোভ আর অপমানে গরম একটা রক্তের স্রোত যেন ওঠা নামা শুরু করেছিলো মেরুদণ্ড দিয়ে আর সেই উত্তেজনায় কপালে সারি দিয়েছিলো বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা।

আপনি একজন মহিলা, এতসব সহজ কাজকর্ম ছেড়ে শিল্পোদ্যোগের মতন এমন ঝামেলার কাজে এলেন কেনো ? আর একটু বিশদ হলেন চেয়ারম্যান তাঁর মনোভাব প্রকাশে। তার ওপর আপনার কোনো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান নেই—আপনি একটা ফ্যক্ট্রি চালাতে পারবেন কি করে ?

মিঃ তালওয়ার, আমার কোনো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান নেই ঠিক কথা, বুকের মধ্যে অসহ্য চিনচিনে জ্বালাটা দাঁত দিয়ে চেপে নিজেকে সামলেছি ততক্ষণে শক্ত করে, আমাদের কোম্পানিতে টেকনিক্যাল পারস্‌ন্‌স যাঁরা তাঁরা কিন্তু মাথা ঘামাননা একটা অর্ডারের জন্যেও। সবটুকু প্রোডাকশনের মার্কেট করার দায়িত্ব আমার একার, আর সে কর্তব্য যে করতে পেরেছি আমি বেশ সুষ্ঠু-ভাবেই সে কথা জোর গলায় বলছে আপনার সামনে রাখা কাগজ পত্র। আমার প্রতি অনাস্থা কি শুধু আমি মেয়ে বলেই ?

নিঃশব্দ শ্রী তালওয়ার। সচেতনও বোধহয় কিছুটা। তবু এতর পরেও একটা রুগ্ন শিল্প খোলাতে মঞ্জুর করে গেলেন মোটে পঁচিশ হাজার টাকা !

যাহোক তাই সই। তবুতো কিছু করতে পেরেছি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তো ফিরে আসিনি শূন্য হাতে। কিন্তু যুদ্ধের যে বাকি তখনো অনেক বুঝলাম তা আরো পরে। চেয়ারম্যান তো টাকা মঞ্জুর করে চলে গেলেন কিন্তু সে টাকা দেবার হাত এখানকার ব্যাঙ্কের। আজ এতদিন পরেও সে কথা মনে করতে গিয়ে মুখের ভেতরটা পর্যন্ত তেতো হয়ে ওঠে কটু স্বাদে। আমার প্রাপ্য টাকাটা আদায় করতে ঘুরতে হয়েছে যে. কতজনের কাছে আর সকলের চোখে মুখেই দেখেছি

একই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন হাসি। কেন? কত শিল্পোদ্যোগই তো রুগ্ন হয়ে যায় কত রকম কারণে। কেউ সে সম্বন্ধে উৎসুক হন নিজের স্বার্থে কেউ বা দ্রব হন সহমর্মিতায়। আমার মুমূর্ষু কোম্পানির দিকে চেয়ে চোখে চোখে এই বিদ্রূপ কি শুধু আমি মেয়ে বলেই? নারী আর পুরুষ মিলেই তো অনন্তকাল ধরে চলে আসছে সমাজ সংসার আর পরিবার। তবে দুজনে অচেনা এক পৃথিবীর দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে, উঁচু-নিচু ছোট-বড়র অর্থহীন এই দড়ি টানাটানি কিসের জন্যে?

যে কথা বলছিলাম ফিরি সে কথাতেই আবার। বহুদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা জানালেন যে আপত্তি এসেছে বম্বে থেকে। টাকা এখন দেওয়া যাবে না। আপত্তি এসেছে! কিন্তু আপত্তি হলে আমার চলবে কেনো? ছুটলাম বম্বে। কিন্তু যাবার আগে কলকাতার প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কে গিয়ে প্রশংসাপত্র যোগাড় করলাম আমার হিমাদ্রি ফ্যানের জন্যে। বলতে ভুলেছিলাম যে, তখন অনেক ব্যাঙ্কই ব্যবহার করতেন হিমাদ্রি ফ্যান। খুশি হতেন। এই প্রশংসাপত্রের দরকার ছিলো বম্বে অফিসের জন্যে।

কোম্পানির দেউড়িতে তখনো ঝুলছে ব্যাঙ্কের তালা। কাজ কারবার কিছুই নেই। আমার যাতায়াত খরচা জোগাবে কোম্পানি কোথা থেকে? গেলাম তাই নিজেরই ঘরের টাকা ফেলে! একুশ দিন রইলাম বম্বেতে। এরমধ্যে শ্রী তালওয়রের সঙ্গে দেখা করা গেলো মোটে ৬।৭ দিন। কথা এগলোনা প্রায় কিছুই কিন্তু দরদী বন্ধুর মতন সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দিলেন স্টেট ব্যাঙ্কেরই উঁচুতলার অফিসার শ্রী ভোবে। তাও পেতে হলো অবশ্য অনেক যুদ্ধ করেই। অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে তাঁকে বোঝাতে হলো যে বন্ধ সাহায্য কেনো আবার পাবার অধিকার আছে আমাদের নতুন করে। অবশ্য খুশি হলাম তাতে আমি আন্তরিক। মেয়ে বলে অবজ্ঞা যেমন দুঃখ দেয়, দয়া তার থেকে অপমান করে অনেক বেশী। আমি মানুষ। ব্যবহার পেতে চাই মানুষের কাছে মানুষের মতনই। শ্রী ভোবেকে বললাম,

তোমরা কারখানা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের থেকেও ক্ষতি করলে তোমাদের নিজেদেরই। কারণ লাভ হোক, ক্ষতি হোক, কারখানা চললে ঋণের সুদটাতো তোমরা পেতে ঠিক। এর ওপর আবার আমাদের পাখার দাম কম। এদিক দিয়েও তো আমাদের পাখা নিয়ে লাভবান হচ্ছো তোমরাও কম না। কাজটা যতটা কঠিন শুনতে মনে হচ্ছে, করাটা ছিলো তার থেকেও অনেক বেশী। তবু যাই হোক অনেক কথা কাটাকাটি, তর্কাতর্কির শেষে ভোবে সাহেবকে আনতে পারলাম আমার মতে। অর্থাৎ ওঁর বিশ্বাস আনতে পারলাম আমার যুক্তিতে। সেই যুক্তি মেনে তালওয়ার সাহেব যে টাকা মঞ্জুর করেছিলেন সেইমতন নির্দেশ গেলো এতদিনে কলকাতা অফিসে। নিঃসন্দেহ আর নিশ্চিত হবার জন্যে চিঠির একটা অনুলিপি নিয়ে চললাম আমি সঙ্গে করে।

সাড়া পড়ে গেলো কলকাতা অফিসে। মেয়ে শিল্পপতি বলে নিদারুণ বিদ্রূপ আর অবহেলায় দেখতে চাননি যাঁরা একবারও চোখ মেলে তাঁরাই যেন এবার নড়ে চড়ে বসলেন নিজেদের চেয়ারের মধ্যে। আমার যেন মনে হলো শুধু চেয়ারেই নয়, নড়লো বুঝি তাঁদের এতদিনকার বদ্ধমূল বিশ্বাসের ভিতটাই।

অসাধ্য সাধন করে এলেন মিসেস ভট্টাচার্য, একথাটা আজ মানতেই হবে। বললেন ওঁরা। এমন ঠাণ্ডা মাথায় আর ধৈর্য ধরে কাজ আদায় আপনার পক্ষে বলেই সম্ভব হয়েছে। মেয়েদের তো ধরিত্রীর ধৈর্য দিয়েছেন ভগবান। প্রশংসা শুনে হাসলাম আমি মনে মনে। হায় রে কপাল, সেখানে যাই সেখানে শুধু নিক্তির ওজনে বিচার পুরুষ আর নারী এই পরিচয়ে। শুধুমাত্র একজন মানুষের পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার অধিকার পাব আমরা কবে? আরো কত শতাব্দী অপেক্ষার পর?

যাই হোক, শ্রী তালওয়ারের দেওয়া নতুন পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আট মাস পরে খোলালাম আবার বন্ধ কারখানা। মুরারি বাবুকে সরিয়ে মার্কেটিং এর সব দায়িত্বভার নিলাম এবার নিজের হাতে।

"আপনি ব্যবসা-পত্তর কিছু বোঝেন না, টেকনিকাল কোয়ালিফিকেশান নেই, সবচেয়ে বড় কথা একজন মহিলা হয়ে ঘর ছেড়ে এইসব শিল্পোদ্যোগ করবার সখ হলো কেন হঠাৎ।' শ্রীতালওয়ারের বিদ্রূপ আর অবিশ্বাস ভরা কথাগুলো ঝমঝম করে কানের মধ্যে বেজে চলেছিলো অনবরত। হিমাদ্রিকে নতুন করে আবার দাঁড় করানোটা আমার কাছে তাই ছিলো মস্তবড় একটা চ্যালেঞ্জ। যে অভিপ্রায়ে সেদিনের সেই চ্যালেঞ্জ আমি নিয়েছিলাম মাথা উঁচু করে, তাকে যে পৌঁছতে পেরেছি আজ একটা ধ্রুব লক্ষ্যে তাতেই সার্থক মনে করি আমার সব পরিশ্রম।

এ প্রসঙ্গের জের টেনেই একটা কথা বললে আমার এই যুযুধান মনোবৃত্তির কারণটা অনেকটা পরিষ্কার হবে। আই. সি. এস. আই থেকে শ্রী এস. সিংহানিয়ার নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। দলে আমি ছিলাম একমাত্র মহিলা। আলোচনা ছিলো বিভিন্ন বিষয়ে, নানা সমস্যা নিয়ে। এরই মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী যেন বারবার চাইছিলেন আমার দিকেই বলে মনে হচ্ছিল আমার। হয়তো মনের ভুলই হবে? কিন্তু ভুল ভাঙ্গলো একটু পরেই। ফটোগ্রাফার এসে ছবি তুলতেই কিছুটা অনভ্যেস বশতঃ কিছুটা বা নেহাতই সঙ্কোচে মুখটা সরিয়ে ফেলেছিলাম ক্যামেরার নাগাল থেকে খানিকটা দূরে। লক্ষ্য করলেন শ্রীমতী গান্ধী। হাসলেন একটুখানি মৃদু হাসি, তারপর ডাকলেন আমাকে হাত নেড়ে। বললেন, 'আমার পাশে ক্যামেরার দিকে মুখ করে বসো।' ছবি তোলা হলো, তারপর আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এই উদ্যোগে কি করে এলে?' আমার মুখের দিকে চোখ রেখে হাসছিলেন একজন সার্থকনামা চরিতার্থ মানুষ, কিন্তু এক ঝলক বিদ্যুতের আলোর মতন হঠাৎ যেন আমার চোখের সামনে চমকে উঠলো একটা কথা। কংগ্রেস সভাপতির পদ পেতে, প্রধানমন্ত্রী হতে, নিজের দলের ভেতরে, দলের বাইরে বাধা পেতে হয়েছিলো তো তাঁকেও কি প্রচণ্ড। সেকথা মনে পড়ে কি রক্ত

ঝরায় বুকে তাঁর আজো ? নাহলে কংগ্রেসে Status of women committee-কে চিরস্থায়ী করবার সময় বাধা দিয়েছিলেন তিনিই তো সবচেয়ে আগে। 'নারী-পুরুষ এই দুটি সত্তা আলাদা হলেও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে। এক্ষেত্রে তাই কে কার ওপর কর্তৃত্ব করবে কিংবা কে কার নিচে বসবে এ নিয়ে তর্ক বা বিচারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না'। বলেছিলেন দৃপ্ত কণ্ঠে।

কিন্তু তবু এই তর্ক আর বিচারই তো চলে আসছে আবহমান কাল ধরে আজো। নাহলে যে মৃতপ্রায় শিশু হিমাদ্রিকে এতটা বড় করে তুলেছি আজ প্রায় একক প্রচেষ্টায়, যা দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন পাঁচজন অভিজ্ঞ মানুষ সেই হিমাদ্রি কোম্পানিরই কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মত বা পরামর্শ নিতে দ্বিধা করেন ডাইরেক্টরস বোর্ড এখনো! মিটিং-এ তাই নিজেই বসি আমি পেছনের সারিতে, আর ভাবি। ভাবি যে, মেয়েদের প্রতি এই যে একটা ভয়ানক অবজ্ঞা আর অনাস্থার ভাব এতে ক্ষতি হচ্ছে কার ? শুধু মেয়েদের না গোটা সমাজটার ?

আমার অনুভবে

শানু লাহিড়ী (চিত্রশিল্পী)

ছোট থেকেই পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল আমার ম'ার প্রচণ্ড। দাদারা পড়ত কি সুন্দর। তার জন্যে তো নানা আয়োজন। সময় ঘড়ি-ঘণ্টা বাঁধা। 'কিন্তু তুমি তো মেয়ে। মেয়ে আবার পড়াশোনা করবে কি?' মা-বাবার যত না আপত্তি তার থেকে অনেক বেশী কঠিন ঠাকমার মন আর মত। 'দুদিন পরে শ্বশুরঘরে গিয়ে হাঁড়ি-হেঁসেল নিতে হবেনা হাতে? যতদিন এ ঘরে আছ খেলনাপাতি আর পুতুল-খেলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরসংসারের কাজ শেখ। তারপর একদিন রাঙা চেলিখানা মাথায় দিয়ে যাও নিজের সংসারে নারী জীবনের সব দায়-দায়িত্বের ভার বুঝে নিতে। এরমধ্যে পড়াশোনা আর পুঁথিপত্রের কথা আসেই বা কোথায়?' কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে বুকের একেবারে মধ্যেখানে ভীরু একটা ইচ্ছে অবুঝ হয়ে ওঠে বারবার। বাড়ির লোকেদের লুকিয়ে পড়াশোনা করত তাই অবোধ নাচার মেয়েটা খাটের তলায় বসে। এর থেকে বেশী বিদ্রোহের ভাষা তো জানা ছিলনা সেদিন তাদের। বয়সও না। কিন্তু তাওতো করা গেলনা বেশীদিন। শৈশব পেরতে না পেরতেই এক গলা ঘোমটা টেনে, নিদারুণ ভয়ে দুরুদুরু কচি বুকখানা চোখের জলে ভাসিয়ে, বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে হলো একেবারে অদেখা, অজানা এক সংসারের নতুন দায়িত্ব মাথায় নিতে। এই জন্যেই তো প্রায় জ্ঞান হওয়া থেকেই তৈরি করে দিয়েছেন মা-ঠাকমা প্রতি মুহূর্তে নানা বিভীষিকার ছবি দেখিয়ে। প্রতি মুহূর্তে হাজার নিষেধের চোখ রাঙানিতে কালো করে দিয়েছেন শিশু প্রাণটার সব উচ্ছলতা। তুমি মেয়ে তাই এটা করবেনা। পরের বাড়ি যাবে তাই ওটা করতে হবে। মেয়ে হয়ে

জন্মেছ, সংসারে সকলের সেবাযত্ন করতে হবে। সকলের কথা ভাবতে হবে। বড় বড় অবোধ দুটি চোখ মেলে ছোট্ট মেয়েটি শুনেছে সেসব নিঃশব্দে। হয়তো কিছু বুঝেছে। হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মে শ্বশুরবাড়ি নামক জায়গাটিতে গিয়ে যে টুঁটি টিপে মারতে হবে নিজের যাকিছু ইচ্ছে আর অনিচ্ছের সামান্য প্রকাশটুকুও, সে শিক্ষাটা মাথার মধ্যে বসে গেছে একেবারে শক্ত হয়ে। বলতেন মা উত্তর জীবনে প্রতি কথায়।

তবু সেই সবে দশবছর বয়স থেকে শ্বশুরবাড়ি নামে ভয়ঙ্কর জায়গাটাতে শাশুড়ি-ননদের কঠিন রক্ষণায় কেটে গেলো কয়েকটা বছর অনেক চোখের জল আর বুকফাটা হাহাকার নিঃশব্দে চেপে রেখে। কারণ সেই অল্পবয়সের সঙ্কোচে ইচ্ছে থাকলেও নিজের মা-বাবাকে ডিঙ্গিয়ে আমার বাবা কোনদিন পারেননি মায়ের জীবনের মস্তবড় সাধ আর স্বপ্ন যে পড়াশোনা করা, তাতে কিছুমাত্র সাহায্য করতে। এরই মধ্যে কোলজুড়ে একে একে এলো সন্তান, আর নিজের বুকের মধ্যে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা সেইসব ভীরু সাধ আর ইচ্ছেগুলো এরমধ্যে কবে যেন, কেমন করে অস্পষ্ট হতে হতে একেবারেই মুছে গেলো একান্ত অবাস্তব একটা চিন্তার মতন।

দিনে দিনে বড় হয়ে উঠেছি আমরা আর নিজে যা পারেননি, পড়াশোনা করবার সেই অদম্য আগ্রহ মিটিয়ে নিয়েছেন মা আমাদের বোনেদেরও দাদাদের সঙ্গে সমান করে লেখাপড়া করবার সবরকম সুযোগ দিয়ে। আর শুধু পড়াশোনাই বা কেন, সেই তিরিশের দশকে কুমারী মেয়েদেরও যখন দিনের আলোয় পথে বেরোতে হলে মুসলমান মেয়েদের বোরখা ঢাকার মতন সর্বাঙ্গে ঘিরে নিতে হত ওড়নার ঘেরাটোপ, সেদিন সমাজের সব ভ্রূকুটি আর শাসনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে স্বচ্ছন্দে বড় মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার দিনের খুবই পরিচিত নৃত্যসংস্থা সেরাইকেলা দলের সঙ্গে দূর বিদেশে একেবারে সাত সমুদ্র পারের রাজ্যে। গোটা সংসার বা আত্মীয়-বন্ধু মহলে তাতে কি আলোড়ন উঠেছিল ঠিক করে মনে পড়ে না আমার এখন, কিন্তু নিজের

জীবনে এতখানি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করতে না পারার বঞ্চনাটাই বোধহয় শক্তি জুগিয়েছিল মাকে সব প্রতিরোধের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে। সেকথা বুঝতে পারি আজ কিছু বোঝার বয়সে পৌঁছে। স্ত্রীর সবচেয়ে বড় একটা ইচ্ছেকে সারাজীবন ধরে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছেন বাবা প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে তাই হয়ত অনুপায় একটা ক্ষোভ জমেছিল মনের মধ্যে তাঁরও। সেজন্যেই পরবর্তী জীবনে বাবা কখনো বাধা দেননি মা'র কোনো ইচ্ছে বা কাজে। বিশেষ করে মেয়েদের স্বাধীনতা বা উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে।

ইস্কুল কলেজের গতানুগতিক শিক্ষা থেকে দুই দাদার বেশী পছন্দ ছিল ছবি আঁকা আর তাই নিয়েই নীরদ আর কমল মজুমদার বিভোর থাকতেন প্রায় সারাদিন। আমি স্কুলে যেতাম আর মাঝেমাঝেই ওদের পাশে বসে নাড়তাম রঙ-তুলি আর এটা ওটা, আর তারই মধ্যে কবে থেকে কেমন করে অদ্ভুত এক উপলব্ধি ছড়িয়ে গেলো যেন আমারো সমস্ত অস্তিত্বে। ছবি, তুলি আর রঙ যেন ডুবিয়ে দিলো সেই শিশু মনটাকে কোন এক অধরা কল্পলোকে। এর মধ্যেই চললো স্কুলে-কলেজে লেখাপড়া অনেকটা মা-বাবা আর পারিপার্শ্বিকের চাপেই কিন্তু ১৯৪৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কালি-কলম ছুঁড়ে ফেলে চিরকালের মতন হাতে তুলে নিলাম তুলি আর রঙ। ভর্তি হলাম ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে।

বাড়িতে মা-বাবার উদার স্নেহছায়ায় মানুষ। মেয়ে বলে সেখানে অবহেলা করেনি কেউ কোনদিন। কিন্তু বাইরের জগতে কথাটাতো শুনতে হয়েছে যখন তখন। "মেয়েদের আবার এইসব ছবি আঁকা-টাঁকা কিসের? মেয়েরা পারবে নাকি এসব?" অবশ্য আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমায় এসেও সারা পৃথিবী জুড়েই মেয়েদের কথাগুলো কি শুনতে হয়না প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই?

আর্ট কলেজে ভর্ত্তি হতে অবশ্য কোনদিক থেকে বাধা আসেনি তেমন কিছু, অথচ ভালো আঁকার জন্যে ঘরে বাইরে যখন পেতে আরম্ভ করেছি নানা পুরস্কার আর সম্মান তখন প্রতিটি কাজেকর্মে,

ব্যবহারে, প্রতিকূলতা আর মেয়ে বলে সামনাসামনি সমালোচনা করতেন কলেজের অনেক অধ্যাপক। অবাক হতাম। কষ্ট পেতাম। কিন্তু তারই মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠত বিশেষ করে বসন্তবাবুর ব্যবহার। বড় ব্যাথায় আর তিক্ততায় নামটা যেন মনে পড়ে আজও এতগুলো অভিজ্ঞতা বয়সী জীবনের মাঝামাঝি এসেও। স্ত্রী-শিক্ষা শুধু নয়, স্ত্রী-স্বাধীনতাও পছন্দ করতেন না বসন্তবাবু একেবারেই তাই কারণে অকারণে উৎকটভাবে রূঢ় হয়ে উঠতেন আমার ওপর যখন তখন। ইজেল থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন প্রায় শেষ হয়ে আসা ছবি। চোখে জল এসে পড়ত কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া এই নিষ্ঠুরতায় কিন্তু শক্ত ঠোঁটের ওপর আরো শক্ত করে দাঁত বসিয়ে ইজেলের উপর চড়াতাম আমি তক্ষুনি আর একটা নতুন কাগজ। নতুন প্রতিজ্ঞায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে।

আজকাল ছবি আঁকা কাজটা তো মেয়েদের কাছে একটা রীতিমতন আনন্দ আর গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এই গৌরবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে কত যে মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের সেদিন তার হিসেব কি রাখবে না কোনো ইতিহাস?

আর শুধু কলেজের মধ্যে বসন্তবাবুরাই বা কেন? অনেক অভিজ্ঞতার কাঁটায় পা বিঁধিয়ে জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় এসে আজ তো ভিড় করে আসে কতই না স্মৃতি। তার মধ্যে যত সুখ আছে তার থেকে অনেক বেশী আছে দুঃখ বেদনা আর অপমানের জ্বালা। কিন্তু তার জন্যে এই পরিণত বয়সের প্রান্তে এসে কারুর প্রতি আমার আজ কোনো বিদ্বেষ নেই। নেই কোন ক্ষোভ। মেয়েদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আর অবিবেচক ছিল সেদিন সমাজব্যবস্থাটাই। মা, বাবা বা হৃদয়বান কারুর ইচ্ছে থাকলেও সাহস থাকতনা গণ্ডিটানা সেই সমাজটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার।

নারীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে আজ গোটা পৃথিবীটা জুড়ে। সে সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে আজো মনে পড়ে আর্ট কলেজেরই ছোট্ট একটা ঘটনার কথা। ফোর্থ ইয়ারের শেষের

দিকেই বোধহয় হবে সময়টা। সর্বভারতীয় বেশ কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছি এর মধ্যে। নাম, যশ, স্বীকৃতিও হয়েছে মোটামুটি। অনেক দূরে ফেলে আসা জীবনের পাতা ওল্টাতে বড় কষ্টের মতন মনে হয় সেদিনের ঘটনাটা। বলতে গিয়ে হাসি পায়, কিন্তু চোখের জলটাও যে ধরে রাখা যায়না তবু কিছুতেই। আজকের মতন চিত্র প্রদর্শনীর এত সুবিধে বা চল ছিলনা তখনকার দিনে। মাঝে মধ্যে কিছু উদ্যমী শিল্পী নিজেদের চেষ্টা আর পরিশ্রমে দাঁড় করাতেন এক আধটা প্রদর্শনী। এমনি এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল কয়েকজন অল্পবয়সী ছাত্রশিল্পী। আগেই বলেছি আমার কয়েকটি ছবি পুরস্কার পেয়েছে ইতিমধ্যেই, সেই সুবাদে ওরা আমার কাছে এলো দুএকটা ছবি চেয়ে। রাজি হলাম ভারি খুশি হয়ে, কিন্তু কলেজের ছাত্রী আমি তখনো, তাই অনুমতি প্রয়োজন অধ্যক্ষের। নিয়মটা জানা ছিল তাই বললাম তাদের সে কথা।

কেটে গেছে এর পরে আরো দুএকটা সপ্তাহ, হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন কলেজে এসে শুনি কোনো একজন অপরিচিত মানে কলেজের ছাত্র নয়, এমন ছেলে নাকি এসেছে কলেজে আমার খোঁজে। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী আমি তখন, কঞ্চি দিয়ে ঘেরা চারা গাছটির মতন বয়সটা তো আর নেই, তবু ঝড় উঠেছে সমস্ত কলেজটা জুড়ে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য যে কথা, তা হলো কলেজটাতে তো সহশিক্ষা। কিন্তু না, হলোই বা ছেলেমেয়েদের কলেজের ক্লাসে একসঙ্গে পড়াশোনা কিন্তু তাই বলে কি মেয়েদের ভুলে যেতে হবে শাসন আর সহবতের সব বাঁধন? নিয়ম, কানুন, সভ্যতা-ভব্যতা বলেতো একটা কথা আছে সমাজে?

সমাজ সংসারকে রসাতলের হাত থেকে বাঁচাতে কবে কে বিধান দিয়ে গেছেন, 'নারী নরকের দ্বার'। কে তিনি জানেনা হয়ত কেউই কিন্তু আজো কত শতাব্দী ধরে কতবার সূর্য উঠলো, চাঁদ ডুবলো, কত নদী কত বিস্তীর্ণ পথ পেরিয়ে পেরিয়ে মিশলো গিয়ে সাগরের

চরিতার্থতায়। শুধু অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আশ্চর্য সহজ সাবলীলতায় নিছক দুটি কথা 'তোমরা মেয়ে'।

তা সে যা হোক, ডাক পড়লো স্বয়ং অধ্যক্ষ শ্রীরমেশ চক্রবর্তীর ঘরে। কলেজে একটি অচেনা ছেলে একজন অনাত্মীয় মেয়ের খোঁজ করতে আসবে কেন এমন সপ্রতিভ ভাবে? আমি তো আগেই জানতাম ছেলেটির আসার কারণ, অধ্যক্ষও এখন জেনেছেন যে সে শুধু আমার একটা ছবির জন্যে এসেছিল তাঁর অনুমতি নিতে। তবু এত আলোড়ন? কেন?? শুধু মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে এতদিন এত অপমান আর হীনতা নিঃশব্দে সহ্য করতে করতে ঝড় তুললাম আমি এবার ঘরে বাইরে। "আমি ভাঙব প্রাচীর কারা"। বললাম এতদিনে শক্ত গলায়। বললাম আমাদের ঘরে ঘরে ঠাকমা দিদিমায়েরা গঙ্গা স্নান করতে যেতেন চারদিকে দরজা ঘেরা পালকির মধ্যে বন্ধ হয়ে। চার কাহারে মিলে গঙ্গার পবিত্র জলের মধ্যে ডুবোতো পালকি শুদ্ধ 'মেয়েমানুষটা'কে। অথচ সেইসব সতী-সাধ্বীদের পতিদেবতারা নিঃসঙ্কোচে, অবলীলায় ঘরে ফিরতেন সুঁড়িবাড়ি বা আরো কোনো নিষিদ্ধ পল্লী থেকে রাত শেষ করে। তারও কয়েকটা যুগ পরে মায়েদের পড়াশোনা করতে হয়েছে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে। কেন এই বৈষম্য? কবে, কার অমোঘ নির্দেশে? এতদিন ধরে কি মঙ্গল বয়ে এনেছে তা আমাদের জীবনে?

সেই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের সামনে, ঋজু সত্যের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। নিজের ভুল স্বীকার করলেন অধ্যক্ষ নরম গলায়। তারপর এসেছে কাজের দিন। এরমধ্যে আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়েছি পাস করে তারপর শুরু হয়েছে শুধু কাজ। পিপাসার জলের মতন, সুস্থ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতন যা সহজ স্বচ্ছন্দতায় এক হয়ে মিশে গেছে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে। এসেছে পুরস্কারের পর পুরস্কার আর প্রশংসা দেশদেশান্তর থেকে কিন্তু মন তো তবু ভরে না। সামনে বহুদূর পথের হাতছানি কিন্তু সে পথ যে বড় বন্ধুর। ছেলে আর মেয়ে বলে চিরকালের এই যে একটা

অন্ধ বৈষম্য এর বিরুদ্ধে জেহাদ করেছি ক্ষণে ক্ষণে কিন্তু আবার জীবনের প্রয়োজনে মেনেও নিয়েছি বা নিতে হয়েছে তা বারবার। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে মহাকালের অর্ধনারীশ্বর রূপটিই কি তবে সত্য চিরকাল ?

এরপর জীবনে আবার এলো পালা বদলের দিন। এতদিনের সব জানা অজানাকে ছাপিয়ে এলো প্রেম। নেশায় পেশায় মানুষটি অবশ্য একেবারে অন্য জগতের। তবে চেষ্টা করে যে জীবনের একেবারে ভিন্ন দুই ক্ষেত্র থেকে এসেছি দুজনে তা নয়। প্রেম এসেছে স্বাভাবিক-ভাবেই তাই আমার রঙ তুলির জগত কোনদিন ছায়া ফেলেনি তাঁর অফিসঘরের কড়িবরগা পেরিয়ে। আমারও কাজে বাধা দেননি তিনি কোনদিন জেনেশুনে বা ইচ্ছে করে। কিন্তু তবু আজ জীবনের অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসে সময়কে নিরপেক্ষ বিচারকের আসনে বসিয়ে যদি ওঠে সওয়াল জবাবের সূক্ষ্ম বিচার, তবে নিজের কথা বলতে গিয়ে তো স্বীকার করতেই হবে যে, কর্মক্ষেত্র আমার কলকাতা হলেও স্বামী যখনই বদলি হয়ে গেছেন কলকাতার বাইরে তখন সবকিছু ছেড়ে আমাকেও তাঁর অনুগামী হতে হয়েছে নির্বিচারে। না, নিজের ইচ্ছের কোনো দাবী চাপিয়ে দেননি তিনি কোনদিনই আমার ওপরে, কিন্তু আমার সংসার ঘিরে এসেছে তখন সন্তান। স্বামী-সন্তান ঘেরা একটি সংসারে স্নেহ আর কর্তব্যের শতপাকে বাঁধা এক গৃহিণী তখন আমি। স্ত্রী আর মা, নারীসত্তার এই দুটি ধারার জোয়ারে কি বারবার ভেসে গেছে আমার শিল্পী সত্তাটা ? হবেও বা। কি জানি।

কলকাতা ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে হয়েছে তাঁর কর্মক্ষেত্রে কিন্তু তবু হাত থেকে ছাড়তে পারিনি তো রঙ-তুলি। একটি সংসারের গৃহিণী, দুটি সন্তানের মায়ের, সংসারে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও থাকে অসংখ্য কাজের দায়। তবু তার মধ্যেই সময় করে নিতে হয়। প্রসঙ্গের জের টেনে মনে এসে পড়ে যে, আমারই সতীর্থ পুরুষ শিল্পীরা যখন কাজ করেন নিজের স্টুডিওতে তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি তাঁকে কোনো কারণেই বিরক্ত করার কথা চিন্তাই

করতে পারে না কেউ তখন। বাড়ির বয়স্কজনেরা তো নয়ই, একান্ত শিশুটিও অতি সহজে শিখে ফেলে যে বাবা কাজ করছেন। এখন চলাফেরা করতে, কথাবার্তা বলতে হবে আস্তে আস্তে। অথচ মা? তা তিনি শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক যাই হোন না কেন, বাড়ির দাসদাসীরও অবাধ স্বাধীনতা যখন তখন তাঁর কাজের ঘরে ঢুকে তেল, নুন, লঙ্কার কথা জিজ্ঞেস করবার। নাহলে সংসার চলবে কেমন করে? যাইহোক, আমিও সময় করে নিয়েছি এরই মধ্যেই। আর তেমনি সময় করে নেওয়া অবসরে এসে দাঁড়ায়েছি নিজের স্টুডিওতে ইজেলের সামনে। মোটা দাগের পৃথিবী ছেড়ে মুহূর্তে মন উধাও হয়েছে বিমূর্ত এক কল্পরাজ্য। সেই ভরা মন নিয়ে হয়তো সবে রঙ চড়িয়েছি ক্যানভাসে। কিন্তু ফিরতে হয়েছে। স্বামী প্রভাতচন্দ্র বেশ বড় সড় মাপের মানুষ হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ামে। অফিসের কাজে বা শিষ্টাচারের প্রয়োজনে প্রায়ই বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে হয়েছে গণ্যমান্য পাঁচজনকে সকাল বিকেল বা সন্ধ্যের যে কোনো সময়ে। হাতের রঙ-তুলি নামিয়ে রেখে অনেক দূরের এক পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়া মনটাকে আবার ফিরিয়ে এনে হাসিমুখে বসেছি অতিথিদের সামনে গৃহকর্ত্রীর সবটুকু কর্তব্য নিয়ে। তবু অন্য এক জগৎ থেকে ফেরা সেই মুহূর্তে আমার আচারে ব্যবহারে, অতিথি আপ্যায়নে ফাঁক থাকেনি এতটুকু। আর সেই শান্ত হাসিমুখের দিকে চেয়ে স্বামীও কোন দিন বুঝতে পারেন নি বুকের মধ্যে তখন কেমন করে এক নাগাড়ে রক্ত ঝরিয়েছে মাথা কোটা শিল্পী পাখিটা।

না, স্বামীর যে আমার শিল্পী সত্তার ওপর কোনো সহানুভূতি ছিলনা তা মোটেই নয়। কিন্তু তবু সেই কবে, কত হাজার বছর আগে অন্ধ স্বামীর প্রতি আনুগত্যে নিজের চোখে কষি বেঁধে রুদ্ধ করেছিলেন গান্ধারী নিজের চোখের আলো। সেই কষি যে বিধাতার অমোঘ বিধানের মতন শক্ত হয়ে বাঁধা হয়ে আছে গোটা নারী সমাজটার ওপর আজো। ঠাকুমা-দিদিমা নয়, আমার নিজেরই আজন্ম সংস্কার আর অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি অহরহ চেয়ে থেকেছে আমার

বুকের মধ্যে শাসনের ভ্রুকুটি তুলে। শিল্পী শানুকে তাই বারবার হার মানতে হয়েছে গৃহিণী শানুর কাছে। জানিনা এটা আমার পরাজয় কিনা। আসলে চিরকালের অভ্যস্ততার ধারায় ভাবিইনি সেকথাটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।

সেসব আশা-নিরাশার অনিশ্চিত দিন অতীত হয়ে গেছে আজ। আর এই পরিণত বয়সে অভিজ্ঞ চোখ নিয়ে সেই অতীতের দিকে আবার ফিরে দেখতে গিয়ে মনে হয় আমার ঘর-গেরস্থালী আমার শিল্প মানসের ওপর তেমন করে ছায়া ফেলতে পারেনি যেমন সেদিন তেমনি আজো। আজো নিজের আলোয় পথ খোঁজা এক জোনাকির মতন অতীত ভুলে কাজ করে চলেছি ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে ভবিষ্যৎ শিল্পী গড়ার কাজে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভারও নিয়েছি বুঝি এই চিন্তারই গভীর একটা প্রতিফলন মনে নিয়ে। কিন্তু এখানেও শক্ত একটা প্রশ্নের মতন সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল চিরন্তন সেই সমস্যা। শিল্পী যত বড়ই হোক তবু একজন মেয়ে হয়ে নিতে পারবে কি এতবড় একটা দায়িত্ব ভার? দ্বিধায় বিভক্ত কর্তৃপক্ষ। অশান্ত ছাত্রকুল।

রবীন্দ্রভারতী তখন জর্জরিত নানারকম সমস্যায়। ছাত্র বিক্ষোভে প্রায় বন্ধ হতে চলেছে পড়াশোনা। এমন একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে একজন মহিলা বিভাগীয় প্রধান হাল ধরতে পারবেন কতখানি শক্ত হাতে আর দক্ষতার সঙ্গে এই দ্বিধাই ছিল বুঝি সকলের মনে। ছাত্ররাও প্রথমে মেনে নিতে চায়নি এই ব্যবস্থা সহজে, খোলা মনে। কিন্তু পরিবর্তন এসেছে দিনে দিনে। বিপথগামী ভ্রান্ত সন্তানের প্রতি মায়ের যে মমতা, সেই মমতা আর স্নেহ নিয়ে এগিয়ে এসেছি আমি ছাত্রদের সামনে প্রসন্ন খোলা মনে। পরিচ্ছন্ন যুক্তির বিচারে দিনে দিনে ভেঙেছে ওদের ভুল আর অল্প অল্প করে সুস্থ আলোচনায় সরে গেছে এতদিনের জমে থাকা ক্ষোভ। অকৃত্রিম স্নেহ প্রীতি আর পারস্পরিক এক বিশ্বাসের বোধে এখন এখানে তৈরি হচ্ছে সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতন কতগুলো খাঁটি শক্ত মানুষ।

এর থেকে বেশী চাইবার ছিলনা তো জীবনে আর কিছু কিন্তু কর্তব্যের কিছুটা বুঝি বাকি থেকে যাচ্ছিল তবুও। একটি পরিবারের কন্যা, বধূ আর সব কর্তব্যের দায় নেওয়া এক সংসারের কর্ত্রী হয়েও একজন শিল্পী হিসেবে জীবনের একটা দিক ধরে থাকতে চেয়ে আমি তো বুঝেছি যে, একটি মেয়েকে নিজের ধ্রুব লক্ষ্যে সোজা চলবার অধিকারটুকু আদায় করে নিতে আজও কতখানি যুদ্ধ করতে হয় শুধু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গেই নয়, মাঝে মাঝে নিজের পরিবার পরিজনের সঙ্গেও। তাই শুধু নিজের জগতে আর জীবনে একটা ঈপ্সিত সার্থকতায় পৌঁছেও মনের মধ্যে ক্রমাগত চলেছে এক দ্বন্দ্ব।

অনেকদিন ধরে ভেবেছি শুধু আমাদের সমাজই কেন, গোটা পৃথিবীটাই যে চিরটাকাল ধরে পুরুষ-শাসিত একথা তো অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। জীবনের সব দিকে তা সে সাহিত্য হোক, শিল্প হোক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, মেয়েদের পদক্ষেপ আজও একান্তভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আছে নানারকম কারণে। কত প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু একটুখানি সুযোগের অভাবে। প্রতিদিন চোখের সামনে যা দেখছি বা উপলব্ধি করছি তার জন্যে করতে তো ইচ্ছে করে কত কিছুই, কিন্তু তার সবটুকু করবার চেষ্টা আমার এক এবং ক্ষুদ্র শক্তিতে তো সম্ভব নয়। আমাদের চিত্রশিল্পে মেয়েদের আনাগোনা যেখানে এমনিতেই কম, সেখানে শুধু মেয়ে বলেই আজও অহেতুক কতগুলো বাধার সামনে থেকে যাতে তাদের ফিরে যেতে না হয় তাই গড়ে তুলেছি 'দি গ্রুপ সংস্থা।'

প্রতিযোগিতা নয়, কোনো যুদ্ধ ঘোষণাও নয়, শিল্পকে ভালবেসে একটা শিল্পীসত্তার চরিতার্থতার পথটুকু ধরে এগিয়ে চলবার জন্যে সাহায্য করতে চাই এক সহজ হার্দিক সম্পর্ক মেনে নিয়ে। জানিনা এতেও সফল হব কতটা, তবে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মস্তবড় দায়িত্বের এই বোঝা দুহাতে তুলে নিয়েছি যে ইচ্ছে আর ঐকান্তিকতা নিয়ে তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি আর সবার ওপরে শিল্পের প্রতি এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে সব চেয়ে বড় কর্তব্য।

খেলতে গিয়ে

শান্তি মল্লিক (ক্রীড়াবিদ্)

ভারি সুন্দর রাংতা মোড়া মস্ত বড় গোড়ের মালাটা পরিয়ে দিলো ওরা আমার গলায়। অজস্র হাততালি, ক্যামেরার মুহুর্মুহু ক্লিক, ক্লিক। সব মিলিয়ে দারুন উত্তেজনা ফুটবলে আমার অর্জুন পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে। উত্তেজনা ছড়িয়েছিলো আমারো বুকের মধ্যে। খুশি মনে-প্রাণে। ভেবেছিলাম আমার এই স্বীকৃতি সমস্ত বাংলার মেয়েদের খেলার মাঠে একটা জায়গা করে দেবে। পথ সুগম হবে অনেকটা। কাটবে কিছুটা বাধা-বন্ধ। কিন্তু নাঃ, কিছুদিনের মধ্যেই বদলাতে হয়েছে আমাকে সে মত। বাংলার ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েরা সেদিন যে অন্ধকারে ছিলেন, আজোও আছেন সেখানেই। আমার এই সর্ব-ভারতীয় স্বীকৃতি বা সম্মান পরিবর্তন আনতে পারেনি সেখানে এতটুকু। অন্যান্য রাজ্যে মেয়েদের খেলার জন্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন তো বটেই, রাজ্য সরকারও সাহায্য আর উৎসাহ দেন কত রকমভাবে, অথচ আমাদের বাংলার মেয়েদের নিজেদের একটা ক্লাব বা সামান্য একটা 'টেন্ট'ই নেই আজো! ফুটবলের মতন একটা খেলায় নিয়মিত অনুশীলন করতে হয় আমাদের রেলওয়েজ ক্লাবের মাঠে। ওরা যখন খেলা প্র্যাকটিস করে তখন ছেড়ে দিতে হয় আমাদের মাঠ। মাঠ ছাড়লেও খেলা, অর্থাৎ প্র্যাকটিস তো আর ছাড়া যায় না, তাই তখন আমরা সরে আসি পাশে, নর্দমার ধারে। ওখানে ঐ পরিবেশেই চলে সাধনা! এই অবহেলা আর অবজ্ঞা কি শুধু আমরা মেয়ে বলেই? মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যে দেখেছি ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প সিলেকসান হয়। হয় না শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে! আরতি দিকে (ব্যানার্জি, শ্রীপি. কে. ব্যানার্জির স্ত্রী) এ সম্বন্ধে বারবার বলেও কোনো লাভই হয়নি। হয় তো ইচ্ছে থাকলেও একক প্রচেষ্টায় কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না

ওঁর পক্ষে। নাহলে ন্যাশানালের জন্যে টিম সিলেকসান হয় অন্যদের মাঠে। যেখানে 'অর্জুনের' মতন সম্মান পশ্চিমবাংলায় এনে দিয়েছি আমরা মেয়েরা। তবুও! আর একটা মজার ব্যাপার হলো, মেয়েদের খেলাধুলোর যে কোনো সংগঠনে কর্মকর্তা কিন্তু সব পুরুষ! কেন, প্রশ্নটা বারবার মনে ধাক্কা দিলেও এতে আপত্তি তেমন কিছু থাকত না যদি মেয়েদের সংগঠনটা চলত সত্যি করে সুষ্ঠুভাবে। চলবে কেমন করে? পুরুষ কর্মকর্তারা মুখে যতই বড় বড় গালভারি কথা বলুন মনের মধ্যে তো তাঁদের বাসা বেঁধে আছে মেয়েদের প্রতি চিরকালের অবজ্ঞার ভাব। 'আরে ছাড়োনা, মেয়েদের তো ব্যাপার,' এই ধরনের মনোবৃত্তি বা চিন্তাধারা নিয়ে কি আর একটা সংগঠন চালানো যায় ঠিক মতন? যায় না। অন্তত আমাদের পশ্চিমবাংলার মেয়েদের খেলার মাঠে এর নজির তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় হাজারটা। প্রথমেই ধরা যাক না টাকার ব্যাপারটা। অন্য খেলার কথা তো আছেই, কিন্তু সর্বভারতীয় অর্জুন পাওয়া মেয়েদের ফুটবল টিমের কথাই বলি। প্রচণ্ড অভাব আমাদের টাকার। 'স্পোর্টর্স কাউনসিল' দেয় অবশ্য কিছু কিছু, অল্প স্বল্প মায়াদয়া করে। বাকিটা আমরা তুলবার চেষ্টা করি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে। কিন্তু যে মনোভাব আর তৎপরতা নিয়ে একটা 'ফোর্থ ডিভিসন' ক্লাবের কর্মকর্তারা মাঠে খেলা নামান, যার জন্যে যতটা দর্শক সমাগম হয় তাঁদের খেলায়, তার দশ ভাগের এক ভাগও দেখানো হয় না আমাদের মেয়েদের কোনো প্রদর্শনী খেলার বেলায়। কোনো দিকে কোনরকম তৎপরতার তো প্রশ্নই নেই, একটা খেলার জন্যে যেখানে যতটুকু প্রচার প্রয়োজন সেটুকুই কি আমাদের খেলার দিন দিয়ে থাকেন আমাদের কর্মকর্তারা? দেন না। কেন দেবেন? এটা তো মেয়েদের খেলা। একেবারেই এলেবেলে ব্যাপার একটা। মেয়েগুলো খেলতে চাইছে, দাও না হয় মাঠে একটু দৌড়োদৌড়ি করতে। নেহাতই একটি শিশুর প্রতি অভিভাবকের সকৌতুক উদাসীনতার ভাব। ফলে ঠিকমতন প্রচারের অভাবে আমাদের

খেলার দিন দর্শকই পাওয়া যায় না তেমন তার আবার টিকিটের টাকার প্রশ্ন। টাকা ওঠে না। আমাদের নিজেদের সংগঠন বলতে যা, সেখানেও তো বারোমাস ভাঁড়ে মা ভবানী বিরাজ করেন। ফলে ছেলেদের বড় ডিভিসানের কথা তো চিন্তার মধ্যেই নয়, সাধারণ একটা 'ফোর্থ ডিভিসান' ক্লাবও তাদের খেলোয়াড়দের যা টাকা দেয় তারও তো একটা ধরাবাঁধা ছক আছে। ধরন আছে। অর্থাৎ একটা খেলার পুরো মরসুমে পাওনা আছে। আর আমাদের? আমাদের ব্যবস্থা দিন মজুরির। রোজকার খেলার রোজকার পাওনা। তারো অঙ্কটা বলতে লজ্জা করে এমন! গোটা পৃথিবী জুড়েই পুরুষ আর নারী শ্রমিকের মজুরি নিয়ে চলেছে তো বোধহয় এই দ্বন্দ্ব। একই মেহনৎ করে পুরুষ শ্রামক থেকে নারী শ্রমিক পায় কম পয়সা। কারণ পুরুষ শাসক, নারী শাসিত। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে চলে আসা এই সংস্কার জগদ্দল একটা পাথরের মতন অনড় হয়ে বসে আছে আমাদের খেলার মাঠেও। মাথা নিচু করে মেনে নিতে হয় সবকিছু। নাহলে যদি ভেঙ্গে যায় সংগঠন। মুখ খুললে যদি না জায়গা পাওয়া যায় টিমে। সবে ধন নীলমণি একটা বৈ তো মেয়েদের আর টিম নেই। আর দুঃখের শেষ কি শুধু এখানেই? এতো তবু বাইরের বাধা আর অসুবিধে। কিন্তু ঘরের যে বাধা বেঁধে রেখেছে মেয়েদের চিরটাকাল ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে তার ফাঁস যে কি কঠিন সে কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করতে হয় যে কোনো পেশাদার খেলোয়াড় মেয়েকে বিশেষ করে। আমাদের দেশের মেয়েদের আজো চলতে হয় চিরটাকাল ধরে চলে আসা সেই গতানুগতিক ধারায়। স্কুল-কলেজ থেকে পাসটাস করে বিয়ের পিঁড়িতে বসা, নাহলে বড়জোর স্কুল-কলেজে পড়ানো বা ডাক্তার হওয়া। তবু যেন অনেকটা সহজ এই পথটা। এর বাইরে কিছু করতে গেলেই নানা রকম নিষেধের ভয়ানক সব চোখ রাঙানি, যার মূলে শুধু কিছু অন্ধ সংস্কার বা নেহাতই অজ্ঞতা। আমার জগত মাঠকে ঘিরে তাই মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে খেলার কথাই এসে পড়ে আগে। এইতো

একটা গোটা শতাব্দী পুরো হয়নি বোধহয় এখনো, মানুষের বিশ্বাস ছিলো লেখাপড়া করলে মেয়ে বিধবা হবে। কি ভয়ঙ্কর কথা। মানুক না মানুক, বিশ্বাস করুক না করুক, এতবড় ভয়ানক একটা কথা শোনবার পরও কার বুকের কতবড় পাটা হবে, মেয়েকে লেখাপড়া করিয়ে একবার পরখ করে দেখতে যে কথাটা কতখানি সত্যি? মেয়ে লেখাপড়া করবেনা চাকরি-বাকরিরো তাই কোনো প্রশ্ন নেই। তাহলে একমাত্র বিকল্প পথ বিয়ে দিয়ে তাকে পার করা। আর তা যখন করতেই হবে তখন পরের বাগানের গাছ নিজের উঠোনে বাড়তে দিয়ে আর লাভ কি? বিদেয় করো তাকে চারাতেই। কি অসীম ধৈর্য্য আর পরিশ্রমে ভগিনী নিবেদিতা চিড় ধরালেন তাদের আজন্মের সেই অন্ধ সংস্কারে, সে কাহিনী জানা আমাদের সকলের। গোটা একটা শতাব্দী লেগে গেলো মেয়েদের সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে এইটুকু আলোর পথে আসতে। এইটুকু বললাম কারণ পদে পদে নিষেধের ভ্রূকুটি মেয়েদের চলার পথ সংকীর্ণ করে রেখেছে তো প্রায় সেই উনিশ শতকের মতন আজো। মেয়ে তেরো বছর বয়সে পড়তে না পড়তেই বন্ধ করে ফেলা হয় তাকে চার দেওয়ালের মধ্যে আজো। 'ছিঃ' আর 'না'-এর গণ্ডি টানা জীবন-বৃত্ত। এমনি করতে হয়না তুমি মেয়ে। অমনি করলে লোকে নিন্দে করবে।' এমন যেখানে অভিভাবকের মানসিক অবস্থা আজো, সেখানে যৌবনোচ্ছল একটি তরুণী মেয়েকে মাঠে দৌড়ো-দৌড়ি করতে দেবার চিন্তাতেই তো কপাল চাপড়াবেন তাঁরা সভয়ে সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে। খেলার মাঠে মেয়ে পাইনা তাই আমরা খুঁজে পেতে। প্রথম কারণ খেলতে গেলে আদ্দিকালের সাড়ি অভ্যেস ছেড়ে প্রথমেই পড়তে হবে মেয়েকে সর্টস আর সার্ট। কি সর্বনাশ। তার ওপর লেখাপড়া করলে মেয়েরা বিধবা হয় এই অন্ধ সংস্কারের মতন 'ফুটবল খেললে মেয়েদের শারীরিক এমন ক্ষতি হয় যে তাতে সন্তান ধারনের ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়', যুক্তিহীন ভীত্তিহীন এই গুজব কেমন করে কার কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ে, ভয় হয়ে বাসা বেঁধেছে অভিভাবকদের মনের মধ্যে। হবে নাই

বা কেন? এমন ভয়ঙ্কর একটা কথা শোনার পরও কোন সাহসে কে মেয়েকে এগিয়ে দেবেন এই পথে? আর লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হয় কিনা পরখ করে দেখবার সাহস যেমন কোন-দিন কারুর হয়নি, তেমনি ফুটবল খেললেও সত্যিই যে মেয়ের কোনরকম শারীরিক ক্ষতি হয় না, হতে পারেনা, সে প্রমাণ নেবার সাহস থাকবে আর কজন অভিভাবকের? ভাগ্যগুণে সে সাহস ছিল আমার বাবার। খেলা-পাগল মানুষ। জীবনে খেলার থেকে আর কিছু বেশী ভালবেসেছেন বলে আমরা জানিনা। মাও একেবারে ঠিকমতন সহধর্মিণী সেদিক থেকে। আমি আজ জীবনে যদি কিছু হতে পেরে থাকি, যতটুকু যা হয়েছি, সব আমার মা-বাবার জন্যেই। একেবারে সাধারণ বিত্তের মানুষ বাবা। চাকরি অতি সাধারণ। ফলে আমাকে খেলতে দিতে গিয়ে এদিক ওদিক করতে হয়েছে সংসারের অনেক কিছু খরচাপত্রের। বাড়ির গিন্নী হয়ে মা সে অসুবিধের জন্যে মুখ কালো করেননি একটি দিনের জন্যেও। সামান্যতম দ্বিধা নিয়ে থমকে দাঁড়াননি বাবা একবারও। নিজের ঘরে এত উৎসাহ আর প্রশ্রয় পাওয়া সত্ত্বেও খেলার মাঠে এগোতে গিয়ে নানারকমভাবে বাধা পেয়েছি ক্রমাগত। সে দুঃখ আর ক্ষোভের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ করা যাবে না মহাভারতের মতন একটা বই লিখেও। যেমন খেলায়, বিশেষ করে যে সব খেলা আগেকার দিনে ধরা হত শুধু ছেলেদের খেলা বলে, সেই ধরনের খেলায় উৎসাহ নাকি ছিল আমার বেশী, শুনেছি বড়দের কাছে। আট বছর বয়সে ছাতের ওপর বল নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করতে গিয়ে পড়ে গেলাম নিচে। আর উপায়ন্তর না দেখে বাবা নিয়ে গেলেন ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাবে হ্যাণ্ডবল খেলতে। মেয়েদের ফুটবল খেলা তখনো আসেনি মাঠে। কিন্তু তাতে কোনো দুঃখ নেই। আমি তখন মেতে উঠেছি হ্যাণ্ডবলেই। তিন/চার মাস প্রশিক্ষণ নিতে না নিতেই কোচ হরিদাসবাবু আমার 'পান্‌চ্‌' দেখে এত খুশি হলেন যে তক্ষুনি নিয়ে নিতে চাইলেন আন্তর্প্রদেশ খেলার টিমে। কিন্তু বয়স কম বলে

রাজী হলেন না কর্মকর্তারা। কাটলো আরো দুটো বছর। দশ বছর বয়স তখন, ডাক এলো রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলবার জন্যে। খেললাম আর হ্যাটট্রিক করলাম ছ/সাত বারের চ্যাম্পিয়ানের বিরুদ্ধে। জানিনা কাকতালীয় কিনা তবে শুনি যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হ্যাণ্ড বলে আমার এই সাফল্যই নাকি কর্মকর্তাদের ইচ্ছে জাগালো মেয়েদের ফুটবল টিম তৈরি করতে। হোয়াইট বর্ডার ক্লাবের কালুদা খেলা দেখে চাইলেন আমাকে মাঠে নামাতে। ১৯৭৫ সালের জুন মাস সেটা। আরতিদির (ব্যানার্জি) ওপর ভার পড়ল টিম তৈরি করবার। টিম তো তৈরি হবে কিন্তু মেয়ে কই? আমার ধারণা অভিভাবকরা মেয়েদের শুধু লেখাপড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত গান থেকে নাচ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন খানিকটা স্বচ্ছন্দভাবে। কিন্তু তাই বলে ষোলো/সতেরো বছরের মেয়ে খাটো সর্টস আর সার্ট পরে নেচে বেড়াবে মাঠে, দলের সঙ্গে যাবে এদেশ—ওদেশ, তারপর বিয়ে হবে সে মেয়ের কোনদিন? এইখানেই তো কথা। মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারে ছেলে-মেয়ে জন্মালে বাবা-মার চিন্তাধারা বইতে থাকে ভিন্ন ধারায়। ছেলেকে মানুষ করতে হবে এমন শক্ত-পোক্ত করে যাতে উত্তর জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে সহজেই। তার ওপর ছেলের যে চাকরি বা রোজগারের জন্যে চিন্তা সে জন্মানোর সঙ্গে থেকেই, ভালো খেলতে পারলে সেই চাকরি আজকাল পাওয়া যায় অতি সহজে। এই দুই চিন্তা মিলে মিশে এক হয়ে উৎসাহিত বা আরো একটু বেশী বললে বলা যায় যে, এই চিন্তাটাই ছেলেকে খেলতে দিতে অনুপ্রাণিত করে অভিভাবকদের আজকাল অনেক বেশী। মেয়েদের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় একেবারে উলটো। পরিবারে একটি মেয়ে-সন্তান জন্মানোর সঙ্গে থেকেই বাবা-মা'র চিন্তা (দুশ্চিন্তা?) থাকে মেয়ের বিয়ের। মেয়ে হয়ে জন্মেছে আজ হোক কাল হোক তাকে পাঠাতে হবে পরের ঘরে। ফলে একেবারে ছোটবেলা থেকে তাকে এমন ভাবে মানুষ করে তোলা হয় যাতে সে সব রকমে

গ্রহণীয় হয়ে ওঠে একেবারে অপরিচিত একটা পরিবারে। সবদিক দিয়ে অপরিচিত কতগুলো মানুষজনকে জানতে হবে, মানতে হবে নিজের বলে। ফলে প্রথম থেকেই মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয় নরম হতে। অর্থাৎ জীবনের পথে চলতে গিয়ে যা কিছু প্রতিবন্ধকতা সব মেনে নাও নিচু হয়ে। মেয়েরা এইরকম হতে পারলে, অর্থাৎ পরিবারে পাঁচজনের দশরকম ইচ্ছে নির্বিবাদ প্রসন্নতায় মেনে নিতে পারলে মস্তবড় 'সার্টিফিকেট' পাওয়া যাবে 'সুশীলা' বলে। তো তেমনি একটি সুশীলা তৈরি করাটা যেখানে মা-বাবা'র আদর্শ, সেখানে মেয়েকে মাঠে দস্যিমি করতে পাঠাবেন তাঁরা কোন প্রাণে? মেয়েদের খেলার কথায় তাই আপত্তি ওঠে চারদিক থেকে ভয়ানক ভাবে। মেয়ে পাওয়া যায় না। যেমন পাওয়া যায়নি সেই প্রথম ফুটবল টিম গড়ার সময়! যাই হোক সবাই মিলে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে খুঁজে পেতে যোগাড় হলো ষাটটি মেয়ে। নিজেদের কোনো মাঠ নেই (আজো নয়), টিম সিলেকসান হলো তাই পরের মাঠে ষোলজন মেয়ে আমরা তৈরি হলাম সর্বভারতীয় খেলায় যোগ দিতে। খেলা লক্ষ্নৌ-এ। কোচ শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য। চারদিকে এত অসুবিধে আর অসহযোগিতা সত্ত্বেও দারুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঙ্গে ফুটবল খেলা শুরু করে খেললাম কয়েক বছর একটানা। এর মধ্যেই ভর্তি হয়েছি স্কুলে কিন্তু খেলার নিয়মিত অনুশীলন আর ক্রমাগত কলকাতার বাইরে এদিক ওদিক যাবার ফলে এগোতেই পারলাম না সেদিকে তেমন করে। এমনকি মাধ্যমিক পরীক্ষার কয়েকদিন আগেই যেতে হলো ব্যাংকক। পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না। পুরুষ খেলোয়াড়েরা এই ক্ষতিকে ততটা ক্ষতি বলে মনে করেন না, কারণ তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক ভালো খেলতে পারলে, অর্থাৎ খেলার জগতে নাম হয়ে গেলে বড় বড় সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান টেনে নিতে চান তাঁকে বেশ বড়সড়, গালভারি মাথাভারি চাকরি দিয়ে। অথচ আশ্চর্য কথা যে, মেয়েরা বঞ্চিত আজো সে সুযোগ থেকে। বল নিয়ে খেলতে ভালবাসতাম, কিন্তু একমাত্র

হ্যাণ্ডবল ছাড়া মেয়েদের জন্যে তখন ব্যবস্থা ছিলনা আর অন্য কোনো খেলার। উপায়ন্তর না দেখে বাবা ভর্তি করালেন হ্যাণ্ডবলেই। এখানেও একটা কথা বললে খুব বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পশ্চিম-বাংলায় হ্যাণ্ডবলে পুরুষের থেকে মেয়েরা ভালো খেলে, তা সত্ত্বেও মেয়েদের নিজেদের কোনো সংগঠন নেই। কর্মকর্তারা সবাই পুরুষ মানুষ। আমার ধারণা বাংলার খেলার মাঠে আর তারপর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশী উৎকর্ষ দেখানো সত্ত্বেও যে মেয়েরা আজো বঞ্চিত খেলোয়াড় হিসেবে সব সুযোগ আর সামান্য মাত্র সুবিধে থেকে, তা এইসব পুরুষ কর্মকর্তাদের মেয়েদের প্রতি চিরকালের অবজ্ঞা আর উদাসীনতার ফল। যেমন খেলা, তা সে যাই হোক ভালবাসি আমি আন্তরিকভাবে, কিন্তু তবু ফুটবল হলো আমার প্রথম প্রেম। শ্রীঅসীম গাঙ্গুলী হকির কোচ। আমার ফুটবল খেলা দেখে বারবার ডাকতেন হকি খেলতে, কিন্তু ফুটবলের মাঠ ছেড়ে হকি স্টিক ধরতে ইচ্ছে করত না বিশেষ। এর মধ্যেই পোস্ট অফিস থেকে অবসর নিলেন বাবা। টাকার দরকার। অর্থাৎ এবার আমার প্রয়োজন সংসারে আর্থিক কিছু সাহায্য করার। আমার খেলা—পাগল বাবা আর অতি সংবেদনশীল মা বলেননি সেকথা একবারও মুখ ফুটে। কিন্তু নেহাতই বাস্তব সত্যটা তো অজানা নয় আমার। আর্থিক সাহায্য মানে একটা চাকরি চাই। সত্যি কথা বলতে কি, সর্বভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে আমার নামটা তখন বহু উচ্চারিত। অর্জুনের সম্মান এনে দিয়েছি আমি আমার রাজ্যকে। অথচ আমার এই ভয়ঙ্কর প্রয়োজনের দিনে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন না কেউই। অর্থাৎ সরকার বা বাণিজ্যিক কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই পুরুষ খেলোয়াড়দের মতন লাল কার্পেট পেতে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, ডাকলেন না কেউ একবার হাতছানি দিয়েও। এসবই আমি একজন মেয়ে হয়ে জন্মে ফেলার অপরাধেই কি? ক্ষোভে, দুঃখে যখন একেবারে বিপর্যস্ত মনের অবস্থা তখন শুনলাম যে, হকি খেললে চাকরি হবে। বন্ধ করলাম ফুটবল। জীবনের উজ্জ্বলতম একটা

অধ্যায়কে ভুলে, ফুটবল মাঠ ছেড়ে এতকাল পরে হাতে তুলে নিলাম হকি স্টিক। বুক ভেঙ্গে গেলো। তবুও। আর কিছু নয়, 'মেয়ে' তো। জ্ঞান হবার সঙ্গে থেকেই তো দেখে আর শুনে আসছি যে মেয়েদের সবকিছু মেনে নিতে হয় নরম হয়ে। শান্ত মনে। না, আমার বাড়ির কেউ কোনদিন উচ্চারণ করেনি এই কথা। কিন্তু শুনতে হয়েছে। কথায় কথায় মাঠে কেষ্ট-বিষ্টু, নামী-দামী মানুষজন বলেছেন, 'এতেই অনেক হবে। একজন মেয়ে হয়ে যে 'এতটা' পাচ্ছ তাই যথেষ্ট।' অনেক সময় হাসি-মস্করার ছলেই অনেকে বলেছেন, 'আরে বাবা খেলা খেলা করে আর অত চেঁচামিচির কি দরকার? কদিন পরেই তো বিয়ে-সাদি করে রান্নাঘরে যাবে খুন্তি নাড়তে'। কেন? মেয়ে হলেই জীবনের আর সব দিক ভুলে দিন কাটাতে হবে শুধু রান্নাঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে, এইযে একটা মনোভাব, এটা গভীরভাবে বসে গেছে আমাদের সহজাত সংস্কারে। এর থেকে মুক্ত হতে লাগবে আর কত বছর আর যুগ?

দুবেলা অনুশীলন করে কিছুদিনের মধ্যেই রপ্ত করলাম হকি খেলা। তারপর কথা মতন চাকরি পেলাম ইস্টার্ন রেলওয়েতে। সংসার বাঁচলো।

এই বৈষম্যর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্যে মাঠে নেমে পড়েছি আমরা তিন ভাই বোন। শুধু ফুটবলে ধাক্কা দেওয়া নয়, একযোগে অনবরত ধাক্কা দিয়ে যুগযুগ ধরে অর্থহীন সংস্কারের মরচে পড়া অনড় একটা হয়ে বন্ধ দরজা আমরা ভাঙব।

ছোট বোন অমিতা খেলতে ভালবাসে আমার মতনই খুব ছোটবেলা থেকে। এই জন্যেই ভর্তি হয়েছে সকালের স্কুলে, যাতে সারা দিনটা হাতে পায় অনুশীলন করতে। করেও। বাসকেট বলে মুনশিয়ানা দেখিয়েছে খুব ছোট বেলা থেকেই। জুনিয়ার বেঙ্গলে দুবার সর্বভারতীয় খেলায় অনেক দক্ষতার পরিচয় রাখলেও কর্মকর্তাদের জন্যে বাদ গেলো বড়দের টিম থেকে অজানা (?) কোনো কারণে। এখন খেলছে রাখী সংঘে। ফুটবল, বাসকেটবল আর হকি, নিয়মিত অনুশীলন করে তিনটে খেলা।

পৃথিবীর কোনো দেশে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে কোনো খেলোয়াড়ের কপালে জোটে কি এমন পরিহাস? এদেশের পুরুষ খেলোয়াড়দের তো দেখি ঘরে বাইরে কত সম্মান, আদর, যশ, অর্থ। তার জন্যে গর্ববোধ করি আমরা, খুশিই হই। শুধু ভাবি এই পক্ষপাতিত্ব আর অবজ্ঞার ভাব কেন মেয়েদের বেলায়? ছেলেদের ক্লাবে কর্মকর্তাদের মধ্যে মহিলা একজনও নেই। রাখার কথা চিন্তাও করে না কেউ। আর মহিলা সংগঠনেও মহিলা কর্মকর্তা নেই বললেই চলে। শুধু মহিলা নিয়ে কোনো সংগঠন চলে নাকি? পাগল? ধারণ করে তাই ধরিত্রী। ধরিত্রী সর্বংসহা, শান্তধী, শ্রীময়ী। ধরিত্রীর প্রতিভূ নারী। তাই সবদেশে চিরকাল তাকে শেখানো হয় ধরিত্রীর মতন ধৃতশ্রী হতে। কবে থেকে, কত যুগ ধরে এক কথা শুনতে আর শিখতে শিখতে এই বোধ মজ্জাগত হয়ে গেছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে, আহা, 'মেয়ে মানুষ' ও পারবে না। অথচ এই ভারতবর্ষেই মণিপুরের মতন মাতৃতান্ত্রিক যে সামান্য কটি রাজ্য আছে সেখানে গিয়ে এই মেয়েরাই যে কত পারে, ইচ্ছে করলে বা সুযোগ পেলে যে পারতে পারে কতখানি, অবাক মেনেছি তা দেখে। কিন্তু—তবুও!

আর কয়েকটা বছর পরেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আর এক শতাব্দীতে। সেই নতুন জন্মলগ্নে ভয়ানক এই 'তবু'র দ্বিধা ছেড়ে এগবো নাকি আমরা আরো খানিকটা?

আলোর সন্ধানে

সুপ্রিয়া চৌধুরী (অভিনেতা)

ঝড় তুললেন বাড়ির সবাই 'না' শব্দটি দিয়ে। বাবা ছিলেন বার্মার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। টাকাপয়সা, যশ, প্রতিপত্তি চাইবার মতন জিনিস সবই ছিল বাবার প্রচুর। রাশভারী মানুষ। চাইতেও জানতেন সবকিছু নিজের মতন করে। সংসারে তাঁর মতের ওজনও ছিল তাই বেশ ভাল রকমই।

নাচ, গান, অভিনয় ভালবাসতাম খুব ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু লেখাপড়া এগোয়নি বেশীদূর বাবার অতিরিক্ত আদরে। ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম সব থেকে ছোট। দিদিরা সকলে পড়তেন শান্তিনিকেতনে তাই ছাড়তে রাজি হননি বাবা আমাকেও অত দূরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে তোলপাড় যখন বার্মার বাতাস তখন আমরা চলে আসি ভারতে। এরপর নিজের ক্ষেত্রে গুছিয়ে বসতে সময় লেগেছিল বাবার বেশ কিছুদিন। ঘুরতেও হয়েছিল ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পড়াশোনার বেশী সুযোগই পাইনি আমি নিয়ম মতন।

বড় হয়ে উঠতে লাগলাম কিন্তু সুখী আর সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা সাধারণত যা নিয়ে থাকতে ভালবাসে সেই সাড়ি, গয়না, যাত্রা, থিয়েটার মন ভরায় না আমার কিছুতেই। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা অস্থিরতা ক্রমাগত ধাক্কা দেয় কিছু একটা করবার জন্যে। সে যে কি বুঝতে পারি না ঠিক মতন, কিন্তু চিরাচরিত গতানুগতিকতাকে পেছনে ফেলে নতুন কোনো পথে চলবার অদম্য একটা ইচ্ছে অস্থির করে তোলে নতুন যৌবনে ভরা দিনগুলোকে। এর ওপর আরো মুস্কিল হয়েছিল যে, ছোটবেলা থেকেই একেবারে কিছু না করে বসে থাকতে পারতাম না আমি

কিছুতেই। আগেই বলেছি বাবার সঙ্গে ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরাঘুরির ফলে পড়াশোনা করবার সুযোগ আমার হয়নি বিশেষ। তাই কিছু একটা করতে অফিসে চাকরি-বাকরির প্রশ্নই ওঠেনি। সুবিধে থাকলেও সে কাজে বাবার মত পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। যাইহোক, এইরকম কি করি, কি করি যখন মনের অবস্থা তখন একদিন প্রায় হঠাৎই ঠিক করে ফেললাম ছায়াছবিতে কাজ করব। কিন্তু করব বললেই কি আর করা যায়? বিশেষ করে মেয়ে হয়ে জন্মেছি এমনি এক দেশে বাধা জড়িয়ে আছে যেখানে পায়ে পায়ে। তার ওপর আবার পরিবারটিও তো একেবারে সেই মান্ধাতার যুগের মতন সনাতনপন্থী। এইরকম একটি পরিবারে, মেয়ের মুখ থেকে এহেন ভয়ঙ্কর একখানি কথা বিস্ফোরণ ঘটালো যেন বাড়ির মধ্যেই।

বাবা বললেন, "অনেক হয়েছে। আর দেরী নয়। পাত্র দেখছি। ঘর সংসার গোছাও গিয়ে নিজের।" বাবার সেই আপত্তি আরো জোরালো হলো বড় দুই ভগ্নীপতি প্রথিতযশা সাহিত্যিক বনফুল আর সত্যেন চ্যাটার্জি, যিনি তখন পুলিশ কমিশনার, তাঁদের মতন মানুষেরও একযোগ বিরূপতায়।

কিন্তু শক্ত হলাম আমিও ভয়ঙ্কর জিদে।

কেন, কেন? সংসারে কি এত অভাব পড়েছে? খাওয়াদাওয়া জুটছেনা নাকি যে ঘরের মেয়েকে শেষ পর্যন্ত নামতে হবে সিনেমায়? এক অখণ্ড যুক্তি আত্মীয়-পরিজনের।

শুধু খাওয়াদাওয়াই কি মানুষের সব নাকি? আর তোমাদের সব ব্যাপারেই আগে আসে কেন মেয়ে আর মেয়ে কথাটা? মেয়েরা কি মানুষ নয়? ইচ্ছে থাকতে পারে না তাদের নিজের কিছু?

এরপর প্রায় বছর ঘুরে গেলো 'না' আর 'হ্যাঁ'র টানাটানিতে। তারপর আস্তে আস্তে কিছুটা নরম হলেন বাবা বুঝি সেই অটল প্রতিজ্ঞার নিঃশব্দ সহনশীলতার কাছে।

শুরু হলো অনুশীলন আর সাধনা। 'মেঘে ঢাকা তারার' সামান্য

দ্যুতিতে জীবনের সামনে জ্বলেছে যে আলোর বর্তিকা সুস্পষ্ট উজ্জ্বলতায় তাকে নিয়ে যেতে হবে ধ্রুব লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে কত যে কাঁটা বিঁধেছে পায়ে। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে চলার পথ। কত যে হতাশ্বাস। কি করুণ ক্লিষ্ট দিন আর কতনা অশনি সংকেতে বিক্ষুব্ধ জীবন। আজ জীবনের প্রায় হেমন্তবেলায় দাঁড়িয়ে সেই অতীতের দিকে চেয়ে জল এসে পড়ে বুঝি অবুঝ চোখে। জল আসে বড় দুঃখে, বেদনায় আর সেইসঙ্গে আশ্চর্য সুখেও। সুখ- কোনদিকে এতটুকু আলো দেখতে না পাওয়া সীমাহীন হতাশার সেইসব কঠিন বন্ধুর পথ পেরিয়ে জীবনের চরিতার্থতায় উত্তরণে। সুখ অবিচল সাধনার সিদ্ধিতে।

তা সে যাক, কিন্তু বিপদ হলো যে ছবির পর্দায় আমাকে দেখা-মাত্র ঝড় উঠলো আত্মীয়-বন্ধু মহলে। এর মধ্যে দিদির বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। পাত্রপক্ষ যেদিন দিদিকে দেখতে এলেন সেদিন আমি সিনেমা করি, (বসু পরিবার করে মোটামুটি পরিচিত হয়ে গেছে তখন নামটা) এই কথা পাছে বেরিয়ে পড়ে তাই যতক্ষণ তাঁরা রইলেন ততক্ষণ আমাকে বন্ধ করে রাখা হলো শোবার ঘরে। আমার একেবারে খাপছাড়া একটা বৃত্তি, যার জন্যে লুকোচুরি করতে হলো বাবাকে এতখানি, তার ওপর আবার ঘরে বাইরে এমন প্রচণ্ড আলোড়নে অস্থির হয়ে উঠলেন বাবা। এদিকে বয়সও হয়ে যাচ্ছিলো বাবার, তাই দেখেশুনে ভালো দেখে একটা বিয়ে দিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতন নিজের সংসারে গুছিয়ে দিতে চাইলেন আমাকেও।

বিয়ে হয়ে গেলো একদিন বাবার পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে। আমার ইচ্ছের অনিচ্ছের কোনো প্রশ্নই উঠলো না। উঠতে দিলেনিনা বাবা। আর সেই অল্প বয়সে রাশভারী বাবার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আর অনড় সঙ্কল্পের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা ছিল আমার আর কতটুকু? আজ এতগুলো বছর পার করে দিয়ে এসে সেদিনের কথা যখন মনে হয় তখন ভাবি, আমরা মেয়েরা কত হাজার বছর ধরে বলিকৃত হয়ে

আসছি সমাজ নামে কতগুলো অন্ধ বিশ্বাস আর নিয়মের যূপকাষ্ঠে? নাহলে এতগুলো বছর, এতখানি স্বাধীনভাবে অভিনয়ের মতন একটা কাজকে বৃত্তি হিসেবে বেছে নিয়ে, এত বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে মিশে, বেশ একটু নামডাক হবার পরেও, নেহাৎ শান্ত সুবোধ একটি নাবালিকার মতন আমাকেও গুটিগুটি গিয়ে বসতে হলো বিয়ের পিঁড়িতে! তারপর একেবারে অচেনা অজানা একটা মানুষের হাত ধরে এসে উঠলাম শ্বশুড়বাড়ি নামে বহুশোনা জায়গাটিতে!

পুতুল খেলার জীবনের দিনগুলো ছাড়তে না ছাড়তেই মার চোখ দিয়ে দেখতে শিখেছি আর একটি ঘরের স্বপ্ন। প্রত্যেকটি কথায়, চালে, চলনে মা শিখিয়েছেন, শ্বশুরবাড়ি গেলে এটা করতে হয়। ওটা করতে হয়না। এই রকম করে খেতে হয়। ওরকম করে চলতে হয়না। এতসব 'না'এর গণ্ডিটানা শুধুই মেয়েদের জন্যে। বাড়ির ছেলেরা? ওরা তো 'পুরুষমানুষ'। সোনার আঙটিতে দাগদোষ ধরে নাকি আবার কিছু? মা শিখে এসেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। যুগ যুগান্তর ধরে এই নিয়ম বয়ে চলেছে পরম্পরার ধারা টেনে। আমিও তো সেই ধারা, সংস্কার বা অভ্যেসে ভেসেই ঠিক তেমন করে প্রতিবাদ করতে পারিনি চলে আসা অন্ধ নিয়মটার? পারিনি, আর অজানা সমুদ্র মন্থনে আমার কপালে উঠলো শুধুই গরল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন কালো হয়ে উঠলো সেই বিষে। এই জীবনের সঙ্গে আমার আগে তো পরিচয় ছিলনা। আমার নিজের পরিবারে আমি দেখে এসেছি একটা সুস্থ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তবু সেই অসহ্য দিনগুলোতেও তো সব কিছু নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার স্বভাবজাত শিক্ষা বা সংস্কারে চেষ্টা করেছি সব মানিয়ে নিতে। কিন্তু হায়রে, সব মেনে নেবারও তো একটা শেষ আছে? সেই সহ্য পেরিয়ে গিয়ে যখন মুক্তি পেতে চেয়েছি এর থেকে, তখনো কিন্তু বারবার বাধা দিয়েছেন আত্মীয়-পরিজনেরা নিছকই একটা লোক লজ্জার ভয়ে। ভদ্র গেরস্থ ঘরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ির অল্পসল্প (!) কষ্ট,

অসুবিধে মেনে আর মানিয়ে না নিয়ে বেরিয়ে আসবে স্বামীর ঘর ছেড়ে? নিন্দে করবেনা মানুষে?

১৯৬০ সালের কথা সেটা। দুশকেরও বেশী সময় পেরিয়ে এসে আজ যখন জীবনটাকে দেখতে বসি আর একবার পেছন ফিরে তখন ভাবি আজ এতখানি সময় পার করে এসেও আমাদের অভ্যেস, চিন্তাধারা বা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি তার থেকে এতটুকু? আজকেও কি শ্বশুরবাড়িতে বা স্বামীর সঙ্গে কোনো কষ্ট, অসুবিধে বা বিরোধ হলে মা-বাবা আত্মীয়-সজন বারবার বলেন না, "শ্বশুরবাড়িতে ওরকম একটু আধটু মানিয়ে নিতেই হয়। মেয়ে হয়ে এত রাগ আর জিদ রাখলে কি চলে?" কিন্তু কেন? একই সমাজে বাস করে, একই পরিবারে মানুষ হয়ে, কেন মেয়ে হয়ে জন্মানো এইটুকু অপরাধেই একটা মানুষ সারাটা জীবন ধরে নিঃশব্দে সহ্য করে যাবে সব অন্যায় আর হীনতা? একেবারে শিশু বয়স থেকে দেখবে তার সঙ্গে প্রতি ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হচ্ছে দাদা বা ভাইয়ের। আর তার থেকেও ভয়ের বা দুঃখের ব্যাপার হলো যে, সেই বঞ্চিত, অবহেলিত মেয়েটিই বড় হয়ে যখন কর্ত্রী বা মা হবে একটি সংসারে তখন আশ্চর্য এক মানসিকতায় তার সংসারেও সে টেনে চলবে ছেলে আর মেয়ে, বিভেদের অমোঘ সেই দড়িটা তেমনি শক্ত হাতেই। স্ত্রী-শিক্ষার এত চিকনাই, নারীমুক্তি আন্দোলনের এত রনরনি সব পড়ে থাকবে বাইরের একটা বাহারি পোশাক হয়ে। তবে কেমন করে, কোথায় এর শেষ?

আমি কিন্তু নিঃশব্দে, নিরুপায়ে মেনে নিইনি আমার সেই বিরূপ ভাগ্যকে শুধু নিয়তির বিধান বলেই। আমি বিদ্রোহ করেছিলাম আর যে ভয়ে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শরৎচন্দ্রের 'রমা' 'হেম', 'বড়দিদিরা' দুহাত দিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরে বন্ধ করিয়েছিলেন বুকের মধ্যে ধুকপুকিয়ে ওঠা ইচ্ছের হৃদপিণ্ডটাকে তাই ঘটলো আমার জীবনেও এই ভয়ঙ্কর একটা বিদ্রোহের পরিণামে। বাবা দাঁড়িয়ে থেকে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে

দিলেও আমার দিক থেকে মুখ ফেরালেন সবাই। নিন্দের ঝড় উঠলো ঘরে বাইরে।

তাতে কিন্তু বিচলিত হইনি আমি এতটুকু। কতগুলো অর্থহীন নিয়ম আর সংস্কার-সর্বস্ব স্বার্থপর একটা চেনা সমাজকে মোকাবিলা করতে শিখে ফেলেছি আমি সেই বয়সেই, তাই সব কটূক্তি আর বাধার সামনে দাঁড়ালাম শক্ত হয়ে। সমাজকে মানবো আর শ্রদ্ধা করব আমি তখনি যখন সে মঙ্গলের আলোয় প্রদীপখানি জ্বেলে নিয়ে আসবে আমার চলার পথটুকু ঠিকমতন দেখিয়ে দিতে। নাহলে সেই নিঃসীম অন্ধকারে ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে চলতে হবে একাই।

বিবাহ-বিচ্ছেদ পেয়ে আমি এসে উঠলাম ৩, নম্বর ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে। একা। শুরু হলো ছায়াছবিতে কাজ আবার নতুন করে। আমার তখনকার সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত-জীবনে কাজ আর জীবন একেবারে এক হয়ে মিশে গিয়ে কি দ্রুতগতিতে কেমন করে কেটে গেছে এতগুলো বছর বুঝতেই পারিনি যেন ভালো করে। শিল্পকে অন্তর দিয়ে ভালবাসলে শিল্পীর কাছে গোটা জীবনটাই হয়ে ওঠে একটা পরিপূর্ণ শিল্পকাজ। আমার বেলাতেও হয়েছে তো তাই। আত্মীয়-বন্ধু সকলের কাছে এক নাগাড়ে আঘাত আর অবহেলা পেতে পেতে নিজের উদ্দেশ্যটা আঁকড়ে ধরতে শিখেছিলাম শক্ত হাতে, তাই দীর্ঘদিন স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করে যেতে পেরেছি ছবিতে। এর মধ্যেই বেঁধেছি সংসার আবার নতুন করে উত্তমকে নিয়ে। বড় হয়ে উঠেছে মেয়ে সোমা! ওদের কলকাকলীতে সুখে আনন্দে উপচে উঠেছে আমার পৃথিবী। দায়িত্বও বেড়েছে সংসারের প্রতি অনেকখানি। একটা সংসারে গৃহিণী আর মায়ের দায়িত্ব সবটা নিয়েও মন আর সময় দিতে পেরেছি নিজের কাজে, কারণ কাজ আর সংসার দুটোকেই ভালবাসতে পেরেছি একসঙ্গে।

উত্তম বিশ্বাস করতেন যে, মঞ্চে বা পরদায় যে ভাবেই হোক, অভিনয় করাটা কখনই শুধুমাত্র একটা সখের নেশা বা পেশা নয়। তিনি অভিনয়কে সমাজ সেবারই আর একটা দিক বলেই মনে করতেন,

বললে কথাটা মোটেই অত্যুক্তি হবে না। আমি ব্যাপারটা ভেবেছি আর একটু অন্যভাবে। আমার জীবনে ক্রমাগত উঠে আসা সব বিষের জ্বালা থেকে অভিনয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি এক অমৃত কুম্ভ। খুব ছোট বেলা থেকেই ভালবেসেছি অভিনয়কে। কিন্তু এই পরিণত বয়সে এসে আজ মনে হয় যে, অভিনয়টা একটা এমনই শক্তি যাকে আমরা সহজেই ব্যবহার করতে পারি মানুষের কল্যাণের জন্যেও। পরহিত ব্রত বা সমাজ সংস্কার কথাটা হয়তো বড় বেশী তত্ত্বে ভরা গম্ভীর একটা শব্দ ঝঙ্কার, কিন্তু শ্রীকান্তের অন্নদাদিদিকে দেখতে দেখতে চিরকালের শক্ত কষি দিয়ে বাঁধা চোখগুলো কি আমাদের জলে ভরে ওঠে না যুক্তি আর বিবেক শূন্য একটা সমাজে শুধু নিয়মের দড়ি দিয়ে বাঁধা অসহায় মেয়েগুলোর বুক ভাঙা হাহাকারে? একটা মানুষকে ভালবেসে যে মেয়েটা নিঃসঙ্কোচে ছাড়লো তার সমাজ-সংসার সুখ-সাচ্ছন্দ্য সবকিছু তাকে সেই একান্ত ভালবাসার ঘরখানিও তবে হারাতে হবে কেন শুধু এক মান্ধাতার আমলের সংস্কারের শাসনে? কোন অপরাধে আর ক্ষমাহীন পাপে রাজলক্ষ্মী ফিরে যেতে পারবে না তার ইচ্ছে মত সাজানো সংসারের নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ততায়? কেন পারবে না? হায়রে কপাল, গোটা পৃথিবী জুড়ে আজ নারী মুক্তি আন্দোলনের এই যে উচ্চরোল তাতে সত্যি সত্যি কি উপকার হয়েছে পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে একটিও নারীর? আসল কথাটা হলো, যুদ্ধটা কার বিরুদ্ধে? ঘোষণা করলই বা কে? যতক্ষণ আমরা বাঁচি এগিয়ে চলি যুদ্ধ করেই। বেঁচে থাকবার বা একজনের কাছে আর একজনকে টিকিয়ে রাখবার অহরহ এই যুদ্ধে কেউ কারুকে পথ ছেড়ে দেবেই কেন সহজে? অনেক দিনের বন্ধ একটা ঘরে মরচে ধরা কপাটখানা খুলতে কষ্ট তো খানিকটা করতেই হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে নারী সমাজটাই যে যুগযুগ ধরে বন্ধ হয়ে আছে নানা নিষেধের গণ্ডিটানা অনড় এক বন্ধ দরজার মধ্যে। কিন্তু সে কপাট খুলতে খাপখোলা তলোয়ার হাতে যুদ্ধে নেমে কি কোনো ফল হবে? স্বাধীনতা মানে যদি নারী সমাজের অগ্রগতি হয় তাহলে সে পথে

চলতে হবে প্রতিটি মেয়েকে স্ত্রী হয়ে, মা হয়ে নিজেরই ঘরে। একজন স্ত্রী যদি প্রেমে প্রীতিতে ভরিয়ে তুলতে পারে একটি সুখের সংসার, আর মা হয়ে বাধাবন্ধের সব রক্ত চক্ষুকে নস্যাৎ করে নির্ভয়ে নিজের মেয়ের হাতে তুলে দিতে পারে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার স্বাধীনতাটকু, তাহলে সমাজ থাকবে তার সব নিষেধ, সবকিছু নিয়ম আর শাসনের তর্জনী তুলে দূরে দাঁড়িয়ে।

সেই সুখের সংসারখানি গড়তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চাই গভীর বোঝা-পড়া আর আন্তরিকতার বন্ধন। এই বোঝাপড়াটুকু ঠিকমতন হবার জন্যে পরস্পরকে চিনে, জেনে ভালবাসার বিয়েতে আস্থা আমার অবিচল আজও। সেই ভালবাসায় নেই শুধুমাত্র দেহের জন্যে দেহের দুর্মর কামনা। চোখে চোখে নেই শুধু অলীক মোহের মায়াজাল। সে ভালবাসা নিবিড় পরস্পরের বিশ্বাসে আর ভালবাসায়। নিজের ঘরের অকুণ্ঠ শান্তির মধ্যে এই সত্যটুকু খুঁজে পেয়েছি আজ আমি বড সহজ করে। সমাজ সংস্কারে, নারী স্বাধীনতার প্রয়াসে এর থেকে সহজতম পথ আর কিছু হতে পারে না বলেই বিশ্বাস আজও আমার সুদৃঢ়।

যশ, স্বীকৃতি আর মানুষের ভালবাসা জীবনে পেয়েছি দুহাত ভরে। কিন্তু জীবন শুরু থেকে সেই চরিতার্থতায় পৌঁছতে সহ্য করতে হয়েছে কতনা লাঞ্ছনা আর অপমানের গ্লানি। শুধুমাত্র মেয়ে বলেই কত দুস্তর বাধা পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে বারবার, কিন্তু তার মধ্যেই এগিয়ে চলেছি শেষ পর্যন্ত নিঃশঙ্ক দৃঢ়পায়ে। সেই শক্তি পেতে সবচেয়ে বড় করে যে কথা আমি আজও অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি তা হলো. আত্মবিশ্বাস।

জীবনের চলার পথে শুধু ফুল বিছনো থাকে না চিরকাল। জীবনে আছে উত্থান-পতন, ঝড়-ঝঞ্ঝা। আর সেই দুঃখ-বিপদে নিজের ওপর বিশ্বাসই নিজের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখে আশ্বাসের আলো। আমার নিজের এই সামান্য জীবন দিয়ে এই সত্যি অনুভব করেছি আমি বারবার। বারবার পথ হারানো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনগুলো থেকে আজ যদি পৌঁছে থাকি সার্থকতার ধ্রুব লক্ষ্যে, তবে তা আমার নিজের ওপর

বিশ্বাসের জোরে। কোনদিন কোনো কারণেই এই বিশ্বাস হারায়নি আমার মুহূর্তের জন্যেও, তাই কোনো দুঃখ, কোনো ব্যর্থতাও কখনো ভাঙতে পারেনি আমার মানসিক প্রশান্তি। জীবনের কাছে জয় আমার এখানেই।

শুধু ছায়াছবি কেন, আজ মেয়েরা অনেকখানি সাবলীলতায় এগিয়ে এসেছেন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। সেই ঈপ্সিত আর সার্থকতার পথ ধরে চলতে গিয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় তাঁরা নিশ্চয়ই মাথা নোয়াবেন সেইসব পূর্বসূরিদের দিকে চেয়ে দধীচির মতন নীরব আত্মদানে যাঁরা অনেকখানি সহজ করে দিয়ে গেছেন আজকের চলার পথখানি।

পথ খুঁজেছি

নীলিমা চক্রবর্তী (সাংবাদিক)

নিজের সম্বন্ধে লিখতে বসে লজ্জা পাচ্ছি বারবার। কিন্তু আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে শুধুমাত্র ছাত্ররাই নয়, বহু ছাত্রীও সাংবাদিকতার ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসছেন ভবিষ্যৎ সাংবাদিক হয়ে। ভালো হোক আর মন্দই হোক এটা সত্যি ঘটনা যে, সুদীর্ঘকাল এই পেশা ছিল শুধুমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া। মেয়েরা এদিকে বিশেষ মাথা ঘামান নি বহুদিন। অবশ্য সাংবাদিকতার সম্পাদকীয় বিভাগে কিছু সংখ্যক স্বনামধন্যা মহিলা বেশ কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, কিন্তু প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য আর পাঁচ জায়গায় ঘোরাফেরার কাজ যে রিপোর্টিং, সেদিকে নানা কারণে এগিয়ে আসেন নি বিশেষ কোনো মহিলাই। না, এগিয়ে আসেন কি বললে বোধহয় সৌজন্যের খাতিরে সত্যের অপলাপই করা হবে। সত্যি কথাটা খুব সোজা করে বললে বরং বলা উচিৎ, আসতে দেওয়া হয়নি। আজ প্রায় দুযুগ পরে ফেলে আসা অতীতটার দিকে ফিরে দেখতে গিয়ে বড়ই অপ্রিয় একটা প্রশ্ন আরো নিষ্ঠুর হয়ে মনটাকে বিকল করে তুলছে বারবার। প্রশ্নটা—দেওয়া কি সত্যি সত্যি হচ্ছে আজো ?

সে আজ কতদিন আগের কথা। কলেজের পাট সবে শুরু। জীবনের দিক সম্বন্ধে ঠিক সিদ্ধান্ত নেই কিছুই। বন্ধু মহলে আলোচনা উঠলে কেউ বলে শিক্ষকতাকেই নেবে জীবনের মহান আদর্শ করে। কেউ ভাবে ডাক্তার হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করবে আর্ত-আতুর, গরীব দুঃখী মানুষগুলোর সেবায়। কেউ শিল্পী হবে। কেউ বা যাবে অফিসে—আদালতে। অল্প বয়স থেকেই কিছু কিছু লেখার নেশা ছিল। অনেক সঙ্কল্পের মাঝে মাঝে তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করি একটু আধটু, এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ এক বন্ধু দৌড়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে।

একটা নিদারুণ দরকারী কাজ আমাকেই নাকি করতে হবে তক্ষুনি।

কি ব্যাপার!

দেশ ভাগ হয়েছে তখন সবে কয়েক বছর। উদ্বাস্তু সমস্যা তখনো গা-সওয়া হয়ে ওঠেনি বাংলার মানুষের। তাই অর্থ দিয়ে সামর্থ দিয়ে তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতেও উন্মুখ সকলে। কয়েকজন বন্ধু মিলে কিছুদিন আগে ছাত্রী সংহতি নাম দিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুলেছিলাম। এই সমস্যায় কিছু অর্থ সাহায্য করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম আমরাও এর পক্ষ থেকে। তার একমাত্র সহজ পথ ছিল একটা নৃত্য নাট্যের অনুষ্ঠান করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। এই জন্যে পথে পথে বিলি করতে হবে জ্বালাময়ী ভাষার ইস্তাহার। আমার ওপর ভার পড়ল সেই ইস্তাহারের ভাষাটি ঠিক করে দেবার। এমন ভাষায় সেই ইস্তাহার লিখতে হবে পড়তে পড়তে যার করুণ রসে পাঠকের চোখ ভেঙে নেমে আসে ঝরঝর ঝর্ণার ধারা। বীর রসে টগবগিয়ে ফুটে ওঠে গায়ের রক্ত আর সঙ্গে সঙ্গে মহান আদর্শের প্রাণগ্রাহী সেই আবেদনে মুক্ত হস্ত উজাড় হয়ে আসে আমাদের টিকিটের কাউণ্টারে। দিনের পর দিন চললো তার খসড়া রচনা। একটার পর একটা লেখা, ছেঁড়া, আবার লেখা, আবার বদলানো। অবশেষে এক নাগাড়ে প্রায় সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আর প্রাণপাত সাধনায় হলো এক সাহিত্য সৃষ্টি (?) আর দেখতে দেখতে এলো সে সাহায্য রজনী। কিছু দর্শক সমাগম হলই। হলো কিছু টিকিটও বিক্রি। কোনো কোনো পত্রিকায় হয়তো বেরলো দু/এক লাইন খবরের টুকরো—'শুধুমাত্র মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এমন সাফল্য মণ্ডিত অনুষ্ঠান,' এইসব। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যদি সেদিন সেখানেই শেষ হতো তাহলে আজকের এই অভিজ্ঞতা লেখবার সুযোগ হয়ত আসতই না কোনদিন।

কেটে গেছে তারপর বেশ কয়েকটা সপ্তাহ, তারপর এক অপ্রত্যাশিত সন্ধ্যায় আবার আবির্ভাব সেই বন্ধুর।

এই তোকে '—' পত্রিকার সম্পাদক ডেকেছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। খবরটি ঘোষণা করলো সে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে।

আমাকে !

হ্যাঁ।

হঠাৎ কেনরে ? অবাক না হয়ে পারিনা এবার।

কি জানি বাবা, তুমি সাহিত্যিক মানুষ, কি সব লিখেছ টিখেছ ঐ ইস্তাহারে—রহস্যময়ভাবে অবোধ্য হয়ে ওঠে শ্রীমতীর বাচনভঙ্গি।

আমি একাই লিখেছি নাকি সেসব ? রীতিমতন ঘাবড়িয়ে গিয়ে ওর কথার মধ্যেই ন্যায়ের প্রশ্ন তুলি প্রায় চেঁচিয়ে।

তুমিই তো লিখেছিলে বাপু তার বেশীটা। পাল্টা যুক্তি অকাট্য। আর সেই জন্যেই তো তিনি ডেকেছেন তোমাকেই। প্রশংসা-ট্রশংসা করবেন কি সব। একটু একটু সাহস দেবার সুর এবার ওর গলায়। অনেকবার করে বলে দিয়েছেন, যাস না একবার সামনের রব্‌বারে।

খুব কাছেই ঠিকানাটা। এত কাছে একটা পত্রিকা অফিস ! কত মহৎ ওঁরা। কত নিরহঙ্কার। আমার মতন একজন সামান্য মানুষকে স্মরণ করতে পেরেছেন এত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও। সীমাহারানো শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় বুঝি গলে যেতে থাকে বুকের ভেতরটা। রবিবার, তার মানে পুরো পাঁচটা রাত আর চারটে দিন বাকি এখনো। তারপর···একেবারে অচেনা এক অনুভূতিতে যেন নতুন রূপ ন্যায় কল্পনার আকাশ। পত্রিকা অফিস, কত না জানি স্বনামধন্য সাহিত্যিকের হাট বসেছে সেখানে। সরস কত কথার মায়াজালে, রম্য কত আলাপের সজীবতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে সেখানের লঘুপক্ষ বাতাসটুকুও। পাশের ঘরেই হয়ত রাখা আছে রাশীকৃত বইয়ের স্তূপ। অজস্র, অজস্র গল্প, কবিতা, উপন্যাস। কত পণ্ডিত আর প্রাজ্ঞজনের দিন রাতের কত চিন্তা আর সাধনার বাস্তব প্রকাশ।

আর অপেক্ষা সইলো না। তিরতিরে একটা খুশির আমেজ বুকে নিয়ে দুদিন না যেতেই রওনা দিলাম ঠিকানাটা ব্যাগে ভরে।

একটু খোঁজাখুঁজি এদিক সেদিক, তারপর পাওয়া গেলো সন্ধান। কিন্তু এই! কাগজের অফিস! একতলায় খুপরি মতন একটা ঘরে জানলার মতন দুটো ফোকরের একটা বন্ধ। অপরটি দিয়ে যতদূর চোখ চলে শুধু রাশিকৃত কাগজ, একটি টেবিল আর একজন ভদ্রলোক।

কাকে চাই? কিছু একটা লিখতে লিখতে অপাঙ্গে যেন চোখ তোলার একটু প্রয়াস দেখান ভদ্রলোক।

ইয়ে...এটা কি '—' পত্রিকা অফিস? এতক্ষণ প্রায় বন্ধ হয়ে আসা গলা একেবারে কপাট দেয় এবার বুঝি।

হ্যাঁ, আপনি—?

আমি আপনাদের সম্পাদিকার সঙ্গে একবার...

অ, তা আপনি যদি কোনো লেখাটেখার ব্যাপারে এসে থাকেন তাহলে কিন্তু..., ব্রেক কষা মোটর গাড়ির মতন ভদ্রলোকের গলাটা যেন সশব্দে ক্যাঁচ করে ওঠে মাঝপথেই।

না-না, ভয়ানক অস্বস্তিতে একটু কেশে গলাটা একবার পরিষ্কার করে না নিয়েই আর পারিনা। আমি ছাত্রী-সংহতির...

ও, আচ্ছা আচ্ছা। চেয়ারের মধ্যেই একবার নড়ে চড়ে বসেন ভদ্রলোক এতক্ষণে। বসুন, বসুন। হাত তুলে সামনের আর সম্বলমাত্র নড়বড়ে চেয়ারখানা দেখিয়ে দেন আলাপিত ভঙ্গিতে। ভাঙবে নাতো! ভদ্রলোকের অলক্ষ্যে চট করে একটা কোণ ধরে একবার নেড়ে নিই বস্তুটি।

হ্যাঁ, আপনাদের ছাত্রী-সংহতির তো বেশ ফাংশান হলো, নতুন একটা কিছুর আভাসে হঠাৎ যেন ভারি বন্ধু বন্ধু হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের এতক্ষণ বরফজমা গলার স্বর। একযোগে আপনারা সবাই এত সুন্দর কাজ করলেন। নিজেরা পরিশ্রম করলেন, গোছালেন, টাকা যোগাড় করলেন...

নিদারুণ খুশির একটা শিরশিরানি যেন দোলা দেয় বুকের মধ্যে। সম্পাদিকা নাহয় নাই হলেন, তবুতো পত্রিকা অফিসের লোক। কিন্তু

নিজে থেকে ডেকে এনে সম্পাদিকা দেখা করছেন না কেন এখনো! হয়তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আরো প্রয়োজনের কোনো কাজের ভিড়ে।

জানেন আপনাদের মধ্যে দেখেছি কাজ করবার একটা আন্তরিক ইচ্ছে। চমক ভাঙে ভদ্রলোকের গলার স্বরে, আপনারা হলেন দেশের ভবিষ্যৎ আর এ হলো একটা মিশন। দেশের লক্ষ কোটি মানুষ যা বলতে চায় আপনারা প্রাণ দেবেন তা ভাষায়।

একি স্বপ্ন দেখছি নাকি এতক্ষণ! সম্মোহিত চোখ দুটো বড় করে একবার তাকাই চারদিকে। লক্ষ লক্ষ জনগণের প্রতীক হব আমরা! কোটি কোটি মূক মানুষের নিঃশব্দ ভাষা মুখর হবে আমাদের কলমে…! না, সবই সত্যি। সত্যি রাশিকৃত কাগজ ওপছানো সামনের এই নড়বড়ে টেবিল। এই খুপরি খুপরি ঘরে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসা আবছা অন্ধকার। এই ভাঙা চেয়ার। সত্যি এই ছোপধরা বালিখসা দেওয়ালের ভাঙা অংশটাও।

শুরু হলো যাতায়াত কলেজে আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আর একটু একটু করে দিনে দিনে হলো কতনা অজানা খবরের জানা-জানি। মহিলা পত্রিকা কিন্তু নেই কোনো মহিলা সম্পাদক।

দেখ ভাই কিছু যদি মনে না করো তো একটা কথা বলি একটু সত্যি করে? একগাল অমায়িক হাসিতে উদার হন অনির্বাণবাবু—ধরা যাক তাঁর নাম অনির্বাণবাবুই, গত একটি শতক ধরে মহিলারা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনার কাজ করে এসেছেন বলে যতই ঢাকঢোল পেটানো হোক না কেন, তবু একা একটা দপ্তর সামলানোর কাজ মেয়েদের দিয়ে হয় বলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা কিছুতেই। ভদ্রলোক ভরসা করেন না মেয়েদের যোগ্যতার ওপর তাই মহিলা পত্রিকার সম্পাদনাতেও দায়িত্বভার নেই কোনো মহিলার ওপর। না আছে নেই। কোনদিন ছিল না? তা কি আর করা যাবে সেজন্যে? তবুতো মেয়েদের জন্য করতে পারব কিছু। অনেক আশায় বুক বেঁধে চোখ মেলে দিই সামনের দিকে। রাত যদি ডুবেই থাকে

নিঃসীম অন্ধকারে তবুতো সামনের দিকে ছড়িয়ে আছে নতুন দিনের সোনালী আশ্বাস।

এই হচ্ছে সাংবাদিকতা—রিপোর্টিং। কাজটা শুধু পুরুষের না মেয়েদেরও, সেই কথাটাই প্রমাণ করতে হবে তোমাকে নিজের কাজ দিয়ে। একগাল অমায়িক হাসিতে বুকের হৃৎপিণ্ডটাই যিনি মুখের ওপর উপড়ে আনতে পারেন কথায় কথায়, সেই অনির্বাণবাবু একদিন বললেন ছোট্টো একটা কাগজের টুকরো হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে, "লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজে প্রথম হচ্ছে মেয়েদের এন. সি. সি'র ব্যবস্থা। দেখিতো ওখানে গিয়ে কেমন ভাবে গুছিয়ে গাছিয়ে খবরটা যোগাড় করে 'স্টোরি' লিখে ফেলতে পার একটা সুন্দর করে। দোলা লাগে। হ্যাঁ দোলাই তো। খুশি ওপছানো বুকের রক্ত বুঝি ঢেউ দিয়ে নেমে আসবে সে উত্তেজনার দোলানিতে। এতবড় একটা কাজে ডাক দেওয়া আমায়! মাথার ওপর কাঠ ফাটা রোদের জ্বলুনি। কিন্তু তাতে কি? ব্যাগের মধ্যে রাখা পত্রিকার তরফ থেকে দেওয়া পরিচয় পত্রটা ফুলে ফেঁপে দশখান হয়ে উঠলো বুঝি ততক্ষণে। কেটে গেল সারাটাদিন ইন্টারভিউ নেওয়া, প্যারেড দেখা, ছবি তোলায়। সেই দশটায় কলেজে আসবার সময় খেয়ে আসা খাদ্যবস্তু হজম হয়ে গেছে দু'তিন ঘণ্টা আগেই। এর পরেও অফিসে ফিরে গুছিয়ে নিতে হবে সারাদিনের নোট করা টুকরো টুকরো সব কথার আলাপচারি। দেখতে হবে প্রুফ। দরকার হলে ছদ্মনামে লিখতে হবে কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ (বাইরে থেকে আসা রচনায় পয়সা দিতে হয়)। আর এত সবের পরে সারাদিন ঊর্দ্ধশ্বাস ক্লান্ত শরীরটা মুহূর্তের বিশ্রামের ইচ্ছেতে চেয়ারের গায়ে একটু এলিয়ে এলেই পান চিবুনো হাসিহাসি মুখখানা আরো একটু বড় করে হাসিয়ে নেবেন অনির্বাণবাবু, ঘুম পাচ্ছে বুঝি? কিন্তু এইতো তোমাদের সবে যুদ্ধের শুরু। নিজেদের ভাগ্য নিজের হাতে জয় করে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করার যুদ্ধ। এতে তো তোমাদের হেরে গেলে চলবে না। আর না পারলে স্বীকার করে নাও এই বৃত্তি মেয়েদের জন্যে নয়। কথা শেষে

মিষ্টি মিষ্টি হাসবেন বুঝি অনির্বাণবাবু আর একটু, আর দোষি দোষি লজ্জায় মরমে মরে গিয়ে চেয়ারের পিঠে সোজা হয়ে বসব আমি তক্ষুনি।

যুদ্ধ? হ্যাঁ যুদ্ধই তো। কিন্তু কথা হচ্ছে, কার সঙ্গে কিসের যুদ্ধ করে চলেছি আমরা শুধু মেয়ে বলেই? করব আরো কত যুগ ধরে? কিন্তু যাক সে কথা। শুরুতেই কেন এখনই শেষের সুর? মালা গাঁথবার আগেই শুকনো ফুলের ব্যর্থতার হুতশ্বাস?

দিন কেটেছে। ছোট সেই পত্রিকা ছেড়ে ক্রমে দায়িত্ব নিয়েছি দৈনিক বসুমতীর মহিলা বিভাগ 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' সম্পাদনার। কৃতজ্ঞতা জানাই বসুমতীর তদানীন্তন সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটককে, যিনি মাসিক বসুমতী আর কয়েকটি পত্রিকায় আমার কিছু লেখা পড়ে নিজে থেকে ডেকে নিয়েছিলেন বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে। মহিলা বিভাগ, তাই অন্য আর পাঁচটা আলোচনার সঙ্গে অনেক সময়েই আলোচনা করি মেয়েদের নিজস্ব বিভিন্ন সামাজিক আর ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। বহু চিঠিপত্র আসে প্রতিদিন, তারমধ্যে বিশেষ করে আজ মনে পড়ছে 'ইনটারন্যাশানাল উইমেন্‌স্‌ লীগের' (অধুনালুপ্ত) সভার কথা।

শরীরটা খুবই বিদ্রোহ করেছে বলে অনেক ইচ্ছে থাকলেও নিজে যেতে পারলাম না কিছুতেই··· চিঠি পাঠিয়ে আহ্বান করেছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা, ওদের মহিলা আশ্রম দেখে সে সম্বন্ধে কিছু রিপোর্ট লিখতে। লিখেছেন, 'অমিত সাহস আর প্রতিজ্ঞা বুকে বেঁধে আপনারা এগিয়ে এসেছেন আজ নতুন পথের দিশারী হয়ে আর আপনাদের সৌহার্দ আর সহযোগিতাতেই বেঁচে আছে দেশের মেয়েদের যে কোনো মঙ্গল প্রচেষ্টা—। অনেক দরকারী কাজ ফেলে বেশ অসুবিধে সত্ত্বেও গিয়েছিলাম সেদিন ওদের সেই সংস্থায়। সমাজে সবদিক থেকে বঞ্চিত আর অবহেলিত এতগুলো অসহায় চোখ যেন চিঠির ভাষা হয়ে হাতছানি দিয়েছিল বারবার। মন বলেছিল এর মধ্যে অনিবার্যভাবে তোমারও যে আছে কিছু দায়িত্বের

ভাগ। খোলা চোখের সামনে আজ এতগুলো বছর পার হয়েও স্পষ্ট ভেসে উঠছে সেদিনের ছবি।

কেন কি দরকার আমার চুল আঁচড়ে ওনার সামনে আবার গিয়ে দাঁড়াবার? পাশের ঘরে একটা হিসহিসে চাপা স্বরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কেউ।

কি হচ্ছে, এই অতসী?

না, আমি যাব না। কি হবে, কি পরমার্থটা লাভ হবে আমার ওখানে গিয়ে? ফুঁপিয়ে ওঠা আকুল কান্নায় এরপর ভেঙে পড়েছিল কঠিন বিদ্রোহী সেই কণ্ঠস্বর।

কে ওখানে? জিজ্ঞেস করেছিলাম অবাক হয়ে।

ও আমাদেরই একটি মেয়ে। বড় দুঃখী মেয়েটি। লজ্জিত ভাবে বলেছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা, ভাগ্য যাদের জর্জরিত করেছে এমন অকারণ কষাঘাতে, নিষ্ঠুর অবহেলায় বারবার মুখ ফিরিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে মানুষের সমাজ, মাথার ওপর একটু আশ্রয়, পায়ের নিচে একটুখানি শক্ত মাটি আর নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের খানিকটা আশা নিয়েই তো ছুটে আসে ওরা আমাদের কাছে।

চলুন না, দেখে আসি একবার মেয়েটিকে। বললাম অনেকখানি ঔৎসুক্য নিয়ে।

মাথা নিচু করে তাঁত বুনছিল একটি মেয়ে। বুঝতে পারিনি কয়েক মুহূর্ত আগে এমনভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এই শ্রীময়ী শান্ত মেয়েটিই।

অতসী এই দেখ, উনি এসেছেন বসুমতী পত্রিকা থেকে। আমদের কথা লিখবেন বলে আজ এসেছেন এখানে। বললেন ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে।

চোখ তুললো মেয়েটি হাতের কাজ রেখে। বড় নয়। কাজল কালোও নয়, কিন্তু কি আকুল আকুতি সেই অতি সাধারণ শান্ত দুটি চোখের তারায়!

আপনি লিখবেন? আমাদের সব সত্যি কথাগুলো সকলকে

ঠিকমতন জানিয়ে দেবেন? আপনি তো অনেক জানেন, আপনি বলুন তো আমার কি দোষ? কেন বিনা দোষে এত শাস্তি পাচ্ছি আমি শুধু শুধু? এতদিন ধরে এত দুর্ভোগ বয়ে এসেছি, বইতে হবে আরো কত কতদিন···।

অতীত শোনাতে চায়না অতসী। চায়না সর্বনাশা উন্মত্ততায় ভাঙা পদ্মার ধারের সেই গ্রামখানিকে মনে করতে। কিন্তু তবু মনে পড়ে। মনে পড়ে ছায়া ছায়া কারা যেন ছিলো সে দেশে। কতগুলো কচি কচি অবোধ মুখ। কত আশা নিয়ে অবোধ সেই শিশুমুখগুলো আজো চেয়ে থাকে অতসীর বুকের মধ্যে অপলক।

মা-বাবা, ভাই বোন, স্বামী-সন্তান নিয়ে সাজানো একটা সংসার। কিন্তু তারপর কি যেন হলো। দেশ জুড়ে জ্বললো আগুন। দেশ ভাগ। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। কি দাঙ্গা এ, কিসের জন্যে, কিছুই বুঝলো না কিন্তু সেই আগুনে পুড়ে ঝলসে শত শত অতসী জমা হলো গিয়ে পথের ধারে আস্তাকুঁড়ে। ওরা আবর্জনা হয়ে গেলো। কেন, কেন? জানেনা অতসী। শুধু জানে কি নিদারুণ লাঞ্ছনা অপমান আর সীমাহীন গ্লানিতে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিলো ওদের সমস্ত জীবন। আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি? থাকবে না কেন, কিন্তু নিদারুণ ভাগ্যের থেকেও নিষ্ঠুর সেইসব দরজা যে সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে ওদের মুখের ওপর। ফেলে আসা অতীতের পথ শুধু লজ্জা আর কলঙ্কের কালিতে গভীর অন্ধকার।

কিন্তু আমি তো কোনো দোষ করি নি? নিজেদের কথা কোনোদিন স্পষ্ট করে বলতে শেখেনি তাই আর কিছু বলবার আগেই ঝরঝর করে ঝরে পড়লো অনেক কষ্টে বাঁধ দিয়ে রাখা অবাধ্য চোখের জল। বিনা দোষে কেন আমি এত শাস্তি পাব বলুন? কেন সমাজে আমার জায়গা হবে না সুস্থভাবে? ঘর-সংসার কিছু হবে না কেন বলুন?

সত্যি বিনা দোষে কি শাস্তি মেয়েগুলোর। আস্তে আস্তে খেদোক্তি করেন অধ্যক্ষা। এর পরেও তো আছে মুহূর্তের ভুলে পা

ফসকানো কত কুমারী-মা, জীবনে সর্বদিক থেকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পথ হারানো বালবিধবা। কোনো এক মুহূর্তের সামান্যতম ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে সমস্ত জীবনটাকেই মূল্য দিতে হবে অন্ধকার এক জগতের প্রাণীর মতন চিরটাকাল, অথচ নেহাতই অবহেলায় ছিনিমিনি খেলে অসহায় নিষ্পাপ প্রাণগুলোকে একটা এঁটো পাতার মতন গড়িয়ে দেবে যারা এই অন্ধকারের রাজত্বে তাদের দিকে চাইবে না তো সমাজের কেউ একবারও ভ্রূকুটির চোখ তুলে? এই আশ্চর্য একটা সমাজে বসে এদের নিয়ে বলুন তো আমি কি করি?

দম বন্ধ করা একটা দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম অধ্যক্ষার প্রশ্নে। আমি? না আমি বলতে পারব না। দেশের লক্ষকোটি মূক আশা প্রাণ পাবে নাকি আমাদের ভাষায়, কিন্তু আমার সে ভাষা জানা হয়নি যে এখনো। শক্তি আরো দুর্বল। অনেক সখ করে আসরের সভ্যকার্ডে ছাপা হয়েছিলো শ্রীমায়ের একটি বাণী। জীবনের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে চাই আত্মার সাধনা, ধর্ম, ভক্তি। কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙা এই অসহায় জীবগুলো যেখানে গোটা একটা পৃথিবীর সামনে থেঁতলে, পিষে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, সেখানে ভক্তির কথা, সাহসের কথা বলতে হবে যে অন্য ভাষায়। যুদ্ধ করতে হবে নতুন হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়ে। দেখতে হবে সমাজটাকে খুব কাছ থেকে একেবারে খোলাচোখে। চার দেওয়ালের মধ্যে সম্পাদনার দপ্তরে বসে হবে না সে কাজ। আমি পথ বদলালাম তাই জীবনকে দেখতে। নতুন দিকের নিশানায়।

পথ বদলাতে চাই কিন্তু কে দেবে সেই দিকের নির্দেশ? নাৎসী প্রভাবিত জার্মানীতে হিটলার মেয়েদের বলেছিলেন, ফিরে যাও রান্নাঘরে। কাজেও দেখিয়েছিলেন তিনি তাই। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ মেয়েদের বলে, তোমরা রাষ্ট্রদূত হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, হও পাইলট, সৈনিক। এগিয়ে চলো দেশের পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে। তারপর সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে মেয়েরা যখন সত্যিই আসে এগিয়ে? তখন?

অনেক ভরসা বুকে নিয়ে হানা দিলাম ছোট বড় বিভিন্ন পত্রিকা দপ্তরে। দেখা করলাম বাঘা বাঘা সম্পাদকের সঙ্গে। ফল একই। ওঃ আপনি ? উদ্দিষ্ট চেয়ারে বসবার আগেই পা থেকে মাথার শেষ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নেন সম্পাদকমশাই ত্বার। বেশতো করছিলেন সম্পাদনার কাজ এতবড় পত্রিকায়, রিপোর্টার হবার উদ্ভট ইচ্ছেটা হলো কেন আবার হঠাৎ ?

উদ্ভট! বহুৎ কাজের ভিড়ে একটু সময় দিতে পারা ভদ্র-লোকের ব্যস্ত-বিষম মুখটার দিকে দুবার চোখ বুলিয়ে নেবার পালা এবার আমার। উদ্ভট কেন হতে যাবে এ ইচ্ছে ?

আরে এসব কি আর আমাদের মেয়েদের কাজ? এ ঘরে বসে পাখার তলায় সম্পাদনার কাজ নয়। এ হচ্ছে 'রিপোর্টিং'। দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কাঠফাটা রোদে চিলপোড়া, ঝমঝম বৃষ্টিতে কাক ভেজা, তারপর দৌড়োদৌড়ি, ঝাঁপাঝাঁপি...সে এক...

শয়ে শয়ে যে সব মেয়েরা বাদুড়ঝোলা বাসে-ট্রামে দশটা পাঁচটা অফিস-ইস্কুল করেন রোদে পুড়তে, জলে ভিজতে হয়না তাঁদের ?

আরে না-না। এ আর তার তুলনা ? এ মেয়েদের কাজই নয়।

অন্য দেশের মেয়েরা তো দিব্যি চমৎকারভাবে পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছেন এই মেয়েদের না পারা কাজেই ?

ফুঃ, সে দেশের মেয়ে আর আমাদের দেশের···এদেশের মেয়েদের প্রতি অপার অনুকম্পায় আর সীমাহীন অবজ্ঞায় মুখ খুলে বুঝি সবটা হাসতেও লজ্জা পান ভদ্রলোক তাই "ফুঃ" করে শুধু একটা শব্দ করেন হাসির মতন।

কেন সে দেশের মেয়ে আর আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে তফাৎটা কি ? কানমলা খাওয়া ছিঁচকাঁদুনি খুকীর মতন ফিঁচফিঁচ করে বলতে চেষ্টা করি তবু আর একবার।

না-না, চোখ তুলে ভদ্রলোক এই অর্বাচীনের দিকে বিশেষ করুণার শেষ একটা দৃষ্টি ছোঁড়েন আর একবার, এ হয়না। এসব

কাজ .. কথা শেষ করবার আগেই চোখ নামান। কলম তোলেন। চালান আবার তীরবেগে।

তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা কর্তব্য তখন হয়তো ছিল আমারও। ভিক্ষা মিললো না। কপাট বন্ধ হয়ে গেলো। তবে আর কিসের প্রয়োজন? কিন্তু না। এ অভিজ্ঞতা তো নতুন নয়। এতো প্রায় রোজকার পড়া পুরনো বইটারই পাতা ওলটানো শুধু আর একবার। ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরেছি ছোটবড় বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে আর শুনেছি একই কথা। মেয়েরা কি একাজ পারে? মেয়েদের জন্যে একাজ নয়। মেয়েরা ..আরে রামচন্দ্র বলো। রাগ দেখিয়ে তীরবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা কোথায়? নিদারুণ পরাজয়ের হতাশা, গ্লানি, অপমান আর সব শেষে বিফলতার সীমাহীন লজ্জায় ভেঙে পড়ে যে পথ চলবার ক্ষমতাটুকুও।

তবে বোধহয় আর হলো না। হলোনা অচেনা পথে নতুন করে পা বাড়ানো। স্বপ্ন কি মানুষের সত্যি হয় কোনদিন? আর সকলেই যখন বলছেন তখন হয়তো সত্যিই উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত কোনো ইচ্ছে হবেওবা এ। জ্বরতপ্ত ক্লান্ত রুগীর গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেবার মতন করে প্রবোধ দিই নিজেকেই।

কিন্তু অন্য দেশের মেয়েরা? শত শাসনেও অবোধ অবাধ্য চোখের ওপর বারবার যে ভেসে ওঠে ছবির পর ছবি। কত অবলীলায় কত সম্মান, সাফল্য আর গৌরবের সঙ্গে জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছেন দেশের মেয়েরা। হ্যাঁ, দেশের মেয়েরাই, কিন্তু সে দেশ আমাদের নয়। সে অন্য দেশ। হ্যাঁ, অন্য দেশ। আর কত ব্যর্থ দিন আর হতাশ রাত্রির অন্ধকারের পর হঠাৎ চমকে ওঠা এক ঝলক সূর্যের আলোর মতন অপ্রত্যাশিত ডাক এলো সেই অন্য দেশ থেকেই। একটি প্রথম শ্রেণীর জাপানী কাগজ 'মাই-নিচি' যার প্রচার সংখ্যা আমাদের দেশের যে কোনো প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের কয়েকগুণ (কারণ সাধারণ হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রায়

সব জাপানী পরিবারে প্রতি দশজনের মধ্যে একেবারে শিশু ছাড়া নয়জনই নিয়মিত একাধিক কাগজ পড়বার অভ্যেস রাখেন)। সেই দৈনিক পত্রিকা থেকে ডাক এলো এক পথ না খুঁজে পাওয়া ইচ্ছুক উন্মুখ বাঙালী মেয়ের কাছে! কত না চিন্তাতীত বিস্ময় জমা হয়ে আছে আমাদের এই আশ্চর্য পৃথিবীতে।

আন্তর্জাতীয় খবরের জন্যে প্রধান কর্মকেন্দ্র দেশের কেন্দ্রস্থল রাজধানী দিল্লিতে। প্রতিনিধি (চিফ করস্পনডেণ্ট) জাপানী ভদ্রলোক। সামান্য ইংরিজি আর অল্প অল্প দু একটা ভাঙ্গা হিন্দী ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ভাষায় একেবারেই জ্ঞান না থাকায় সংবাদ সরবরাহ কাজে তার প্রতিনিধিত্ব করা। এ ছাড়া আছে এ দেশীয় খবর বা ঘটনা সে দেশের প্রয়োজন আর রুচি অনুযায়ী লেখা। অর্থাৎ সাংবাদিকের ভাষায় শুধু 'স্টোরি' করাই নয় 'ফিচার রাইটার' বা 'মেলার'-এরও দায়িত্ব। আশ্চর্য! এতগুলি আর এতখানি দায়িত্ব-ভার একটি মেয়ের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করলেন না তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও!

পাড়ি দিলাম দিল্লি। আর যাবার আগে এবার দলে দলে এগিয়ে এলেন বন্ধুজন। আরে আরে আপনি যে দেখি সত্যিসত্যিই রীতিমতন একজন সাংবাদিক হয়ে উঠলেন। পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললেন একদল। বাবাঃ, রাম না বিষ্টু নয় এতবড় একটা 'ফরেন' কাগজের একেবারে সংবাদ দপ্তরে ঢুকে পড়া! এলেম আছে বটে মেয়ের। তাঁহা তাঁহা সরেস ছেলে থাকতে একটা নেহাতই জলে-ভাতে বাঙালিনীকে এমন একটা বিখ্যাত কাগজে সুযোগ দেওয়া নেহাতই বোকা (?) বিদেশীগুলোর প্রতি বেশ একটা অনুকম্পার সুর ভাসে কারুর গলায়। কারুর মুখে শুধুই আকাশ কালো বিদ্বেষ।

নদীর জলধারা আর সময়ের গতির সঙ্গে মানুষের জীবনধারার এই তফাৎ যে নদীর জল আর সময়ের কোনো দায় নেই পেছন ফেরার। সুখের হোক, দুঃখের হোক ফেলে আসা পথ পিছু ডাকে মানুষকে বারবার। আজ এতগুলো বছর পরে দুর্নিবার সে ডাকে ফেলে আসা

পথের দিকে আর একবার ফিরে দেখতে গিয়ে বুঝি জল এসে পড়ে অনেক অভিজ্ঞতার পোড় খাওয়া চোখ দুটোতে আজো। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে' জীবনজোড়া শুধু হতাশা আর ব্যর্থতার অন্ধকার সেই দিনগুলোতে স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া এক ঝলক আশীর্বাদের মতন কবির কথাগুলো যে অমোঘ সত্যে সেদিন ভাস্বর হয়ে উঠেছিলো, জল আসে সেই সত্যের উপলব্ধিতে, সুখে, আনন্দে। আর জল আসে বড় দুঃখে। কিন্তু ভাবি, ভাবি অতীত সমুদ্র মন্থনে ক্লান্ত দু হাতের অঞ্জলিতে অমৃতের ভাণ্ড যদি নাই আসে তবুতো রইল তার গরলটুকুও। বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা স্মৃতির সঞ্চয়নে যদি এক ফোঁটাও মধু না থাকে তাহলে থাকনা তার কপাট বন্ধ চিরদিনই।

কাজ আরম্ভ হলো। গ্যাস দেওয়া বেলুন–না একেবারে রাশিয়ান চন্দ্রযান 'সূয়জের' মতন বাঁধনছেঁড়া মন শুধু ছুটে চলে কল্পনার ডানা মেলা 'সব পেয়েছির দেশে'। আমি সাংবাদিক। আমি রিপোর্টার। সাধারণ শান্তশিষ্ট জীবনধারা তো আমার জন্যে নয়। আমি পারিনা কি? মাথার ওপর আগুন বৃষ্টি করা তাপের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারি, হিম জমানো রাত্রে দৌড়ে দৌড়ে হিমানী হতে পারি। পাহাড় ডিঙ্গোতে পারি, ঝাঁপ দিতে পারি অথৈ অতল সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরে...।

ফিড্‌ল্ ক্যাস্‌ত্রো এসেছেন ভারত সফরে। রিপোর্ট লিখতে হবে একটা তার ওপরে। ফরমাস পেলাম একদিন অফিসে গিয়ে। তারপর প্রেস কনফারেন্‌স্ সন্ধ্যেবেলায়।

এতখানি দায়িত্বভার এত অল্প সময়ে! বুকের মধ্যে গান গেয়ে ওঠে মুক্তপক্ষ এক বিহঙ্গ। কিন্তু.. কিন্তু কনফারেন্‌স্ যে পাড়ায় সেদিকটা ..? মানে নতুন পাড়ায় ঐদিকটায় তো জানাজানি হয়নি এখনো বিশেষ। জন্ম থেকে কৈশোর পার করে গেছি যে দিল্লিতে সেতো এখন নতুন করে বৈচিত্রময়ী হয়ে উঠেছে অভিনব সাজসজ্জায়। তার ওপর সময়টাওতো সন্ধ্যের বেশ একটু ওপাশ ঘেঁসেই। না-না, এ

আবার কি বিদঘুটে চিন্তা। আমি না সাংবাদিক? পথ নিচ্ছিনা আমি একেবারে নতুন দিকে? না চিনি, চিনে নেব। কি আর বেশী শক্ত কাজ সে এমন? সব কাজে এমনি করে ঝাঁকি দিয়ে বারবার চাঙ্গা করতে হবে নাকি মনকে? দারুণ রেগে রক্তচোখে তাকাই নিজেরই দিকে। শুধু পথের হদিসটা জেনে নিতে হবে বাড়িতে। হঠাৎ কাজে যেতে হচ্ছে। ফিরতে হয়তো দেরী হবে। যাবার আগে না বলে গেলে চিন্তা করবে আবার বৌদি! একেই তো সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, বাঁধাধরা সময় ছেড়ে যখন তখন আসা-যাওয়ার এই সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে বেচারা এর মধ্যেই।

হঠাৎ অসময়ে এমন ব্যস্ত-সমস্ত কাজের মানুষ হয়ে অমন একটা ভয়ানক অভিজাত পাড়ার খোঁজ? ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন গৃহস্বামী।

বাবা, ভণিতা ছেড়ে বলইনা তাড়াতাড়ি। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। হাতে সময় নেই এক মিনিটও।

ট্যাক্সি! একেবারে অভাবিত একটা শব্দ কানে যেতে যেন হতভম্ব কিম্ভুত কিম্ভুত মতনই মুখ করে সোজা হয়ে বসলেন প্রশ্নকারী।

কেন, এমন অবাক হচ্ছো কেন? হতভম্ব এবার আমিও।

এই সন্ধ্যেবেলায় ..তুমি...একা ..ট্যাক্সিতে ..

তার মানে? সন্ধ্যেবেলায়, আমি, একা, ট্যাক্সিতে মানে? আয়না নেই সামনে তবু নিজেরই ভূত ভূত চেহারাটা যেন এবার দেখতে পাই চোখের সামনে। গলা চড়া আর এক পর্দা।

কি ব্যাপার? হয়েছে কি? এত চেঁচামিচি জুড়েছো কেন তোমরা?

ব্যস্ত ছিলেন বৌদি ওদিকের কোনো ঘরে, আমাদের সমস্বর গলাবাজিতে তিনিও গলা তুললেন সেখান থকেই।

আরে শোনো শোনো এদিকে এস। 'সাক্ষী শেয়ালকে' কাছে পেয়ে ব্রাহ্মণের মতন চেঁচিয়ে ওঠেন দাদা নতুন উৎসাহে। তোমার

বিদুষি সাংবাদিক ননদিনী এই সন্ধ্যের অন্ধকারে মিটিং করতে যাচ্ছেন ট্যাক্সি করে একা !

ওরে বাবারে, সে আবার কি কথা ? এক খামচা মাখা ময়দা হাতে নিয়েই ঝড় তুলে দৌড়ে আসেন বৌদি ঘরে। আর হালে পানি পাওয়া নৌকোর মতন দাদা এতক্ষনে গুম হয়ে বসেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

কেন, কেন, ট্যাক্সি তো কি হয়েছে রে বাবা ? একটা কথা শোনা থেকেই সবাই মিলে এমনভাবে অট্টরোল তুলতে আরম্ভ করেছো কেন তোমরা তাই বলনা ? কিছু না বোঝা অবোধ চোখদুটো এবার দুজনের মুখের উপর ঘুরতে থাকে পালা করে।

দিল্লির ট্যাক্সির ব্যাপার তো তুমি জাননা ভাই, একেবারে কাছে সরে এসে সভয়ে এবার গলা নিচু করলেন ভদ্রমহিলা বেশ অনেকখানি, এখানে মেয়েদের যখন তখন একা যেতে নেই হটহট করে।

বৌদি ! ! সপ্তম, না তার থেকেও বিকট পাঁচটা শব্দস্বর বুঝি একযোগে বেরোতে চায় আমার কণ্ঠনালী ভেদ করে।

না বাবা, আমার সেই বিকট স্বরধ্বনিও বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনা মহিলার সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়কে, তুমি অন্তত পক্ষে ভজুয়াকেও নিয়ে যাও বাপু সঙ্গে করে।

বৌদি। নাঃ, আর সপ্তমে নয়, একেবারে নিখাদের শেষ তারে এসে মিনমিন করে এতক্ষণের সব বিদ্রোহ। ধারে কাছে একটা চেয়ার আছে নাকি ? বসতাম তাহলে একটু। সন্ধ্যেবেলায় প্রেস কনফারেন্সে একা যেতে ভজুয়াকে সঙ্গে নেবার আগে আমিই না করছিলাম যেন কি সব ? উদ্দাম তুফান ভেঙ্গে একা একা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলাম—পাহাড় ডিঙ্গোচ্ছিলাম—আকাশে উড়ছিলাম—অনায়স অবলীলায় চলছিলাম আগুন ছড়ানো সাহারার বুক ডিঙ্গিয়ে ..আর ...এখন...হায় হতোহস্মি .. আমি কোথায় ?

মাসিমা আপনার মেয়ে যেরকম বেপরেয়া দস্যি ডাকাত হয়ে

উঠেছে তাতে দিল্লীর মতন একটা সহরে যে কোন সময় বিপদ হয়ে যেতে পারে যা কিছু…; সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ভজুয়াকে ট্যাক্সিতে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ায় সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে, আর তার ফলে বিরক্ত হয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন বৌদি মাকে। সে চিঠি পাওয়া মাত্র মা পরের ডাকেই আমার উদ্দেশ্যে পাঠালেন পাঁচপাতা এক নির্দ্দেশনামা আর উপদেশাবলী। "কারুর কথা না শুনে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া কাজ নিয়ে একা একা পাড়ি দিলে অত দূর দেশে। তার ওপর আবার যখন যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছো (?)। তুমি কেন ভুলে যাও যে তুমি জন্মেছো মেয়ে হয়ে। পুরুষ মানুষেরা যা করতে পারে তা করাটা কি সাজে মেয়েদের?" এইসব কতকি। এত সব কিছুর পরেও সেই কাজেই কাটলো দিল্লিতে আরো বেশ কিছুদিন প্রতি পদে পদে বৌদির নিষেধ শুনে আর তাতে কান না দিয়ে। মানে ওদের ভাষায় একেবারে বেপরোয়া, অবাধ্য হয়ে। তারপর আবার ফিরলাম কলকাতায়। না, বৌদির ট্যাক্সিওয়ালার ভয়ে জেরবার হয়ে নয়। অনেক যুদ্ধের শেষে একক প্রচেষ্টায় হঠাৎ বড় চাওয়া অধিকারটুকু পেয়ে এতদিন ছুটে চলেছিলাম যেন এক বাঁধভাঙ্গা আনন্দে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ক্রমে মনে হলো, সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি তো বিভিন্নরূপে জীবনকে দেখব বলে। কিন্তু জীবন তো শুধু একটা শব্দ নয়। জীবন মাটির খেলনা নয়। মানুষ নিয়ে জীবন। কিন্তু যে জীবন আজ দেখছি, যাদের নিয়ে কাটছে আমার দিন-রাত্রি, সেই রাজা-রানী, মন্ত্রী-আমলা, তাদের কথা আমি বলতে চাইনা। জীবনকে দেখতে চাই আমি সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে, হতাশা-বঞ্চনায়। দেখতে চাই চাষি মানুষ, শ্রমিক মানুষ, আর 'মেয়েমানুষের' মধ্যে। যে মেয়েমানুষের অসহায় প্রতিভূ হয়ে সামনে দাড়িয়েছিল অতসী একদিন ভয়ানক একটা প্রশ্ন নিয়ে 'বলুন তো আমার কি অপরাধ?'

সে প্রশ্নের যে উত্তর সেদিন দিতে পারিনি সেই উত্তর খুঁজতে হবে আমাকে এইসব মানুষের মধ্যে থেকেই।

শ্রীসন্তোষ ঘোষ তখন বার্তা সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকার।

আমার কথা শুনে নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে বললেন, পরিকল্পনা মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু একাজ তো আর কলকাতায় তিনতলার ফ্ল্যাটে বসে হবে না। ঠাণ্ডা-ঘর অফিসেও না। এর জন্যে তো ঘুরতে হবে গাঁয়ে-গঞ্জে। চাষির মাঠে, গেরস্থর উঠোনে। সাহস আছে তার?

সাহস আছে, কিন্তু সুযোগও তো চাই সেই সঙ্গে। লিখবার সুযোগ। এতসব নতুন উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতা মানুষকে জানাবার সুযোগ।

সুযোগ দিলেন সন্তোষ ঘোষ। আনন্দবাজার পত্রিকায় দিলেন আমার নিজের একটি 'কলাম', 'কেবল মহিলাদের জন্য।'

শুরু হলো কাজ। সন্তোষদা বলেছিলেন, 'একদিন এক রাজা ছিলেন' বলে রূপকথা লিখতে পারবে না। কোনো কল্প কাহিনীও নয়। জীবন নিয়ে যখন লিখতে চাইছো তখন প্রতিটি মানুষকে দেখবে খোলা চোখে। লিখবে শক্ত হাতে। তা সেই মানুষকে দেখা শুরু হয়েছিলো তো আমার নিজের পরিবারের মধ্যেই। সে মানুষ আমার পিতামহী। পড়াশোনা করতে কি প্রচণ্ড ভালবাসতেন সে তো আমরা নিজেরাই দেখেছি ছোটবেলায়। গাঁয়ের বাড়িতে থাকতেন। সাধারণ পাঠাগারের খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল না তখন। তবু তারই মধ্যে যে দু-চারখানা বই হাতে আসত পড়া হয়ে যেত সে সব দুদিনেই। এরপর ধর্না আমাদের কাছে। বই দাও, তা সে বাংলা টেক্সট থেকে শুরু করে ইতিহাস ভূগোল মায় অঙ্ক বই পর্যন্ত। অঙ্ক বই কারণ অবিশ্বাস্য হলেও এটা একটা ঘটনা যে, মোটামুটি যে কোনো অঙ্ক কষতে পারতেন আর উপন্যাস পড়বার মতনই ভালবাসতেন ঠাকমা অঙ্কর বই পড়তে! ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন দুবছরের বড় দাদার যোগসাজসে লুকিয়ে পড়াশোনা করে। এই যোগসাজস ক্ষুদে দাদাটির পক্ষ থেকে একেবারে যে নিঃস্বার্থ হয়েছিলো তা নয়। এরজন্যে নিজের ভাগের কুলের আচার, তেঁতুল ছড়া, আমসত্ত্ব এইসব তুলে দিতে হত ঘুষ হিসেবে। কিন্তু এত সত্ত্বেও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি ঠাকমার শেষ পর্যন্ত। হবে কেমন করে? সেদিন

সমাজ আর সংসার তাঁকে দেয়নি সে অধিকার। কারণ তাঁদের চোখে তিনি তো মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'মেয়েমানুষ।' সেই 'মেয়ে মানুষটা'র যে আবার আলাদা করে ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু থাকতে পারে সেই কথাটা চিন্তাই করেনি কেউ কোনদিন।

ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে সমাজে নারীর অবস্থা এতটা হীন ছিলনা। সমাজ পুরুষ শাসিত ছিলো তাই নারী হয়তো সেদিনও ছিলো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তবু স্ত্রী-শিক্ষা আর স্বাধীনতা ছিলো তখনো অবারিত। নিজের সম্বন্ধে তো বটেই, পারিবারিক আর সামাজিক যে কোনো ব্যাপারে মতামত দেবার অধিকার ছিলো তার পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে, স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায়। এর প্রমাণ পাই আমরা রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও বিভিন্ন কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ আর উপকথায়। সাহিত্যকে যদি ধরা হয় জীবন আর সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাহলে এগুলিকেও ধরা উচিৎ ঐতিহাসিক দলিল বলেই।

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা চলছিলো এই ধারায়। এরপর এলো পরিবর্তনের পালা। বিদেশী শক্তির বারবার হানায় বিধ্বস্ত হলো ভারতভূমি। শেষ পর্যন্ত মোঘল এলো শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। পত্তন হলো দেশে নতুন সাম্রাজ্যের। এই ইতিহাস তো জানা সকলের। তবু এই নিয়ে এখানে আলোচনা এই কথা ভাবতে যে খনা, গার্গেয়ী, লীলাবতীর দেশের মেয়েদের জীবনে কেমন করে এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘনিয়ে এলো যা এতগুলো শতাব্দী ধরে এত প্রাজ্ঞ, দরদী, বিচক্ষণ মানুষের আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঘুচলো না কিছুতেই আজো।

মোঘল দরবারে পর্দা প্রথা ছিলো কঠোর। অসূর্যম্পশ্যা ছিলো তাদের নারী। ব্যবহৃত হতো তারা শুধু সংসারের প্রয়োজনে, বংশ রক্ষার কাজে আর ভোগ্যপণ্য হিসেবে। এদেশে মোঘল সাম্রাজ্য পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ঝুঁকলেন পারস্য সংস্কৃতির দিকে। অর্থাৎ হিন্দু রাজা-জমিদার আর মুসলমান আমির-ওমরাহ সকলেই একই ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন একরকম দরবারি জীবন প্রবাহে। রাজা দুর্লভ রায়, রাজ-

বল্লভ, রাম নারায়ণ, সীতাবরায় থেকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতন মানুষও ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন এই ধরনের জীবন ধারায়। এঁরা, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা দুর্লভ রায় মুসলমান আমির-ওমরাহদের অনুকরণে নিজেদের অন্তঃপুরেও ধীরে ধীরে প্রচলন করলেন কঠোর পর্দা প্রথা। মুসলিম অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা ছিল না তাই তার অন্ধ অনুকরণে তাঁরা যে শুধু স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী—হয়ে উঠলেন তাই নয়, গোটা নারী সমাজটার কিছুমাত্র উন্নতি বা সংস্কার কেউ করতে চাইলেও ভয়ানকভাবে তার বিরোধিতা করতে লাগলেন নবাব-বাদশাহদের হাত থেকে শিরোপাখানা নেবার জন্যে।

গৌরীদানের জোয়ার চলেছে তখন দেশজুড়ে। পাঁচ-বছরের শিশু কন্যাকে 'গৌরী' করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে চলেছেন আত্মীয় পরিজন। মেয়ের কপালে জুটতো যদি ভালো ঘর-বর তাহলে তো কথাই নেই, নাহলে কুল রাখতে বাপ-ঠাকুর্দার বয়সী পাত্রের হাতেও কন্যা রত্ন দান করে পরম মোক্ষর পথ উজ্জ্বল করতেন তাঁরা নিশ্চিন্তে, মনের আনন্দে। আর এর কয়েকদিন বা মাস না যেতেই সেই বরের অনন্তলোক থেকে ডাক এসে পড়লে শাঁখা সিঁদুর খুইয়ে পারলে ঘরের মেয়ে আবার ফিরত ঘরে, আর তা নাহলে স্বামীর চিতায় 'সতী' হয়ে লাভ হত তারও অক্ষয় স্বর্গ (?)। যাদের সেই স্বর্গ প্রাপ্তি হতনা, তাদের বাপের বাড়ি বা দুদিনের শ্বশুরের ভিটে, আশ্রয়টা যেখানেই হোক না কেন, শুরু হত অনন্ত নরক বাসের পালা। বয়সটা পাঁচ থেকে পঁচানব্বুই যাই হোক, বেশে-বাসে বিধবাকে করে তুলতে হবে কুৎসিতদর্শন। তার ওপর তো আছেই একাদশীর নির্জলা উপবাস, অমাবস্যায় নিশিপালন, অম্বুবাচিতে চারদিন ধরে প্রায় অনাহার, দিনে অতি সাধারণ নিরামিষ আহার, রাতে অচল সেই ব্যবস্থা অর্থাৎ সামান্য ভাতটুকুও। তা সে বেচারা রুটি নামক পদার্থটি বা শুকনো মুড়ি চিঁড়ে গলাধঃকরণ করতে পারুক আর নাই পারুক।

রানী ভবানীর মেয়ে বিধবা হয়েছিলো অতি অল্প বয়সে। বিধবার করণীয় কৃচ্ছ্রসাধন সবই পালন করতে হত তাকেও ঐটুকু বয়সেই।

মেয়ের এত কষ্ট দিনরাত চোখের ওপর দেখতে না পেরে চেষ্টা করেন রানী এই অর্থহীন আর অমানবিক আচার ব্যবস্থার সংস্কার আর বিধবা বিবাহ প্রচলনের। অনেকদিন ধরে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা আর বহু শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে রানী প্রমাণ করলেন যে কোনো হিন্দু শাস্ত্রেই বিধবাদের পালনীয় এইসব কৃচ্ছসাধন বা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র নির্দেশ নেই।

তখনকার সমাজে বিশিষ্ট ধনী জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রাজা রাজ-বল্লভ ছিলেন অনেকটা উদার মতাবলম্বী মানুষ। এগিয়ে আসেন রাজা তাই রানী ভবানীর ডাকে সাড়া দিয়ে। কিন্তু এই শুভ প্রচেষ্টায় প্রবলভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ান রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন অর্থে, প্রতিপত্তিতে, ক্ষমতায় সমাজের শিরমণি। তাঁর সেই প্রবল প্রতিবন্ধকতায় হার মানতে হলো রানী ভবানীর মতন তেজস্বিনী মহিলাকেও!

কিন্তু সেতো আজ কয়েক শতাব্দী আগের কথা। এর মধ্যে কতবার কত বড় বড় ঝড় বয়ে গেলো ভারতের ভাগ্যাকাশে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতন হলো। এলো বৃটিশ রাজশক্তি কিন্তু আমাদের সমাজে কূপমণ্ডুকের মতন সংকীর্ণ সেই কজন রাজা আর জমিদার রচিত নিয়ম কানুন বা চিন্তাধারার পরিবর্তন হলো কি এতটুকু? হলো। কিন্তু সে পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জীবনে কল্যাণ আনলো কতটুকু? আগেই বলেছি রাজশক্তিকে চিরকাল অনুকরণ করে সমাজের উচ্চস্তরের বিত্তবান কিছু মানুষ। ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে বৃটিশ শাসন পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলো পরিবর্তনের জোয়ার। মুসলমান শাসকের বেশবাস, আচার-ব্যবহার ছেড়ে রাতারাতি দেশের বিত্তবান মানুষ, জমিদার আর রাজারা হয়ে উঠলেন সাহেব অনুগত। নবাব সরকারের নায়েব, কলমচিরা খোল নলচে বদলে হয়ে বসলেন জমাটি কেরানিবাবু। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর। আমাদের জানবার কৌতূহল হয় যে, এই পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় ভারতীয় বা বাংলার মেয়েদের জীবনে কি আনতে পারলো কিছুমাত্র পরিবর্তন? না। বৃটিশ

সিংহের বহু গর্জন আর হাঁকাহাঁকিতেও ঘুম ভাঙলো না সমাজ রক্ষকদের অত সহজে। পুরুষেরা সাহেব হয়ে ফরসী-হুঁকো ছেড়ে ধরলেন বিদেশী চুরুট। পরলেন কোট-প্যাণ্টালুন আর জুতো-মোজা, কিন্তু তাদের মেয়েরা বন্দী হয়ে রইলেন সেই চার দেওয়ালের রক্ষণায় অসূর্যম্পশ্যা বিবি হয়েই। কতকাল নারী শক্তি এইভাবে পুরুষ শাসনের জয়ধ্বজার কাছে ভীরু অসহায়তায় আত্মসমর্পণ করে থাকত কে জানে, কিন্তু নেহাতই দৈবের করুণায় দিগন্ত বিস্তৃত সেই অমানিশা ভেদ করে শেষ পর্যন্ত জ্বললো বুঝি একটুখানি আশার আলো। নারী শিক্ষার জন্যে সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে এলেন কিছু মানুষ। এলেন ভগিনী নিবেদিতা। অনেক দুঃখ কষ্ট আর ত্যাগের মূল্যে সেই মমতাময়ী বিদেশিনী প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিজনদের বুঝিয়ে শুনিয়ে একটি দুটি করে মেয়ে যোগাড় করে খুললেন মেয়েদের প্রথম স্কুল। সুদীর্ঘ সে ইতিহাস, বড় কষ্টের। বছরের পর বছর পার করে পরম সহিষ্ণু প্রতিক্ষা আর চেষ্টা সত্ত্বেও একেবারে শম্বুক গতিতে এগলো নারী শিক্ষা। আজ প্রায় প্রতিটি ঘরে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্থক মেয়েদের দেখে ভাবাই যায় না সেদিনের কথা।

তবুও এর পরেও তো কথা আছে। সে কথা হলো, লেখাপড়ার অগ্রগতি হয়তো হলো মেয়েদের। ক্রমে ঘোমটা পর্দার ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তাঁরা বাইরের পৃথিবীতে। নিঃসঙ্কোচে জুতো মোজা পরে হাঁটলেন পথে প্রান্তরে সচ্ছন্দ গতিতে। যোগ দিলেন নানা পেশায় কিন্তু স্বাধীনতা বলে যে জিনিস তা কি মেয়েরা পেলেন সত্যি করে? পেয়েছেন আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসেও? আজো বিশ্ব জুড়ে মেয়েদের কি ব্যবহার করা হয়না নেহাতই ভোগপণ্য হিসেবে? পৃথিবীর কথা থাক। সেতো অনেক দূরের ব্যাপার। আমাদের এই ভারতবর্ষে শুধু সমাজে কেন, মানুষ বলে মেয়েদেরও যে নিজস্ব একটা সত্ত্বা আছে সামান্য এই কথাটাই স্বীকার করে কটি পরিবার?

বিয়ের আগে অল্পবয়সী অনুঢ়া মেয়ের অভিভাবক যে মা-বাবা বা

বয়স্ক পরিজন এটা স্বাভাবিক কথা। মেয়ের বয়স তখন কম। নিজের ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা থাকেনা ঠিক মতন। কিন্তু বিয়ের পরও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সারাজীবনের অভিভাবক হয়ে থাকেন নাকি তাঁর স্বামী? স্ত্রী কি করবেন না করবেন, কেমন হবে তাঁর বেশবাস, চলাফেরা, সবই নির্ধারিত হবে স্বামীর ইচ্ছেয়। অথচ স্ত্রীর সেরকম কোনো ইচ্ছে থাকলে তা স্বামীর ওপর আরোপ করবার ক্ষমতা বা সাহস থাকে কজনের? আক্ষরিক অর্থে অশিক্ষিত বা অতি সরল গাঁয়ের মেয়েদের তো কথাই নেই, কিন্তু উচ্চশিক্ষিতা কর্মরতা মহিলার বেলায়ও কি স্বীকৃত হয় সে অধিকার আজো?

এ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা কাজ করতে গিয়ে আমি এক সময় আলোচনা করেছিলাম বেশ কিছু গৃহবধূ বা মায়েদের সঙ্গে। সকলেই কথা বলেছিলেন প্রত্যেকের নিজস্ব রুচিতে বা ভঙ্গিমায় কিন্তু বক্তব্যের সুরটি ছিল সকলের একই। এদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জনের বিয়ে হয়েছে মা-বাবা বা অভিভাবকের ইচ্ছেমতন, তাঁদেরই পছন্দ বা রুচি অনুসারে। জীবনের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যার ওপর নির্ভর করবে সমস্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সে বিষয়ে পাত্রীর ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা গ্রহণ-বর্জনের যে কোনো অধিকার বা প্রয়োজন আছে এ কথাটা মনেই আসেনি কোনদিন কারুর। অথচ একই ব্যাপারে শুধু মতামতই নয়, শেষ রায়টিও দেবার অধিকার আছে একমাত্র পাত্রেরই। এর পরেও আরো আছে। কবেকার সেই মান্ধাতার আমলের অনড় একটা নিয়মে অনেক দেখেশুনে, বিচার-ভাবনার পর যদি বা কনে পছন্দ হলো তো দেনা পাওনার দরদস্তুর। মেয়ের রঙটা তো চাপা চাপা বেশ। চলা মুশকিলই ছিলো তবে এত হাজার টাকার নগদ বিদায় পেলে ইত্যাদি ইত্যাদি···। এতসব যাকে ঘিরে সেই মেয়ে হয়তো ক্ষোভে দুঃখে আর অপরিসীম গ্লানিতে ততক্ষণে মুখ লুকিয়েছে অন্ধকার ঘরের কোণে। তা লুকোক তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু সে যদি সেই ক্ষোভ মুখে নিয়ে প্রতিবাদের ভাষায় সোচ্চার হয়েছে এতটুকু তাহলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলা

আরো কঠিন করে বাবা বলবেন, 'তোমার ভালমন্দ, হিতাহিত তোমার থেকে বেশী বুঝি আমরা। তোমার বড়দের ব্যাপারে মাথা গলাবার দরকার নেই কিছু।' কটূক্তিতে আরো নির্মম হবেন মাসি, পিসি বা অন্য মহিলারা। কিন্তু ধান ভাঙতে গিয়ে বারবার এসে পড়ছে শিবের গীত। আসলে নিজের কথা বলতে গেলে আসে যে ব্যক্তি-জীবন তাতো জড়িয়ে আছে সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে। এক অন্যের পরিপূরক। যেমন পরিপূরক বর্তমান অতীতের। তবুও আমাদের আলোচনা এখানে বিশেষ করে ব্যক্তিকে নিয়ে তাই ফিরি আবার নিজের কথায়।

আনন্দবাজারে 'কলাম' পেয়ে আর সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি বিদেশী সংবাদ সংস্থায় নিয়মিত লিখবার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছিলাম মনের আনন্দে। কেমন করে কোথা দিয়ে যে কেটে চলছিলো জীবন বুঝতেই পারিনি যেন ভাল করে। বুঝতে পারলাম যখন জীবনে এলেন ঈপ্সিত মানুষটি। কিন্তু থমকালাম। থামলাম। মানুষের জীবনে এমন সময়কে নাকি বলা হয় পরম লগ্ন, মধু মুহূর্ত এইসব কত কিছু। এমন লগ্নে মধু ঝরতে থাকে নাকি চারিদিক থেকে। দখিনা বাতাস বইতে থাকে ফুরফুর করে। কিন্তু হায় ঈশ্বর, আমার বুক যে দুরদুর করে ওঠে চিন্তামাত্রই। দখিনা বাতাস তো শুধু মনে দোলা দিয়েই ছাড়ান দেবে না। সেযে ফুরফুর করে উড়ে এসে চেনা পৃথিবীর তট থেকে উখড়ে নিয়ে ফেলবে অজানা কোন বালিয়াড়িতেই হয়তো বা। জীবনে এতকিছু 'হতে পারা' ছেড়ে উদঘুটে বিদঘুটে এক সাংবাদিক বৃত্তি বেছে নেবার ইচ্ছেটা জাহির করার ফলটি যে নিজের পরিবারে খুব সুখদায়ক হয়নি একথা বলাই বাহুল্য। ছোটবেলা থেকে স্বভাবতই ছিলাম দস্যি-দামাল। স্কুলে-কলেজে খেলাধুলোয় বরাবরের চাম্পিয়ান। মার্গ সংগীত, নাচ শিখেছি সিমলা-দিল্লির নাম করা ওস্তাদের কাছে। ছবি আঁকা প্রখ্যাত শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। লেখাপড়াতেও বরাবর প্রথম সারিতেই। লিখতে বসে আত্মকথনের সংকোচ এসে পড়লেও

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পরিবারে এই রকম সন্তানের প্রতি সকলের আশা-আকাঙ্খা থাকে একটু বেশী। আমার পরিবারেও হয়েছিলো তাই। কেউ আশা করছিলেন মেয়ে ডাক্তার হবে। কেউ স্বপ্ন দেখতেন আরো নামী-দামী কিছুর। স্বাধীনতার অল্প কিছু পরে বাবা বদলি হয়ে এলেন ফোর্ট উইলিয়াম্‌সএ। কল-কাতায় এসে বাসা নেওয়া হলো কলেজ ষ্ট্রীটে। আমার মামা সঙ্গীতাচার্য ডঃ যামিনী গাঙ্গুলী তখন থাকতেন কলেজ ষ্ট্রীটের কাছেই। স্বভাবতঃই দুটি পরিবারে আনাগোনা, ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও মামার কথার মূল্য ছিলো আমাদের পরিবারে অনেকখানি। কলকাতায় এসে স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়ে সবে লেখালিখি শুরু করেছি কিছু কিছু। মাসিক বসুমতীতে এরই মধ্যে বেরিয়েছে কয়েকটি ছোটগল্প। সেই গল্পেরই একটি পুরস্কার পেলো কোনো একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতায়। মামা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। তোমাকে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি, বললেন আমাকে ডেকে, দেখ রবীন্দ্রনাথের মতন প্রতিভা লক্ষ কোটি বছরে আসেন একবার। বহুমুখী প্রতিভা তাঁদের। তা তুমি কি মনে করো তুমি কোনদিন রবীন্দ্রনাথ হতে পারবে? মামার চোখে মৃদু কৌতুকের হাসি।

উঃ, না—না। আমার চোখে দুরন্ত ভয়।

তাহলে এতকিছু শেখার মধ্যে তুমি বেছে নাও কোনটা তুমি করবে ঠিক। আমি তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম ভাবতে।

সাতদিন চাই না আমি এক্ষুনি বলছি। আমি লিখব। ভাবা তো আগেই ছিলো সেই চিন্তাই মুখে বললাম তক্ষুনি নির্দ্বিধায়।

তারপরের ঘটনা, অর্থাৎ এত কিছু হতে পারার সম্ভাবনা ছেড়ে কলম ধরা বা সাংবাদিক হবার ইচ্ছে যা পরিবারের কাছে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়েছিলো, সে কথা তো বলা হয়েছে আগেই। এতদিন সুখে-দুঃখে, গ্রহণে-বর্জনে সে জীবন তো ধাতস্থ হয়ে এসেছিলো

সকলেরই অনেকটা। এখন আবার একবার পালা বদলের চিন্তাতে হৃদকম্প উঠলো নতুন করে।

কিন্তু পেশায় একেবারে অন্য জগতের হলেও সাহিত্য প্রীতি ছিলো মানুষটার প্রগাঢ়। শুধু আমার লেখা নয়, সকলের কাছে বিভীষিকা আমার সাংবাদিক বৃত্তির প্রতিও ছিলো আন্তরিক দরদ। জীবনতরণী ভাসালাম আবার অন্য ঘাটে সেই সহমর্মিতার পাল তুলে।

ওদের বাড়ি এলাম আর তক্ষুনি বুঝলাম দুটি পরিবারের রুচি, অভ্যেস আর চিন্তাধারার দুস্তর পার্থক্য। এটা খুবই স্বাভাবিক যে নতুন বিয়ে হয়ে আসা 'কনেকে' দেখতে চাইবে সকলে সরমে, সঙ্কোচে, অবগুণ্ঠনে ব্রীড়াবতী হয়ে। কিন্তু হায়, নিরুপায় যে আমি এক্ষেত্রেও। বিয়ের জন্যে দপ্তর থেকে ছুটি নিয়েছিলাম যদিও পনেরো দিন তবু ব্যস্ত জীবনের মধ্য গগনে একেবারে কিছু না করা মেদুর আলস্যে সময় কাটিয়ে দেওয়াটা সম্ভব ছিলোনা তো আমার পক্ষে কিছুতেই। অথচ শ্বশুরমশাই তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী পক্ষাঘাতে। সংসারের অতি প্রিয় মানুষটির এমন দুঃখের দিনে মাইনে করা লোক দিয়ে পরিচর্যার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না ওঁরা। ভালো লাগবার মতন কথা নিঃসন্দেহে, কিন্তু বৌভাতের পরদিন আমার হাতখানা ধরে শ্বশুরমশাই-এর ঘরে এনে শাশুড়ি যখন বললেন, মাগো এতদিন ধরে বড় সাবধানে আর যত্নে যে কর্তব্য করেছি আজ থেকে দিলাম তোমাকেও কিছু ভার, তখন একবারও কারুর মনে হলো না আমারও যে আছে আর একটা কর্তব্যের দায়।

নিঃশব্দে হাতে নিলাম সে দায়িত্ব ভার। পনেরোটা দিন কাটলো স্বচ্ছন্দে, তারপর যখন ছুটি ফুরলো? একটা লেখার ব্যাপারে দেখা করবার ছিলো সায়েন্স্ কলেজের এ্যানথ্রোপলজির বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে। সময় দিয়েছিলেন ভদ্রলোক সকাল দশটায়। এরপর চলে যাবেন কলকাতার বাইরে। শ্বশুরমশাইয়ের খাবার সময় সকাল দশটা। খাওয়া খুবই সামান্য। কয়েক চামচ গলা ভাত, একটুকরো মাছ সেদ্ধ। কিন্তু সেই খাওয়া দশটায় শুরু হলেও শেষ যে কখোন

হবে কারুর জানা নেই। তিন বছর শয্যাশায়ী থেকে অবুঝ জ্বার খেয়ালী হয়ে উঠেছেন শিশুর মতন। তাহলে? আমার পারিবারিক অসুবিধের কথা বিভাগীয় প্রধানকে বলতে পারব না। বললেও তো তিনি তাঁর ব্যস্ত আর সাজানো সময় এদিক ওদিক করবেন না আমার জন্যে। এদিকে একে নতুন বৌ তায় আবার উলটো-পালটা সময়ে যখন তখন বেরনো কাজ! অবাক এবং বিভ্রান্ত হতে শুরু করেছেন পরিবারের মানুষজন এর মধ্যেই। এর ওপর নতুন পাওয়া এতবড় একটা দায়িত্ব অন্যকে দিয়ে যদি বলি আমার বাইরে 'appointment' আছে। তাহলে? বলা চলে না। বাইরের জগতে যতই 'জুতো মোজা' পরে 'সোজা সোজা' হাঁটুন না কেন সদ্য বিবাহিতার এতবড় বুকের পাটা কোনো বঙ্গ ললনার হতে পারে বলে আমার জানা নেই। অন্তত আমার তো হলো না। নির্দ্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলো। যেতে পারলাম না। নির্দেশিত লেখা পৌছতে পারলাম না ঠিক সময়ে সাংবাদিক জীবনে এই প্রথমবার। তারপর আবার। আবার। আর তারও পরে বারবার। লজ্জায় কালো আমার মুখের থেকেও বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠলো সন্তোষদার মুখ। 'এই তো,' বললেন বুদ্ধিদীপ্ত চোখের কোণে প্রচ্ছন্ন কৌতুক হাসিয়ে রেখে, 'সংসার করছো খুব গিন্নি হয়ে, এ্যাঁ? জীবনে কোনদিন কিস্সু না হবার কারণ তো তোমাদের এই।' কথাটা শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন শ্রী চক্রবর্তী। ছটফট করতে লাগলেন বিবেকের ভয়ানক কষাঘাতের যন্ত্রণায়। এনিয়ে কথা বলতে চাইলেন পরিবারে পাঁচজনের সঙ্গে। কিন্তু বাধা দিলাম আমি নিজেই। নারীর সহজাত মমত্ববোধে আমি তখন আন্তরিকভাবে ভালবাসতে শুরু করেছি একজন বয়সের ভারে দীর্ণ, অশক্ত অসহায় মানুষের সেবা কাজটুকুকে। আর বলতে আজ দ্বিধা নেই যে তার থেকেও বড় হয়ে দাঁড়ালো আমার নিজের ভেতরেরই সংস্কার, যা এতদিন সংবৃত হয়ে ছিলো আমার অবচেতনায়। মেয়েদের অধিকারের যে প্রশ্নটা নিয়ে এতদিন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম ঘরে বাইরে, আশ্চর্য এক মানসিকতায় নমনীয় হয়ে রইলো তা এখন সব

যুক্তি, বিচারকে অগ্রাহ্য করে! না, ওরা কেউ আমাকে জোর করেনি। নিষেধের কোনো অনুশাসন টানেনি আমার সামনে কিন্তু তবু আমি পারিনি। অসুস্থ মানুষটার নিজের ছেলেরা কেউই তো রাতদিন তাঁর শয্যাপাশে বসে থাকে নি কাজকর্ম ফেলে। বসে থাকবে এই কথাটাই ভাবতে পারেনি সংসারের কেউই। কিন্তু আমি বসে রইলাম। নিজের থেকে মানা আশ্চর্য এক সংকোচে আর কর্তব্য বোধে!

শ্বশুরমশাই গত হলেন এর কিছুদিন পর। কিন্তু ততদিনে শতপাকে বাঁধা হয়ে গেছে জীবন মস্ত বড় একান্নবর্তী সংসারটার খাঁজে খাঁজে। এসেছে সন্তান। অবোধ, অসহায় একটি শিশুমুখ তার অবলা সবকিছু দাবী নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে কেড়েছে আমার দিন রাতের সবটুকু সময়। আমি ডুবে গেছি, হারিয়ে গেছি নিঃশব্দ সেই ভয়ানক পিছু ডাকে।

ছুটি যখন পেলাম তখন জীবনের বৃন্ত থেকে ঝরে গেছে দুটি দশক। আর তখনই বর্তমানের সব আমিত্বকে ছাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো আর একটা আমি। বড় চেনা। বড় আপন। ছেলেমেয়ে দুজনেই বড় হয়ে গেছে। মেয়ে ছাত্রী আর্ট কলেজের। ছেলে মেরিনে। যে কর্তব্যের ডাকে সেদিন ঢেলে দিয়েছিলাম আমার সবটুকু সময়, পৌঁছে দিতে পেরেছি তাকে একটা ধ্রুব লক্ষ্যে, তাই নির্দ্বিধায় এবার আবার মুখ ফেরালাম ফেলে আসা জীবনের পথে।

পথ কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেলনা অত সহজে।

উজ্জ্বল একটা জ্যোতিষ্কের গতি পথ থেকে ছিটকে পড়ার বিচ্যুতি ক্ষমা করলেননা সন্তোষদা কিছুতেই। অত বিচক্ষণ, মহানুভব, দরদী মানুষটা কিছুতেই বুঝতে চাইলেননা যে এছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলনা আমার আর। কেমন করে বুঝবেন? চেনা একটা জমি থেকে শেকড় তুলে ওঁদের তো বাঁচতে হয়না নতুন আর এক মাটিতে। মা হতে হয়না।

বেশতো সংসার করছিলে গুছিয়ে-গাছিয়ে। আঁবার কেন এ বিড়ম্বনা এতদিন পরে? বললেন রাগ করে। এমন করে হাতে ধরে কাজ শেখালাম...। মেয়েদের কোনদিন কিছু হয়না এজন্যেই। রাগের মধ্যেও গলায় খেদ মিশলো সঙ্গে সঙ্গে। কোনো পত্রিকায় 'কলামের' আর তোমার দরকার নেই। কলম ধরো এবার নিজের। বললেন তক্ষুনি অনেকখানি ভরসা দিয়ে।

একই কথা বললেন আমার পিতৃপ্রতিম মাষ্টারমশাই শ্রীসুধাংশু কুমার বসু। মাষ্টারমশাই তখন সম্পাদক বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ডের আর ডিন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের। বললেন, এতগুলো বছর কাটালে দর্শকের আসনে বসে। সেই চোখে জীবনকে যদি দেখে আর চিনে থাকো ঠিক মতন তাহলে লেখ এবার নিঃসঙ্কোচে। লেখ সেই চলমান জীবনের কথা। মানুষের কথা।

কলম ধরলাম তাই আবার নতুন করে। মানুষের কথা লিখতে। সমাজের, সংসারের পাকে পাকে বাঁধা সাধারণ মানুষ। ছোট ছোট স্বার্থে, কলুষে কালো। আবার সেই মানুষকেই তো বারবার ব্যপ্ত হতে দেখেছি সব ক্ষুদ্রতা আর অসত্য থেকে সত্যের পথে। দেখেছি এদের একেবারে কাছ থেকে। আমার চারপাশে ছড়িয়ে। দীর্ঘ দুদশক স্বেচ্ছা নির্বাসনে এই আমার জীবনে পরম পাওয়া।

সাংবাদিকতায় আজকে সার্থক হয়েছেন অনেক মেয়ে। বড় বড় কাগজের দপ্তরেও জায়গা করে নিয়েছেন কয়েকজন। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মতন তাঁদের যখন দেখি খোলা আকাশের স্বাধীনতায় স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে, চরিতার্থতার আনন্দে বুক ভরে ওঠে তখনই। ফেলে আসা দিনের যত অপমান আর গ্লানি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে নিজের কাছেই।